সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনা উপলক্ষে স্মারক গ্রন্থ

বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়

২৫ আগস্ট ২০১৭

সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় ত্রিপিটকের ৫৯টি বইকে একত্রিত করে মোট ২৫ খন্ডে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক প্রকাশিত হলো।



ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি বাংলাদেশ

ত্রিপাসো হতে প্রকাশিত 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটক সেটের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে :

ত্রিপিটকের ছোট-বড় ৫৯টি বইকে (ধারাবাহিকতার কোনো রকম ব্যত্যয় না ঘটিয়ে) কম্বাইন্ড করে মোট ২৫ খণ্ডে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক প্রকাশ।

পূর্বে অনূদিত ভালো মানসম্পন্ন বইগুলোর সঙ্গে বেশ কিছু বইয়ের প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য ভাষায় নতুন বাংলা অনুবাদ সংযোজন।

সম্পাদনার সময় বাংলা একাডেমি প্রণীত 'প্রমিত বাংলা বানানরীতি' পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়েছে।

বৌদ্ধ পরিভাষাগুলোর বানান ও যথাযথ প্রয়োগে যথাসম্ভব অর্থপূর্ণ সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত এমন অভিজ্ঞ অনুবাদক, লেখক ও সম্পাদকদের দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকটি পরম শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে সম্পাদনা করা হয়েছে।

৭০ গ্রাম বিদেশি অফসেট ধবধবে সাদা কাগজের ব্যবহার, ঝকঝকে টকটকে ছাপা, শক্ত পেস্টিং বোর্ডের ওপর উন্নত মানের বিদেশি রেক্সিন দিয়ে বাইভিং, তার ওপর ১৭০ গ্রামের চার রঙা ঝকঝকে আকর্ষণীয় মলাট, দেখলে চোখ জড়িয়ে যায়।

যুবা-বৃদ্ধ সব বয়সের পাঠকদের পড়তে অসুবিধা না হয় মতো তুলনামূলক বড় অক্ষরে ছাপানো হয়েছে ত্রিপিটকের সবগুলো বই।

ত্রিপিটকের কোন বইয়ে কোন সূত্রটি রয়েছে সেটি চট করে খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রত্যেক ত্রিপিটক সেটের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ সূচিপত্র সম্বলিত একটি রেফারেন্স গাইড সরবরাহ করা।

পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটক সেটের মূল্য : ২০,০০০/- টাকা

সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনা উপলক্ষে স্মারক গ্রন্থ

বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়

২৫ আগস্ট ২০১৭

সম্পাদনায়

ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু (আহ্বায়ক) বিধুর ভিক্ষু (সদস্য) করুণাবংশ ভিক্ষু (সদস্য)





প্রকাশকাল : ২৫ আগস্ট ২০১৭; ২৫৬১ বুদ্ধবর্ষ প্রকাশনায় : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ গ্রাফিক্স ডিজাইন : রানা মুৎসুদ্দি, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম কম্পিউটার কম্পোজ : বিপুলানন্দ ভিক্ষু, রাজবন বিহার, রাঙামাটি

Published On:

2561 Buddha Era 25 August 2017

Published by:

Tripitak Publishing Society, Bangladesh Khagrachari Hill District

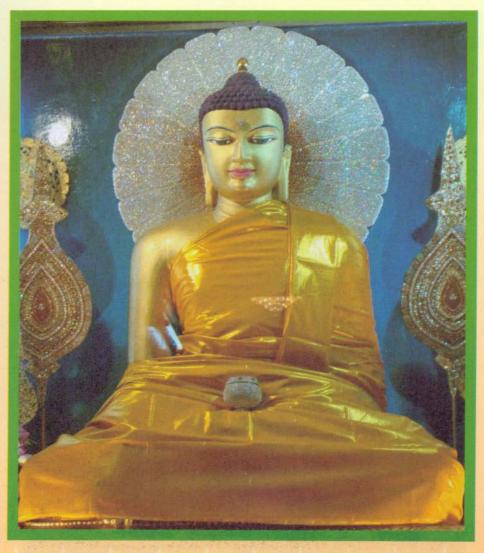
Graphics Design:

Rana Mutsuddi Andarkilla, Chittagong, Bangladesh

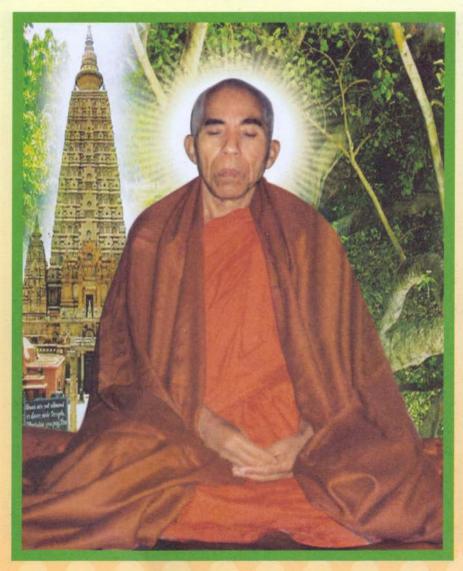
Computer Compose:

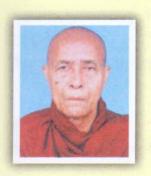
Bipulananda Bhikkhu Rajbana Vihar, Rangamati













সংঘরাজ ড. ধর্মসেন মহাস্থবির অগগমহাসদ্ধর্মজ্যোতিকাধ্বজ ত্রিপিটক সাহিত্য চক্রবর্তী অধ্যক্ষ উনাইনপুরা লঙ্কারাম বিহার

এই প্রথম বাংলায় পুরো ত্রিপিটকের ৫৯টি গ্রন্থকে ২৫ খণ্ডে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত, পুলকিত। এই ত্রিপিটক প্রকাশের দিনটিকে ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' নামে একটি মনোজ্ঞ স্মরণিকা প্রকাশের জন্য সোসাইটিকে এবং উক্ত স্মরণিকা প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বাইকে সাধুবাদ।

প্রায় দেড় শতাধিক বছরেরও অধিককাল যাবৎ বাংলা ভাষাভাষী অনেক বৌদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ, পভিত গবেষক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় এবং ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার উদ্যোগ না থাকার দক্রন এতদিন সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি বাংলাদেশ-এর সমন্বিত ও একনিষ্ঠ কর্ম প্রচেষ্টায় তা সম্ভব হলো। এটা সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী বৌদ্ধদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। সেজন্য আমি ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ-এর সংশ্লিষ্ট সবাইকে ও বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে অশেষ সাধুবাদ প্রদান করছি এবং সোসাইটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি।

रिम विन द्राया मि

(ড. ধর্মসেন মহাস্থবির)

দ্বাদশ সংঘরাজ এবং

অধ্যক্ষ

উনাইনপুরা লঙ্কারাম বিহার





শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার স্থবির বনভন্তের শিষ্যসংঘের প্রধান ও আবাসিক প্রধান রাজবন বিহার, রাঙামাটি

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটকের ৫৯টি বইকে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নাম দিয়ে সর্বমোট ২৫ খণ্ডে প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করার এই মহতী উদ্যোগকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। আর ত্রিপিটক প্রকাশের দিনটিকে ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' নামে একটি মনোরম স্মরণিকা প্রকাশের জন্য ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি বাংলাদেশ ও উক্ত স্মরণিকা প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বাইকে সাধুবাদ।

ত্রিপিটক হলো বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। আর বুদ্ধজ্ঞান লাভ করতে বুদ্ধের শিক্ষা, উপদেশ প্রয়োজন। গৃহ নির্মাণের উপকরণ যেমন- ইট, বালি, সিমেন্ট, লৌহা, বাঁশ, গাছ ইত্যাদি। এসব উপকরণ ছাড়া যেমন একটি ঘর নির্মাণ করা যায় না। ঠিক তেমনি, দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের জন্য প্রয়োজন সত্যজ্ঞানের। আর এ সত্যজ্ঞান উৎপন্ন করার উপাদান হলো ত্রিপিটক শাস্ত্র আচরণ, প্রতিপালন ও কর্ম সম্পাদন করা। তাই প্রত্যেক মুক্তিকামী মানবেরই উচিত ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়ন করা।

পরম পূজ্য সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের স্বপ্ন ছিল সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। দেরিতে হলেও পরম পূজ্য ভন্তের সেই স্বপ্ন বাস্তব রূপদান করে দেয়ার জন্য আমি ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ এবং ত্রিপিটক প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি সাধুবাদ প্রদান করছি।

'জয়তু বুদ্ধসাসনম্! জয়তু বনভন্তে!' 'জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক!'

व्यक्तिन कार्

(শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির)





Raja Devasish Roy
Barrister-at-Law
Chakma Chief
Chief Patron
Rajvana Vihara
President
Raj Vihara
Managing Committee
Rajbari, Rangamati, 4500
Chittagong Hill Tracts
Bangladesh

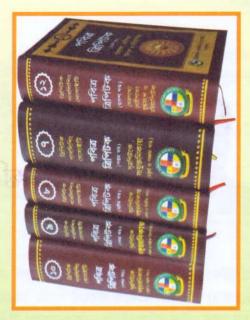
Tel (Ps): +880 155 657 3283 E-mail: droywangza@gmail.com

'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ' বাংলা ভাষায় প্রথমবারের মতো পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড) একসঙ্গে প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। এতে করে এদেশের সদ্ধর্ম প্রাণ বৌদ্ধর্মাবলম্বীরা বুদ্ধের অমূল্য উপদেশ-বাণীগুলো জানার ও পরিচিত হওয়ার দুর্লভ সুযোগ লাভ করতে সক্ষম হবে।

মহান ও দুর্লভ বুদ্ধপুত্র পূজ্য বনভন্তের স্বপ্ন ছিল, একদিন সমগ্র ত্রিপিটক বাংলা ও চাকমা ভাষায় প্রকাশিত হবে। দুঃখমুক্তিকামী মানুষ সেগুলো পড়ে বুদ্ধের ধর্মকে জানবে, নির্বাণ লাভ করবে। পূজ্য বনভন্তের সেই স্বপ্ন আজ আংশিকভাবে হলেও পূরণ হতে চলেছে। বিগত কয়েক বছর আগে প্রতিষ্ঠিত 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি'র এই মহৎ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।

(রাজা দেবাশীষ রায়) চাকমা রাজা





ত্রিপাসো হতে প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটক সেটটি (২৫ খণ্ডে) নিজের জন্য, বিহার কিংবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য সংগ্রহ করতে চাইলে আজই যোগাযোগ করুন।

> প্রগতি চাকমা : ০১৭৭৫-১৯৬১১৭ (রাঙ্গামাটি) সন্ট বিকাশ চাকমা (হোক্কে) : ০১৮২০-৩১৪৪৯৪ (রাঙ্গামাটি) রত্ন কুমার চাকমা : ০১৫৫৬-৫৩৪৬৬৭ (খাগড়াছড়ি)

পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটক সেটের মূল্য : ২০,০০০/- টাকা

বুদ্ধবাণী

অথ খো ভগৰা আযশ্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি— ''সিযা খো পনানন্দ, তুস্থাকং এৰমস্স— 'অতীতসত্মুকং পাৰচনং, নখি নো সত্থা'তি। ন খো পনেতং, আনন্দ, এৰং দট্ঠব্বং। যো ৰো, আনন্দ, মযা ধশ্মো চ ৰিনযো চ দেসিতো পঞ্জাতো, সো ৰো মমচ্চযেন সত্থা।''

বাংলা অনুবাদ: অতঃপর ভগবান আয়ুম্মান আনন্দকে সম্বোধন করে বললেন, 'হে আনন্দ, তোমাদের হয়তো এরূপ মনে হতে পারে যে, শাস্তার উপদেশ অতীত হয়ে গিয়েছে, আমাদের শাস্তা এখন আর নেই। হে আনন্দ, তোমরা কখনো এমনটি ভাববে না। হে আনন্দ, আমি যে ধর্ম ও বিনয় দেশনা করেছি, প্রজ্ঞাপ্ত করেছি, আমার মৃত্যুর পর তা-ই তোমাদের শাস্তা বা শিক্ষক।'

তথ্যসূত্র: মহাপরিনির্বাণ সূত্র, দীর্ঘনিকায় (দ্বিতীয় খণ্ড)

একং সময়ং ভগৰা কোসম্বিয়ং ৰিহরতি সিংসপাৰনে। অথ খো ভগৰা পরিত্তানি সীসপাপণ্ণানি পাণিনা গহেতা ভিক্ষ্ আমন্তেসি— "তং কিং মঞ্জঞ্ব, ভিক্খৰে, কতমং নু খো বহুতরং— যানি ৰা মযা পরিত্তানি সীসপাপণ্ণানি পাণিনা গহিতানি যদিদং উপরি সীসপাৰনে" তি? "অপ্পমন্তকানি, ভল্তে, ভগৰতা পরিত্তানি সীসপাপণ্ণানি পাণিনা গহিতানি; অথ খো এতানেৰ বহুতরানি যদিদং উপরি সীসপাৰনে" তি। "এবমেৰ খো, ভিক্খৰে, এতদেৰ বহুতরং যং ৰো মযা অভিক্র্ঞায় অনক্খাতং। কম্মা চেতং, ভিক্খৰে, মযা অনক্খাতং? ন হেতং, ভিক্খৰে, অখসংহিতং নাদিব্রক্ষচরিয়কং ন নিব্বিদায় ন বিব্বানায় সংৰত্তি; তম্মা তং মযা অভিক্রপ্রায় ন সম্বোধায় ন নিব্বানায় সংৰত্তি; তম্মা তং মযা অনক্খাতং"।

বাংলা অনুবাদ : একসময় ভগবান কোশাম্বীর সিংসপা বনে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর ভগবান এক মুঠো সিংসপা গাছের পাতা হাতে নিয়ে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন :

'হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের কী মনে হয়, আমার হাতে নেওয়া এক মুঠো সিংসপা গাছের পাতাগুলো বেশি হবে, নাকি এই সিংসপা বনের গাছের পাতাগুলো বেশি হবে?'

'ভন্তে, আপনার হাতে নেওয়া এক মুঠো সিংসপা গাছের পাতাগুলো অতি অল্প, আর এই সিংসপা বনের গাছের পাতাগুলো এর চাইতে অনেক অনেক বেশি।'

'ঠিক তদ্রুপ, হে ভিক্ষুগণ, নিজ অভিজ্ঞা দারা প্রত্যক্ষরূপে যা কিছু জেনেছি তার অধিকাংশই আমি প্রকাশ করিনি। কেন প্রকাশ করিনি? কারণ, হে ভিক্ষুগণ, সেগুলো সদর্থক নয়, ব্রহ্মচর্যজীবনের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ নয়, এবং সেগুলো নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের দিকে পরিচালিত করে না। সেজন্যই আমি সেগুলো প্রকাশ করিনি।'

তথ্যসূত্র: সিংসপা বন সূত্র, সংযুক্তনিকায় (পঞ্চম খণ্ড)

সূ চি প ত্ৰ

•	ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি : কিছু প্রাসঙ্গিক কথা১ মধু মঙ্গল চাকমা
•	প্রসঙ্গ : পূজ্য বনভন্তের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার মহান ইচ্ছা পূরণ৪ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু
•	বাংলাভাষীদের পরম সৌভাগ্য১০ প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো
•	বুদ্ধবচন 'ত্রিপিটক' বাংলা ভাষায় অনূদিত : কিছু প্রাসঙ্গিক কথা১৪ ড. জিনবোধি ভিক্ষু
•	'ত্রিপিটক' : তিনটি পেটিকা, তাদের স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা
•	এই প্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ: একটি অবিস্মরণীয় ও ঐতিহাসিক মাইলফলক৩০ ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
•	ত্রিপিটক, ত্রিপাসো ও বৌদ্ধ সমাজ৩৫ শোভিত ভিক্ষু
•	প্রজ্ঞারত্ন ভাগ্তার : বলো কোথা পাবো তারে? শ্রীমৎ সানু কীর্তি ভিক্ষু
•	মানবতা ও বৌদ্ধধর্ম ৫২ ড. সুধীন কুমার চাকমা
•	শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সুদূরপ্রসারী ভাবনা ও ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ-এর কার্যক্রম পর্যালোচনা৫৪ অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া

 সদ্ধর্মের পুনর্জাগরণে পূ সুনীতি বিকাশ চাকমা (স 	জ্য বনভন্তের অবদান ক্ব)	৫৬
● আমাদের সমাজ এবং ধ প্রিয় কুমার চাকমা	ধর্ম	৬o
 চাকমাদের বৌদ্ধ ধর্মচর্চ সুসময় চাকমা 	ি : বৌদ্ধ রঞ্জিকা হতে ত্রিপিটক	৬৭
 বুদ্ধের শিক্ষাদর্শনে মান- অধ্যাপক ড. বিমান চন্দ্র: 	বতাবাদ : একটি পর্যেষণা বড়ুয়া	૧૦
 শ্রাদ্ধেয় বনভন্তে ও বাংল কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা 	া ভাষায় সমগ্ৰ ত্ৰিপিটক প্ৰকাশনা	૧૯
 ত্রিপিটক সংকলন প্রকারে আনন্দ বিকাশ চাকমা 	শের তাৎপর্য	99
	সাইটি প্রতিষ্ঠার পটভূমি ও সোসাইটির সামগ্র	
	ষদগুলোর সচিত্র পরিচিতি	

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি : কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

মধু মঙ্গল চাকমা

ত্রিপিটক বৌদ্ধধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ। তথাগত ভগবান সম্যকসমুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণী ত্রিপিটকে সংকলিত। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ইতোপূর্বে সম্পূর্ণ ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশিত হয়নি। এতদঞ্চলের বৌদ্ধ ইতিহাসে উজ্জল অধ্যায় মহান পুণ্যপুরুষ শ্রাবকবুদ্ধ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের আবির্ভাব। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় অমৃতোপম ধর্মবারি বর্ষণ করে অগণিত মানুষকে সদ্ধর্মে সিক্ত করেছেন। তাঁর ধর্মদেশনায় ব্যক্ত অন্যতম একটি আশা ও স্বপ্ন ছিল সমগ্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ প্রকাশ করা যাতে সকলের উপদেশবাণীগুলো পড়ার, জানার ও উপলব্ধি করার সুযোগ হয় এবং সে অনুযায়ী আচরণ ও প্রতিপালন করে যেন দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারে।

পরম পূজ্য বনভন্তের সেই আশা ও স্বপ্লকে বাস্তব রূপদানের লক্ষ্য নিয়েই ২০১২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখে খাগড়াছড়িতে 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি'. বাংলাদেশ নামে একটি ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে সেপ্টেম্বর মাস হতেই পুরোদমে সংস্থার কার্যক্রম শুরু করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সোসাইটির সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ করুণাবংশ স্থবির মহোদয় হতে এরূপ জানা যায়, তাঁর (শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ করুণাবংশ স্থবির), সম্পাদনা পরিষদের আহ্বায়ক শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত মহাস্থবির ও সদস্য শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বিধুর মহাস্থবির তাঁদের তিনজনের অভিনু ইচ্ছা যে, সমগ্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশের মাধ্যমে পরম পূজ্য বনভন্তের আশা ও স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করা। সে লক্ষ্যে তাঁরই (শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ করুণাবংশ স্থবির ভন্তের) উপদেশ-পরামর্শ অনুযায়ী ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা २য় ।

প্রকাশনা সংস্থাটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে হলো সমগ্র ত্রিপিটক বাংলা ও চাকমা ভাষায় অনুবাদপূর্বক ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা এবং আগ্রহী পাঠক সমাজে বিতরণ ও বিভিন্ন ধর্মীয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা। শুধু তাই নয় গবেষকদের বৌদ্ধর্ম বিষয়ক মূল্যবান গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করাও এই প্রকাশনা সংস্থাটির অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তার পাশাপাশি প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধধর্মীয় পবিত্র তিথি ও পূর্ণিমা উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশ করা। এ ছাড়া সমগ্র ত্রিপিটক বাংলা হরফে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করার পর পবিত্র গ্রন্থগুলো পাঠাগারের মাধ্যমে সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করা।

উল্লেখ্য যে, ১৮৪৪ সালে কালিন্দী রানি চাকমা জনগণের নেতা হন। তাঁর আমলেই সর্বপ্রথম বুদ্ধের বাণীগুলো বাংলায় (বৌদ্ধ রঞ্জিকা) অনুবাদ করা হয়। তিনি রাজা ধরম বক্স খাঁকে বিয়ে করেন।

আমরা সবাই জানি যে ধর্মশ্রবণ ও ধর্মগ্রন্থ পাঠে জ্ঞান লাভ হয়। জ্ঞান লাভ হলে একজন মানুষ আলোকিত ও সম্মানিত হয়ে সমাজ, জাতি ও দেশের মঙ্গল ও উন্নতি সাধন করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ পরম পূজ্য সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে আবির্ভাবের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্মের নবজাগরণ সৃষ্টি হয়। বনভন্তে একজন মহান সাধক বহুগুণে গুণান্বিত, অলৌকিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত সিদ্ধ মহাপুরুষ। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি সমগ্র ত্রিপিটক বাংলা ভাষায় এবং চাকমা ভাষায় প্রকাশ করার মহান এক স্বপ্ন ও আশার কথা ব্যক্ত করেছেন।

অপ্রকাশিত ত্রিপিটক অনুবাদ করে প্রকাশ করা এবং অনূদিত ত্রিপিটক পুনর্মুদ্রণের মাধ্যমেই পরম পূজ্য বনভন্তের আশা ও স্বপ্লকে বাস্তব রূপদান করা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশনাও ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটির লক্ষ্য। ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পর ইতোমধ্যেই ছয়টি পিটকীয় বই প্রকাশ করা হয়েছে। অতঃপর সম্পাদনা পরিষদের কর্মপরিকল্পনা অনুসারে প্রথমবারের মতো একসঙ্গে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনার জন্য বিশেষ গুরুত্বসহকারে কার্যাবলি সুসম্পন্ন করার লক্ষ্যে বিগত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ খ্রি. তারিখ নয় সদস্যবিশিষ্ট 'বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনা কমিটি' গঠন করা হয় এবং একসঙ্গে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনার বিষয়, গ্রাহক হিসেবে নিবন্ধন পদ্ধতি, মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদি সম্পর্কে 'এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক!!' শিরোনামে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। পরম পূজ্য

এই দিনেই বাংলার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বাংলায় অনূদিত সমগ্র ত্রিপিটকের মোড়ক উন্মোচন এবং গ্রাহকদের নিকট বিতরণ করা হয়।

এমন মহান ও ঐতিহাসিক দিনে আমরা পূজ্য বনভন্তের অবদান ও কীর্তিগুলো সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। তিনি আজ মরেও অমর, তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী। কবির ভাষায় বলতে হয়: "সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে"। বিশ্বের লক্ষ কোটি লোক তাঁর উপদেশবাণী ও কীর্তিগুলো যুগ যুগ ধরে স্মরণ করবেন।

পাকিস্তান ও বৃটিশ আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রকৃতিপূজা ও দেবদেবীর পূজায়

বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাসে ২৫ আগস্ট ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ দিনটি বাংলায় পূর্ণাঙ্গ ও সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক ও গৌরবময় স্মরণীয় দিন। কারণ এই দিনেই বাংলার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বাংলায় অনূদিত সমগ্র ত্রিপিটকের মোড়ক উন্মোচন এবং গ্রাহকদের নিকট বিতরণ করা হয়।

বনভন্তের শিষ্যসংঘের প্রধান ও রাজবন বিহার আবাসিক প্রধান ও 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি'র উপদেষ্টা পরিষদের আহ্বায়ক শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির বিগত ৩০ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ রাজবন অফসেট প্রেসে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটকের ছাপার কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ উদ্বোধন করেন। উক্ত মহান পুণ্যানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায় এবং রাজবন বিহারের উপাসক-উপাসিকা পরিষদের সম্মানিত সিনিয়র সহ-সভাপতি বাবু গৌতম দেওয়ান, পরম পূজনীয় ভিক্ষুসংঘ এবং সদ্ধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়িকাবৃন্দ।

বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাসে ২৫ আগস্ট ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ দিনটি বাংলায় পূর্ণাঙ্গ ও সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক ও গৌরবময় স্মরণীয় দিন। কারণ অভ্যস্ত ছিলেন। এমনকি কোনো ধরনের আপদ-বিপদএর সম্মুখীন হলে তাঁরা দেবদেবীর করুণা লাভের
আশায় গৃহপালিত হাঁস-মুরগী ও অন্যান্য পশুপাখি পর্যন্ত
বলিদান করতেন। বিশেষ করে পাহাড়-পর্বতের গুহায়
এবং নদী-ঝরনায় এসব বলিদান প্রথা স্মরণাতীত কাল
থেকে আদিম সমাজে প্রচলিত ছিল। পরম পূজ্য
বনভন্তের উপদেশবাণীর ফলে আজ চাকমা, মারমা,
তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।
বর্তমানে চাকমা সমাজে পশুপাখি বলিদান, প্রকৃতিপূজার
প্রথা বিলুপ্তপ্রায়। আজ পার্বত্য চউগ্রামের চাকমা, মারমা,
তঞ্চঙ্গ্যা ও বড়ুয়া সমাজ উন্নত এবং কুসংস্কারমুক্ত এবং
প্রত্যেকের জীবনে জ্ঞানচক্ষু উদয় হয়েছে।

স্বতঃস্কৃত্ভাবে শ্রদ্ধাচিত্তে মাসিক শ্রদ্ধাদান এবং এককালীন শ্রদ্ধাদান দিয়ে আর্থিকভাবে সোসাইটির

বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়

প্রকাশনা কার্যক্রমকে সফল করার জন্য ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটির সকল সদস্য/সদস্যা এবং এককালীন শ্রদ্ধাদানকারীগণকে কৃতজ্ঞতা জানাচছি। দৃঢ় প্রত্যয়ে নিরলস পরিশ্রম, ধৈর্য, মেধা ও দক্ষতার গুণে এই প্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনার পরিপূর্ণ সফলতায় অবদানের জন্য শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রগুপ্ত মহাস্থবির মহোদয়ের নেতৃত্বে গঠিত সোসাইটির সম্পাদনা পরিষদকে জানাই সকৃতজ্ঞ বিনম্র শ্রদ্ধা এবং বন্দনা। তাঁদের নিরলস পরিশ্রম ধৈর্য ও কর্মদক্ষতার গুণে সমগ্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড) বাংলায় প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়েছে। আমরা তাঁদের কাছে চিরঋণী এবং তাঁদের অবদান বৌদ্ধসমাজে চিরভাম্বর হয়ে থাকবে।

উপদেষ্টা পরিষদের ঐকান্তিক সুদৃষ্টি এবং আশীর্বাদের ফলে ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটির সার্বিক কার্যক্রম অন্তরায়হীনভাবে পরিচালিত হওয়ায় উপদেষ্টা পরিষদের প্রতিও নতশিরে বন্দনা এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটিকে সমাজ সেবা কার্যালয়ে সরকারিভাবে নিবন্ধনের কাজ সম্পন্ন করে দেয়ার জন্য বাবু অমল বিকাশ চাকমা, জেলা সমজাসেবা অফিসার, খাগড়াছড়ি ও বাবু চম্পক কান্তি চাকমা, মাঠ পরিদর্শক, সমাজসেবা বিভাগকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ যাবৎ কালগত সদস্য/সদস্যাগণের পারলৌকিক মঙ্গল-সুখ-শান্তি কামনা ও প্রার্থনা করছি। পরম পূজ্য বনভন্তে জীবদ্দশায় ব্যক্ত 'বাংলায় অনুবাদ করা ত্রিপিটক পড়ে যাতে সকলে বুদ্ধের উপদেশবাণীগুলো পড়ার, জানার ও উপলব্ধি করার সুযোগ হয় এবং সে অনুযায়ী আচরণ ও প্রতিপালন করে যেন দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারে' পরম পূজ্য বনভন্তের এই আশার বাণী বৌদ্ধ নরনারীর হৃদয়ে আন্দোলিত হোক, একান্তভাবে এই কামনা করি।

এ জগতে মানবসমাজের মধ্যে অপরাপর শিক্ষার যেমন রীতি আছে। তেমনি মানুষ মাত্রেরই স্ব স্ব ধর্মশিক্ষার প্রয়োজন আছে। তাই বাংলা ভাষায় অনূদিত ত্রিপিটক গ্রন্থগুলো পাঠ করে যদি আমরা সদ্ধর্মজ্ঞান অর্জন করতে পারি এবং সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ হয়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তাহলে পরম সুখ লাভ হবে। আর তখনই কেবল যাঁরা অনুবাদক হিসেবে এবং যারা প্রকাশনা কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের কষ্ট সফল এবং সার্থকতায় পর্যবিসিত হবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। ■

সকলে সকল প্রকার অন্তরায়, দুঃখমুক্ত হোক! সকলে কায়িক ও মানসিকভাবে সুখী হোক!

^{*} **লেখক পরিচিতি :** মধু মঙ্গল চাকমা, সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ; প্রাক্তন অধ্যাপক, খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ।

প্রসঙ্গ : পূজ্য বনভন্তের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার মহান ইচ্ছা পূরণ

ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু

ভগবান বুদ্ধ ৪৫ বছরব্যাপী সত্ত্বগণের হিতসুখ ও মঙ্গলের জন্য বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এবং বিভিন্ন জনকে উপলক্ষ করে উপদেশ প্রদান করেছিলেন তার-ই সমন্বিত রূপ হলো ত্রিপিটক। এই ত্রিপিটক বুদ্ধের হিতোপদেশ, কথোপকথন, বচন, উপাখ্যান ও বিধি-বিধান বিষয়ক পরিপূর্ণ এক বিশাল, বিস্তৃত শাস্ত্রবিশেষ। ত্রিপিটকের ভাষা হলো পালি ভাষা। এ প্রসঙ্গে ড. সুকোমল বড়ুয়া ও ড. সুমন কান্তি বড়ুয়ার যৌথভাবে লিখিত 'ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ' গ্রন্থের কিছু কথা উল্লেখ করছি।

"গৌতম বুদ্ধ কোশলে জন্মগ্রহণ করে তাঁর ধর্মাদর্শ প্রচারের জন্য সমগ্র উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিহার ও সংঘারাম গড়ে উঠেছিল। শ্রাবন্তী, জেতবন, পূর্বারাম, বেণুবন, নালন্দা ও চাপালচৈত্য প্রভৃতি স্বনামখ্যাত বিহার ও সংঘারাম তারই তত্ত্বাবধানে হয়েছিল। এগুলো শুধু বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আবাসস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হতো না। বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চা তথা ভারতীয় সংস্কৃতির মিলনকেন্দ্রও ছিল এগুলো। এখানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হতে আগত হাজার হাজার নর-নারী সমন্বিতভাবে বসবাস করতেন। এখানে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার পরিবর্তে সর্বজনবোধ্যতার তাগিদে পালি ভাষার প্রচলনের প্রয়াস ঘটে। ক্রমে বৌদ্ধ ভিক্ষুমণ্ডলী ধর্মালোচনা মাধ্যম হিসেবে এ ভাষাতেই দক্ষতা অর্জন করেন। বুদ্ধ নিজেও ভিক্ষুসংঘকে এ ভাষায় ধর্মদেশনা দিতেন। তাই পরবর্তীকালে এ ভাষাতেই মূল ত্রিপিটক গ্রন্থ রচিত ও সংরক্ষিত হয়। পালি ভাষার আরও এক নাম মাগধী (সিংহল ও মায়ানমার পণ্ডিতেরা মাগধী নিরুক্তি বলে অভিহিত করেন)। ঐতিহাসিক পর্যালোচনার নিরিখে বলা যায়, বুদ্ধের জীবদ্দশায় প্রভাবশালী রাজ্য মগধে এ

ভাষা প্রচলিত ছিল বলে এটিকে মাগধী বলা হয়।"

পালি ভাষাকে মাগধী ভাষা হিসেবে অভিহিত করা সম্পর্কে ড. দিলীপ কুমার তাঁর লিখিত 'পালি ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে শ্রীলংকার ঐতিহাসিক ঐহিত্য বলে খ্যাত 'চূলবংশ' এবং 'মহারূপসিদ্ধি' নামক গ্রন্থদ্বয়ের কয়েকটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে আমি 'মহারূপসিদ্ধি' গ্রন্থের উদ্ধৃতিটুকু আলোকপাত করছি।

সা মাগধী মূলভাসা নরা যাযাদিকপ্পিকা ব্রাহ্মণ চ'স্সুত-লাপা, সমুদ্ধ চাপি ভাসরে। অর্থাৎ, সেই মাগধীই আদি ভাষা যে ভাষায় দেবগণ, নরগণ, ব্রাহ্মণগণ এমনকি সমুদ্ধগণ পর্যন্ত কথা বলতেন।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, ভগবান বুদ্ধ মাগধী বা পালি ভাষায় তাঁর নবলব্ধ ধর্ম প্রচার করেছিলেন। বুদ্ধের সেসব বাণী শিষ্যপরম্পরায় পালি ভাষাতে রক্ষিত হয়েছিল এবং এ ভাষাতেই ত্রিপিটক (তথা ত্রিপিটক গ্রন্থ) রচিত হয়েছিল। খ্রি. পূ. তৃতীয় শতকে এই ত্রিপিটক মহিন্দ স্থবির কর্তৃক সর্বপ্রথম শ্রীলংকায় নীত হয়। পরবর্তীকালে এই ত্রিপিটকই বৌদ্ধপ্রধান দেশের ভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভাষায় অনূদিত হয়। তবে যেকোনো বিতর্কে ও দুর্বোধ্যকালে পালি ত্রিপিটককেই প্রমিত রূপ বলে গণ্য করা হয়। পালি ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার সম্পর্ক নিবিড় ও সুগভীর হলেও ত্রিপিটক বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার কাজ শুরু হয় বেশ পরে। ১৯৩০ সালে অগ্রমহাপণ্ডিত ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার অনন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বাংলায় অনূদিত ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলো ছাপানোর জন্য তিনি রেঙ্গুনে 'বৌদ্ধ মিশন প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালে বোমার আঘাতে প্রেস

ধ্বংস হয়ে গেলে কিছুসংখ্যক ত্রিপিটিকের গ্রন্থ প্রকাশের পর মহাস্থবির মহোদয়ের উদ্যোগটির পরিসমাপ্তি ঘটে। উল্লেখ্য যে, অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহোদয়ের উদ্যোগটির পরিসমাপ্তি ঘটলেও সেটা বৌদ্ধদের শ্রদ্ধার বাংলাভাষী সঙ্গে পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের পালি শিক্ষার সঙ্গে জড়িত বরেণ্য ভিক্ষু ও বিদ্বজ্জনের প্রচেষ্টায় ত্রিপিটকের কিছু কিছু গ্রন্থ অনূদিত হতে থাকে বিচ্ছিন্ন উদ্যোগে। সম্মিলিত উদ্যোগের অভাবে বেশ কিছু গ্রন্থ অননূদিত থেকে যায়। পরম পূজ্য বনভত্তে পার্বত্যাঞ্চল তথা বাংলাদেশে থেরবাদী বুদ্ধধর্মের শিক্ষা, সংস্কৃতির চর্চা জাগরণে ও ভিত রচনায় অগ্রদূত হিসেবে আবির্ভূত হন বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। তিনি প্রকৃত বুদ্ধধর্ম প্রচার-প্রসার ও এর চর্চা জাগরুক করে রাখার জন্য বেশ অত্যাবশ্যকীয় কিছু পরিকল্পনা, উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তনাধ্যে অন্যতম একটি হলো ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ এবং প্রকাশ করা।

পূজ্য বনভন্তের এই উদ্যোগ গ্রহণ করার পেছনেও তাঁর সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের ছাপ রয়েছে। পূজ্য ভন্তে কখন ও কীভাবে এই উদ্যোগ গ্রহণ করেন, সেটা জানার জন্য নিচের ঘটনাগুলো আলোকপাত করা জরুরি মনে করছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এগুলো অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। অন্ততপক্ষে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তা-ই বলে। ১৯৯৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে শ্রন্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ ভন্তে পূজ্য বনভন্তের সান্নিধ্যে অবস্থানের জন্য রাজবন বিহারে আসেন বর্ষাবাসের ঠিক কয়েকদিন আগে। বর্ষাবাস শুরু হবার কিছুদিন পর আমরা বেশ কিছুসংখ্যক ভিক্ষু প্রজ্ঞাবংশ ভন্তের কাছে একটা প্রার্থনা রাখলাম। তাকে বললাম, ভত্তে, আপনি তো পালি ভাষায় সুদক্ষ। আমরা চাই এই বর্ষাবাসের সময় আপনি আমাদের পালি শেখান। কারণ বুদ্ধের উপদেশগুলো হুবহু পড়তে বা জানতে চাইলে পালি ভাষা ছাড়া তো সম্ভব নয়। তাই আমাদের খুব ইচ্ছা পালি শিক্ষা করার। আমাদের প্রার্থনায় প্রজ্ঞাবংশ ভন্তেও সানন্দে রাজি হলেন। পরদিন থেকে তিনি আমাদের পালি শেখাতে লাগলেন ভোজনশালায়। তিন দিন শিক্ষা দেওয়ার পর প্রজ্ঞাবংশ ভন্তে বললেন, আচ্ছা, আমি তো তোমাদের আগ্রহ দেখে পালি শেখাচ্ছি, তবে পূজ্য বনভন্তের কাছ থেকে তো আমিও অনুমতি নিইনি, তোমরাও অনুমতি নাওনি। এটা তো বিনয়মতে ঠিক নয়। চল. আমরা পূজ্য ভন্তের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিই। প্রজ্ঞাবংশ ভন্তের প্রস্তাবমতো আমরা সবাই পূজ্য বনভন্তের সকাশে উপস্থিত হলাম। ভত্তেকে বন্দনা করার পর আমরা প্রজ্ঞাবংশ ভন্তের কাছে পালি শেখার অনুমতি প্রার্থনা করলাম। অমনি পূজ্য ভত্তে বললেন, আমি তো প্রজ্ঞাবংশকে তোমাদের পালি শিখাও বলতে পারবো না। আমি যদি সে-রকম বলি, তাহলে প্রজ্ঞাবংশের মনে উদয় হতে পারে, আমি কি বনভন্তের কাছে এসেছি শিক্ষকতা করার জন্যে? আমি দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের সাধনা করতে এসেছি। প্রজ্ঞাবংশ ভত্তে বললেন, না ভত্তে, আপনি শেখাতে বললে আমি সে-রকম মনে করব না। তবে আপনার অনুমতি ছাড়া তো শেখাতে পারবো না। অবশ্যই এদের শেখার বেশ আগ্রহ রয়েছে। পূজ্য ভত্তে অনেকক্ষণ ধর্মদেশনা প্রদান করলেন, তবে পালি শেখার জন্য সরাসরি অনুমতি প্রদান করলেন না। ফলে ১৯৯৬ সালে আমাদেরও পালি শিক্ষা গ্রহণ করা আর হলো না।

১৯৯৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে থাইল্যান্ডের মহিদুল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ও থাইল্যান্ডের মহামান্য রাজা ভূমিবল মহোদয়ের দানকৃত সমগ্র ত্রিপিটকের সফটওয়ার-এর একটি সিডি রোম আনন্দ বিহারের অধ্যক্ষ প্রজ্ঞানন্দ মহাস্থবির বাবু সুশোভন দেওয়ান ববির মাধ্যমে পুজ্য বনভন্তেকে প্রদান করেন। সে-সময় রাজবন বিহারে কোনো কম্পিউটার না থাকায় পুজ্য ভত্তে সিডি রোমটি প্রজ্ঞাসাধনা প্রকাশনীকে প্রদান করেন। আর বলেন, তোমরা ত্রিপিটকের খণ্ডগুলো প্রিন্ট আউট করে বই আকারে বাইভিং করে আমাকে দান করবে। ভত্তের নির্দেশ পেয়ে প্রজ্ঞাসাধনা প্রকাশনী সেই সিডি রোম হতে রোমান হরফে পালি ত্রিপিটক প্রিন্ট আউট করে বাইভিং করে বই আকারে বের করা শুরু করে। প্রথমদিকে প্রজ্ঞাসাধনা প্রকাশনীর নিজস্ব কম্পিউটার ও প্রিন্টার না থাকায় কাজটি বেশ মন্থর গতিতে চলতে থাকে।

১৯৯৯ সালের প্রথমার্ধে তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বাবু কল্পরঞ্জন চাকমা ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাদানে পূজ্য বনভন্তেকে একটি কম্পিউটার ও একটি প্রিন্টার দান করেন। সেই কম্পিউটার ও প্রিন্টারটি কাজে লাগিয়ে এবার রাজবন বিহারের ভিক্ষুসংঘও ত্রিপিটিকের খণ্ডগুলো প্রিন্ট আউট করে বই আকারে বের করার উদ্যোগী হন। এদিকে ২০০২ সালে বাবু সুশোভন দেওয়ান ববি থাইল্যাভ শ্রমণে গেলে ব্যক্তিগত উদ্যোগে

মহিদুল বিশ্ববিদ্যালয় হতে সমগ্র ত্রিপিটকের সফটওয়ার সিডি রোম কিনে আনেন; আর সেটা পূজ্য বনভন্তেকে দান করেন ২০০২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারিতে। এতে করে ভিক্ষুসংঘের উদ্যোগটি দ্রুতটার সঙ্গে পূর্ণতা পেতে থাকল।

পরবর্তীকালে Vipassana Research Institute কর্তৃক ধারণকৃত ষষ্ঠ সঙ্গায়নে সংকলিত সমগ্র ত্রিপিটকের সিডি রোমটি অক্ষরান্তরকারী সফট্ওয়ার-এর মাধ্যমে হিন্দি হরফে থেকে বাংলা হরফে পরিণত করার একটি সফট্ওয়ার তৈরি করতে সমর্থ হন Software Designer & Developer বাবু তপনালো খীসা। তিনি তার বহু মেধা ও শ্রমে তৈরিকৃত Software-টি ত্রিপিটকের খণ্ডগুলো বাংলা হরফে প্রিন্ট আউট করে বই আকারে বের করার জন্য পূজ্য বনভন্তেকে তথা রাজবন বিহারে দান করেন। এরপর থেকে বাংলা হরফে ত্রিপিটকের খণ্ডগুলো প্রিন্ট আউট করে বই আকারে বের করার এক নব অধ্যায় শুরু হয়। বাংলা হরফের সেসব ত্রিপিটকের খণ্ডণ্ডলো পূজ্য ভন্তেকে দান করতে থাকলেন দায়ক-দায়িকারা। পূজ্য ভন্তেও বেশ আগ্রহভরে সেই বাংলা হরফের পালি ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলো পড়তে থাকলেন। এমনো দেখা গেছে, ভন্তে ত্রিপিটকের সেই খণ্ডণ্ডলো পড়ার সময় কেউ তাঁর কাছে গিয়ে বন্দনা করতে চাইলেও বিরক্তবোধ করতেন। এর জন্য অনেক ভিক্ষু-শ্রামণকে ধমক খেতেও হয়েছে। এ সময় পূজ্য ভন্তের সতিপট্ঠান সুত্ত অট্ঠকথা গ্রন্থটি খুবই মনঃপুত হয়। এক পর্যায়ে পূজ্য ভত্তে সতিপট্ঠান সুত্ত অট্ঠকথা গ্রন্থের কম্পিউটার প্রিন্ট আউট করা বইটি প্রজ্ঞাবংশ ভন্তের হাতে তুলে দিয়ে বাংলায় অনুবাদ করার নির্দেশ দেন। অমনি প্রজ্ঞাবংশ ভত্তে তাঁর জীবনের প্রথম পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদের কাজে হাত দেন। অনুবাদের কাজ সমাপ্ত করে তিনি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিটি পুজ্য ভন্তের হাতে অর্পণ করেন। ভন্তে পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পড়ে খুব প্রসন্ন চিত্তে অনুবাদের কাজ অনুমোদন করেন; আর সহসা বই আকারে ছাপানোর নির্দেশ দেন ভিক্ষুসংঘকে। রাজবন বিহারের উপাসক-উপাসিকা পরিষদ কর্তৃক বইটি ছাপানো হয়। এরপর পূজ্য বনভন্তে প্রজ্ঞাবংশ ভত্তেকে দিয়ে সম্যক দৃষ্টি সূত্র অট্ঠকথা, অগ্নিস্কন্ধোপমো সূত্র ও ভাবনা সূত্র, ভিক্ষুণী-বিভঙ্গ, ভিক্ষুণী-প্রাতিমোক্ষ, বিনয়পিটকে পরিবার প্রভৃতি গ্রন্থগুলো বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নেন। অন্যদিকে প্রজ্ঞাবংশ ভন্তেও নিজেকে শক্তিশালী অনুবাদক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন। প্রজ্ঞাবংশ ভন্তের এই অনুবাদ কাজের দক্ষতা দেখে পূজ্য বনভন্তে বেশ খুশি হন এবং ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থগুলো অনুবাদ করিয়ে নেয়ার বহুদিনের ইচ্ছেটা পুরণ করার পথ খুঁজে পান। মোট কথা, ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা ও প্রকাশ করা উদ্যোগটি গ্রহণ করতে উৎসাহী হন।

এ সময় তিনি তাঁর প্রায় প্রতিটি দেশনায় ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে নেয়ার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। এমনকি বাংলায় ত্রিপিটক অনুবাদ করে নেয়ার তাঁর মহান ইচ্ছা, পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন সবিস্তারে। অন্যদিকে এতদঞ্চলে বুদ্ধের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত, রক্ষার জন্য ত্রিপিটক শিক্ষা, গবেষণা করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। দেশনার মাঝে তিনি আরও বলেন, প্রজ্ঞাবংশ পালি ভাষায় বেশ দক্ষ। আমার কথামতো অমুক অমুক বইটি পালি হতে বাংলায় অনুবাদ করেছে; আমারও বেশ মনঃপুত হয়েছে। অনুবাদের কাজে সে যদি আরও কয়েকজন ভিক্ষুর সহযোগিতা পেতো, তাহলে পুরো ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার কাজটি সমাপ্ত করতে পারতো।

এক পর্যায়ে পূজ্য ভন্তে তাঁর শিষ্য তথা আমাদেরও পালি ভাষা শেখার জন্য উৎসাহিত করতে থাকেন, যাতে করে ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার জন্য এক অনুবাদক গোষ্ঠী গড়ে তোলা সম্ভব হয়। গুরুর মুখ হতে এমন অনুপ্রেরণামূলক বাক্য শুনে অনেক শিষ্যের মনোদ্যানে পালি শিক্ষা করার বীজ রোপিত হয় দারুণভাবে। অমনি প্রথমে করুণাবংশ ভিক্ষু ও বুদ্ধবংশ ভিক্ষু ব্যক্তিগত উদ্যোগে পূজ্য বনভন্তের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে প্রজ্ঞাবংশ ভন্তের কাছে পালিভাষা শিক্ষা করতে ব্রতী হন। পরবর্তীকালে বেশ কয়েকজন ভিক্ষুও পূজ্য বনভন্তের অনুমতিসাপেক্ষে প্রজ্ঞাবংশ ভন্তের কাছে পালি শিক্ষা গ্রহণ করতে মনোযোগী হয়। এক পর্যায়ে রাজবন বিহারের জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুরা পূজ্য বনভন্তের শিষ্যদের মধ্যে কীভাবে সামগ্রিকভাবে পালি ভাষা শিক্ষা করা ও চর্চা করার পরিবেশ ও ভিত রচনা করা যায়, তজ্জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সেই পদক্ষেপের অংশ হিসেবে আমি পূজ্য বনভন্তের সর্বাধিক জ্যেষ্ঠ শিষ্যদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার ভন্তের কাছে গেলাম। তিনি তখন খাগড়াছড়িস্থ আর্যবন বিহারের অধ্যক্ষ হিসেবে সেখানে অবস্থান করতেন।

আলোচনায় তিনিও সানন্দে একমত পোষণ করলেন। এরপর চলে গেলাম শ্রন্ধেয় শাসনরক্ষিত ভন্তের কাছে শান্তিপুর অরণ্যকৃটিরে। তিনিও বেশ প্রীতমনে এ উদ্যোগ সমর্থন জানালেন; আর তার শিষ্যও পাঠাবেন বলে জানিয়ে রাখলেন। অমনি চলে গেলাম শ্রন্ধেয় ভৃগু ভন্তের কাছে। তিনি তখন কাচালং আর্যপুর ধর্মোজ্বল বনবিহারের অধ্যক্ষ হিসেবে তথায় অবস্থান করতেন। আমাদের পদক্ষেপের কথা শুনে তিনিও সম্ভন্ত চিত্তে সমর্থন জানালেন। এরপর সংঘের সাধারণ সভা আহ্বান করা হলো রাজবন বিহারের দেশনালয়ে। উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, পূজ্য বনভন্তের অনুমতি পাওয়া গেলে আসছে বর্ষাবাসের শ্রন্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ ভন্তেকে রাজবন বিহারে নিমন্ত্রণ করে এনে সম্মিলিতভাবে পালি ভাষা শিক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম

আমাদের পালি শিক্ষা কার্যক্রম একপ্রকার বন্ধ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় অনেক শিক্ষার্থী হতোদ্যম হয়ে পালি শিক্ষার কার্যক্রম হতে নিজকে সরিয়ে নেন। আমরা শ্রুদ্ধেয় ভত্তের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট থাকি। অনুরোধ করি, ২০০৭ সালের বর্ষাবাসের সময় আবারও রাজবন বিহারে এসে আমাদের পালি শিক্ষা প্রদান করতে। একপর্যায়ে আমরা করুণাবংশ ভিক্ষুকে আমাদের কিছুদিনের জন্য পালিভাষা শেখার অনুরোধ করি। যেহেতু সে ইতিপূর্বে প্রজ্ঞাবংশ ভত্তের কাছ থেকে পালি শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত করে ফেলেছে। আমাদের অনুরোধ রক্ষা করতে করুণাবংশ ভিক্ষুও পিছপা হলো না।

২০০৭ সালের বর্ষাবাস সমাগত প্রায় হলে প্রজ্ঞাবংশ ভন্তে জানালেন যে, তিনি ব্যস্ততার বেড়াজাল থেকে

পরম পূজ্য বনভন্তে পার্বত্যাঞ্চল তথা বাংলাদেশে থেরবাদী বুদ্ধধর্মের শিক্ষা, সংস্কৃতির চর্চা জাগরণে ও ভিত রচনায় অগ্রদূত হিসেবে আবির্ভূত হন বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে।

শুরু করা হবে। সভা শেষে আমরা সম্মিলিতভাবে পূজ্য বনভন্তের সকাশে গিয়ে এ ব্যাপারে অনুমতি প্রার্থনা করলাম। পূজ্য ভন্তে পরম সন্তোষের সঙ্গে অনুমতি প্রদান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে পালি ভাষা শিখে পিটকীয় গ্রন্থগুলো বাংলায় অনুবাদ করা যে কতটুকু অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে সম্পর্কে অনেকক্ষণ ধর্মদেশনাও প্রদান করলেন।

ভন্তের নিকট অনুমতি ও আশীর্বাদ পেয়ে আমরা শ্রাদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ ভন্তেকে পালি শিক্ষক হিসেবে রাজবন বিহারে আসতে অনুরোধ জানালাম সাংঘিকভাবে। শ্রাদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ ভন্তে যখন শুনতে পেলেন, পূজ্য বনভন্তে তাকে এ কাজের জন্য ডাকছেন, অমনি তিনি সানন্দে রাজি হয়ে গেলেন।

২০০৬ সালের ১১ জুলাই তারিখে ৪৭জন ভিক্ষুকে নিয়ে আমাদের পালি ভাষা শিক্ষা করার কার্যক্রম চালু হলো। পরবর্তীকালে আরও কয়েকজন শ্রমণও এতে যোগ দেন। বর্ষাবাস শেষ হবার পর নানা প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ ভল্তেকে তাঁর আবাসস্থলে ফিরে যেতে হলো। ফলে বেরিয়ে আসতে পারছেন না। কাজেই এই বর্ষাবাসের সময় তাঁর পক্ষে আমাদের পালি শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। এদিকে পালি শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যেতে যেতে মাত্র ১১জনে গিয়ে ঠেকলো। এই ১১জন মিলে সিদ্ধান্ত করলাম. বর্ষাবাসের সময় নিজেদের মধ্যে ভালোভাবে পালি শিক্ষার চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে। এর জন্য নিরিবিলি শাখাবন বিহারে গিয়ে বর্ষাবাস যাপন করবো। আমাদের এ কাজে সহযোগিতা তথা পালি শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রজ্ঞাদর্শী শ্রামণকে সঙ্গে নিয়ে যাবো। বলা বাহুল্য, প্রজ্ঞাদশীও ইতিমধ্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রজ্ঞাবংশ ভত্তের কাছ থেকে পালি শিক্ষা গ্রহণ করেছে। পুরো বর্ষাবাসটা কাচালং আর্যপুর ধর্মোজ্জল বনবিহারে অবস্থান করলাম, আর প্রজ্ঞাদশীর কাছ থেকে পালি শিখলাম। বর্ষাবাস শেষে ফিরে আসলাম রাজবন বিহারে। অমনি প্রজ্ঞাবংশ ভন্তের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু কর্লাম। তিনি বললেন, তোমরা যখন পালি শিখার জন্য এতো চেষ্টা করতেছ, তোমাদের অবশ্যই পালি শিক্ষা দেবো। তবে আমার এখানে এসে শিখতে হবে। অবশ্য এখানে তোমাদের সবার জন্য জায়গা হবে না। যেহেতু তোমরা ৮জনের মতো শিক্ষার্থী রয়েছ, সেহেতু দু'ভাগে ভাগ হয়ে এখানে এসে শিখে যাও। আমরাও খুশি মনে তাঁর প্রস্তাব মেনে নিলাম। দু'ভাগে ভাগ হতে গিয়ে আমি আর সুমন দুজন দুই গ্রুপে পড়লাম বয়োজ্যেষ্ঠ অনুসারে। সুমন আমাকে বললেন, ভন্তে, আপনি প্রথম গ্রুপে শিক্ষা করতে যান। আমি বললাম, অসুবিধে নেই, আমি যেতে পারি। তবে সেখানে গিয়ে যদি আমাদের হঠাৎ কোনো কিছুর প্রয়োজন হয়, তুমি সেগুলো রাজবন বিহার থেকে পাঠিয়ে দিবে। এ কথা শুনে সুমন বলে উঠলেন, তাহলে ভন্তে, আমিই প্রথম গ্রুপ নিয়ে চলে যাই। সিদ্ধান্ত মোতাবেক সুমন প্রথম গ্রুপ নিয়ে পূজ্য বনভন্তের অনুমতিসাপেক্ষে প্রজ্ঞাবংশ ভন্তের কাছে পালি শিক্ষা করার জন্য অঙ্কুরিঘোনা মহাশ্মশান ভাবনাকেন্দ্রে চলে গেলেন। একটানা সাডে তিন মাস পালি শিক্ষা শেষে বর্ষাবাসের কিছুদিন পূর্বে তারা রাজবন বিহারে ফিরে আসলেন। এবার সিদ্ধান্ত হলো, তারা বিগত সাড়ে তিন মাসে যেগুলো শিখেছেন, সেগুলো বর্ষাবাসের সময় আমাদের শিখাবেন। যেহেতু বর্ষাবাসের পরে শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ ভন্তে রাংকৃট বনাশ্রম ভাবনাকেন্দ্রে চলে যাবেন, সেহেতু বর্ষাবাসের আমরা সবাই একসঙ্গে গিয়ে বাকি শিক্ষাটুকু শিখে নিতে পারবো। কারণ রাংকৃটে বহু ভিক্ষু-শ্রমণ থাকার সুব্যবস্থা রয়েছে।

আমি প্রস্তাব করলাম, চল, এবারের বর্ষাবাসটি আমরা রাজবন ভাবনাকেন্দে যাপন করি। ভাবনাকেন্দের নীরব, কোলাহলমুক্ত পরিবেশে কিছু কিছু ভাবনা করার পাশাপাশি ভালোভাবে পালি শিক্ষা করার সুযোগ হবে। সবাই প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন। ভাবনাকেন্দ্রে বিহারের বহুল দায়িত্ব ও দায়ক-দায়িকাবৃন্দের ফাং রক্ষা করার কোনো উত্তাপ নেই। শান্ত, নীরব পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে মনকে সমর্পণ করলাম পালি শিক্ষায়। মনটাকে একমুখী করে পালি শিক্ষা করার অবিরাম প্রয়াস চালিয়ে যেতে লাগলাম। কঠিন চীবর দানের মাস শেষ হলে শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ ভন্তের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম. বাকি শিক্ষা সমাপ্ত করার জন্য। তিনি বললেন, আমি এখনো সামান্য ব্যস্ত রয়েছি। কয়েকদিন পর তোমরা আসতে পার। একসময় তিনি আমাদের দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করে দিলেন। আমরাও বাকি শিক্ষাটুকু সমাপ্ত করার মানসে নির্ধারিত দিনে রাংকূটে গিয়ে উপস্থিত হলাম। এবারে আমরা মাত্র সাতজন (আমি, সুমন, আদিকল্যাণ, অমৃতানন্দ, বঙ্গীস, অজিত ও সীবক) শিক্ষার্থী। কারণ

ইতিমধ্যে একজন শিক্ষার্থী প্রব্রজ্যা ত্যাগ করে গৃহী হয়ে গেছে। রাংকৃট জায়গাটি বেশ খোলামেলা ও মোটামুটি নিরিবিলি। এমন পরিবেশের প্রেক্ষিতে এবারের পালি শিক্ষা গ্রহণ করাটা ভালোই হলো। এ প্রসঙ্গে যে-কথাটি না বললে নয়। আমরা দেখেছি, এই সময় শ্রদ্ধেয় প্রজাবংশ ভন্তের এমন দিনও গেছে যে, তিনি পুরো দিনটাই ব্যস্ত; তারপরও তিনি আমাদের জন্য কয়েক ঘণ্টা সময় বের করে নিয়ে পালি শেখাতেন। কখনো তিনি আমাদের তাঁর ব্যস্ততার কথা জানতে দিতেন না। আমাদের জন্য ভন্তের মঙ্গলাশীষ ও অনুকম্পা কিছুতেই ভূলবার নয়। ভন্তের এরূপ শাসনদরদী চিত্তকে আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ রাখবো আজীবন। রাংকৃটে প্রায় তিন মাসাধিক শ্রন্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ ভত্তের স্লেহছায়ায় অবস্থান করে তাঁর কাছে আমাদের পালি শিক্ষার বাকি এভাবে আমরা শ্রীলংকার পালিভাষাবিদ ড. এ পি বুদ্ধদত্ত মহাথেরো কর্তৃক প্রণীত "দ্যা নিউ পালি কোর্স" ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড সমাপ্ত করে ৩য় খণ্ডের অর্ধেক-এর বেশি পর্যন্ত অধ্যয়ন করার সুযোগ পেলাম। ২০০৮ সালের বর্ষাবাস শুরুর কিছুদিন আগে শ্রদ্ধেয় প্রজাবংশ ভত্তে আমাদের বললেন, তোমাদের শিক্ষা তো বেশ ভালো পর্যায়ে পৌছালো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমরা এই ভিত দিয়ে অনুবাদের কাজে নেমে পড়তে পারবে। বর্ষাবাস প্রায় সমাগত, কাজেই শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ ভন্তের আশীর্বাদ ও পরামর্শ নিয়ে রাজবন বিহারে ফিরে আসলাম পালি শিক্ষায় মোটামুটি একটি পর্যায়ে উপনীত হয়ে। এসে পরম পূজ্য বনভন্তেকে সশ্রদ্ধ বন্দনা করে আমাদের পালি শিক্ষা শেষ করে ফিরে আসার কথা জানালাম। ভত্তে বেশ খুশি মনে আমাদের ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধর্মদেশনা প্রদান করলেন।

বর্ষাবাস শুরুর ঠিক দুয়েকদিন আগে বঙ্গীস ও অজিত কাটাছড়ি শাখাবন বিহারে চলে গেলেন। এদিকে আমি, সুমন, আদিকল্যাণ, অমৃতানন্দ এবং সীবক রাজবন ভাবনাকেন্দ্রে চলে আসলাম। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়; নির্জন এবং নির্ঝাঞ্জাটপূর্ণ পরিবেশে চর্চার মাধ্যমে লব্ধ বিদ্যাকে আরও শাণিত করা ও পরীক্ষামূলকভাবে পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদের কাজে নিজেদের সম্পুক্ত করা। লব্ধ বিদ্যা কিছুদিন নিজেদের মধ্যে চর্চা করার পর আমি বললাম, চল, এবার অনুবাদের কাজে হাত দিই। সুমনেরা বললেন, ভত্তে,

আপনি তো আগে থেকেই লেখালেখি করেন; কাজেই আপনি শুরু করে দিন। আমাদের তো বই লেখার কোনো অভিজ্ঞতা নেই, কীভাবে পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদের কাজে হাত দেবো! এবার আমি বললাম, এতদিন যাবৎ একসঙ্গে পালি ভাষা শিখলাম, আমি কেন একাই অনুবাদক হতে চেষ্টা করি। তা হলে চল, এখন যৌথভাবে অনুবাদের কাজ শুরু করি। যৌথভাবে অনুবাদের কাজ করতে করতে যখন তোমাদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে, তখন তোমরা একাই অনুবাদের কাজ করতে সক্ষম হবে। এ সিদ্ধান্ত অনুসারে যৌথভাবে অনুবাদের কাজ সুচনা করলাম 'সূত্রপিটকে সংযুক্তনিকায় - ক্ষম্বর্গ' গ্রন্থটি দিয়ে।

এখানে বলে রাখা দরকার, ইতিমধ্যেই বহু গ্রন্থপ্রণেতা, পালি ভাষায় উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ ভন্তে 'বিনয়পিটকে পরিবার, করুণাবংশ ভিক্ষু 'বিনয়পিটকে পাচিত্তিয়', বুদ্ধবংশ ভিক্ষু 'বিনয়পিটকে পারাজিকা' এবং প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু 'সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তর নিকায় - পঞ্চম নিপাত' বাংলায় অনুবাদ করে বুদ্ধের শাসনদরদী শ্রাবকবুদ্ধ পূজ্য বনভন্তের পুরো ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নেয়ার বহুদিনের লালিত মহান স্বপ্ন ও পরিকল্পনাকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করে দেয়ার কাজে সম্পুক্ত করে নিজেদের মহা সৌভাগ্যবানে পরিণত করে ফেলেছেন।

প্রায় চার মাসাধিককাল ধরে অনুবাদ কাজ চালিয়ে 'সূত্রপিটকে সংযুক্তনিকায় - ক্ষন্ধবর্গ' গ্রন্থটি প্রথম বাংলায় অনুবাদ করে ফেলি আমরা। যার উৎসাহ, উদ্দীপনা ও প্রাণসঞ্চারী অনুপ্রেরণায় আমাদের পালি ভাষা চর্চায় পদচারণা করার সুযোগ লাভ হয়, সেই মহান কল্যাণমিত্র, শ্রাবকবৃদ্ধ পূজ্য বনভন্তের ৯১তম পবিত্র জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর প্রতি হৃদয় নিংড়ানো শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে ২০১০ সালের ৮ জানুয়ারিতে গ্রন্থটির প্রকাশনা কাজও সুসম্পন্ধ করি।

এভাবে শুরু হয় বনভন্তের শিষ্যবৃদ্দের পালি ভাষার সঙ্গে সম্পৃক্ততা ও পিটকীয় গ্রন্থের বাংলায় অনুবাদ করার কার্যক্রম। তারা পালি শিক্ষা গ্রহণ শেষে ত্রিপিটকের গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করার কাজে নেমে পড়েন। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় একের পর এক (পালি ভাষার) পিটকীয় গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ হতে থাকে। মোট কথা, তারা স্বীয় গুরুর সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে নেওয়ার মহান সদিচ্ছা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হতে থাকেন দৃঢ়প্রত্যয়ী হয়ে।

বাংলাভাষীদের কাছে এটা সত্যিই আনন্দের বিষয় যে, পরবর্তীকালে বনভন্তের কতিপয় সাহিত্যানুরাগী, পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদে প্রত্যয়াবদ্ধ শিষ্য এবং সচেতন, সদ্ধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়িকার যৌথভাবে পূজ্য বনভন্তের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশনা করার মহান ইচ্ছাকে পূরণ করে দেয়ার এক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই উদ্যোগের ফসল হিসেবে গঠিত হয় 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ' (ত্রিপাসো, বাংলাদেশ)। গঠিত হওয়ার দুয়েক বছর পর এ প্রকাশনা সংস্থাটি পরম পূজ্য বনভন্তের বহুদিনের লালিত স্বপ্ন ও পরিকল্পনা সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশনার জন্য সুনির্দিষ্ট, কার্যকরী ও বাস্তবমুখী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এই উদ্যোগ ও কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে বনভন্তের সদ্ধর্মহিতৈষী, শাস্ত্রজ্ঞ, গুরুর প্রতি অকৃত্রিম কৃতজ্ঞ শিষ্যমণ্ডলী এবং সদ্ধর্মানুরাগী, সচেতন ও বিজ্ঞ উপাসক-উপাসিকাগণ একটি শক্তিশালী দাঁড়িয়ে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পরম পূজ্য বনভন্তের অন্যতম মহান ইচ্ছা, পরিকল্পনা সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ এবং প্রকাশ করাকে বাস্তবায়ন করে দেয়ার সুযোগ লাভ করেন।

এ রকম সন্মিলিত প্রচেষ্টা, সময়োপযোগী ও সুপরিকল্পিত প্রদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এই প্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক (ত্রিপিটকের ৫৯টি গ্রন্থকে ২৫ খণ্ডে বিভাজিত করে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে রয়েল সেট আকারে) প্রকাশ করে ত্রিপাসো একদিকে যেমন পূজ্য বনভন্তের সেই মহান ইচ্ছা, পরিকল্পনাকে পূরণ করে দিতে সমর্থ হলো, অন্যদিকে এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক অনূদিত হয়নি, এ রকম লজ্জালনক উক্তি অপসৃত করে এক অভাবনীয় গৌরবোজ্গল ইতিহাস সৃষ্টি করলো। ■

^{*} **লেখক পরিচিতি : ইন্দ্র**গুপ্ত ভিক্ষু, প্রধান সম্পাদক, ত্রিপাসো হতে প্রকাশিত 'পবিত্র ত্রিপিটক' (২৫ খণ্ড); সংকলক, আর্যশ্রাবক বনভন্তের ধর্মদেশনা - সিরিজ ১-৯; অধ্যক্ষ, রাজবন ভাবনা কেন্দ্র, কাটাছড়ি, রাঙামাটি।

বাংলাভাষীদের পরম সৌভাগ্য

প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো

খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে ভারত উপমহাদেশে উদিত মহাসূর্য গৌতম বুদ্ধ। এ সূর্যের জ্ঞানালো, প্রজ্ঞার আলো আড়াই হাজারাধিক বছর ধরে এ পৃথিবী গ্রহটির মানব জাতিকে বিতরণ করতে করতে আজ একবিংশ শতকে পদার্পণ করেছে। এ দীর্ঘ পরিক্রমায় অসংখ্য অসংখ্যবার প্রমাণ করেছে এ বিশ্বের শান্তি, সম্প্রীতি, সৌদ্রাতৃত্ব আর সৌহার্দ্যের প্রতিষ্ঠায় এ মহান শিক্ষকের অবদান অতুলনীয়, অদ্বিতীয়। তাঁর বাণী চিরস্তনীর প্রচার-প্রতিষ্ঠায় নেই কোনো স্বার্থের দ্বন্দ্ব, নেই কোনো ক্রুসেড, জেহাদের মতো রক্তঝারা প্রাণঘাতী যুদ্ধ।

অক্কোধেন জিনে কোধং, অসাধুং সাধুনো জিনে; জিনে কদারিয়ং চাগে, সচ্চেন অলীকবাদিনং।

ক্রোধীকে করো জয় অক্রোধীর স্বভাবে সাধুতায় করো জয় অসাধু যেই জনে। সত্যবাক্যে করো জয়, মিথ্যাবাদী জনে, দানেতে করো জয়, লোভান্ধ কৃপণে।

এটিই বুদ্ধের শিক্ষা, এটিই বুদ্ধের শিক্ষার চিরন্তনী আদর্শ। বুদ্ধশিক্ষার এ আদর্শে যুগ যুগ ধরে অনুপ্রাণিত, উদ্বুদ্ধ হয়েছে অসংখ্য মানুষ। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এসে বাংলাদেশের বিশিষ্ট নদী কর্ণফুলীর কাপ্তাই উপত্যকার মোরঘোনা গ্রামে ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম নিল বুদ্ধ-আলোয় পরিস্লাত হতে অপর একটি মানব শিশু। নাম তাঁর রথীন্দ্র লাল চাকমা। যৌবনের উন্মেষে পার্বত্য শহরের পুস্তক ব্যবসায়ীদের লাইব্রেরিগুলোতে জ্ঞান-বিজ্ঞানে, ধর্ম-দর্শনের ওপর যত বই পাওয়া যেতো, তার প্রায় সবগুলোই যেন পাঠ শেষ করেছিলেন তিনি। গল্প-উপন্যাস জাতীয় কোনো গ্রন্থের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল এমন কথা পরিণত বয়সে তাঁর মুখে কোনোদিন শোনা যায়নি। সূজনশীল মননের মেধাবী পুরুষের ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক গৌতমের জীবনাদর্শ এবং তাঁর জীবন অভিজ্ঞায় লব্ধ পরম সত্য

বুদ্ধত্ব জ্ঞান। মন ও জীবনকে জানার অপ্রতিরোধী কৌতূহল তাঁকে বাধ্য করেছিল ঘর ছাড়তে, বাধ্য করেছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের গহীন অরণ্যে সুদীর্ঘ বাইশটি বছর একাকীত্ব জীবন যাপনে। এ সময়ে তাঁর ধ্যানগবেষণায় তিনি বুদ্ধের চারি আর্যসত্য জ্ঞানের সত্যতাকেই কেবল যাচাই করেননি, সঙ্গে সঙ্গে বিশদভাবে জ্ঞাত হলেন আপন অন্তরে ও জীবনে দুঃখ উৎপাদনকারী লোভ, দ্বেষ আর মোহকে। জীবনদুঃখের মূল উপাদান এই তিনটিকে চির বিনাশের সাধনায় অরণ্যে অবস্থান করতে করতেই লোকে তাঁকে সংজ্ঞায়িত করলেন 'বনভন্তে' নামে।

জীবনদুঃখ আছে এটা যেমন সত্য, সেই দুঃখ যে বিনা কারণে হয় না, এটিও চিরসত্য। এ দুঃখ সৃষ্টির মূল কারণ অজ্ঞতা তথা মোহতাড়িত লোভ আর বিদ্নেষ। তাই সর্বপ্রথমেই দুঃখমুক্তিকামীর প্রয়োজন হবে নিজেকে অজ্ঞতামুক্ত করে জ্ঞান-প্রজ্ঞার আলোয় আলোকিত করা। এই জ্ঞান কিসের জ্ঞান? আপন জীবনে দুঃখের অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান। জীবনে যেকোনো সমস্যাই তো দুঃখের প্রতীক। যেমন, 'ক্ষুধা' জীবনে একটি অপরিত্যাজ্য সমস্যা। যদি বলি, যার ঘরে খাদ্যের অভাব নেই তার জন্যে ক্ষুধাটা কী করে সমস্যা হবে? সত্য উপলব্ধিতে এখানেই মানুষের ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তিমুক্ত মানুষই বুঝতে পারেন যে, এই ক্ষুধাই নানা আকারে, নানা প্রকারে মনকে প্রভাবিত করে রাজাকে পররাজ্য গ্রাসে তাড়িত করে; দরিদ্রকে সূর্যের উদয়ান্ত আহার সন্ধানে ব্যস্ত রাখে। এটিরই নাম বৃদ্ধজ্ঞান।

পূজ্য বনভন্তে আপন-পরজীবনে মহান শিক্ষক, বিশ্বশিক্ষক বুদ্ধের অধীত এই জ্ঞানকে জীবনের অন্তিম মুহূর্তে পর্যন্ত এভাবেই চর্চা করে গেছেন। বুদ্ধজ্ঞান চর্চার এক দুর্লভ পুরুষ এই বনভন্তে যার সাংঘিক নাম সাধনানন্দ মহাস্থবির। তাঁরই প্রেরণায় 'পালি' নামক সুপ্রাচীন মাগধী ভাষায় সংরক্ষিত বুদ্ধজ্ঞানের ভাগ্ডার

ত্রিপিটক গ্রন্থগুলো বাংলাভাষীদের সামনে পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপিত করার মহান সংকল্প তাঁর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবনত শিষ্যগণের দ্বারা আজ সুসম্পন্ন হলো, এই একবিংশ শতকে ফ্রান্সের প্রবাস জীবনে। তাই আমার আনন্দের সীমা নেই। কেন নেই এ কথা বলতেই কলম ধরেছি।

শুধু পালি ভাষার মাধ্যমে খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত বুদ্ধের শিক্ষা-উপদেশ তথা ধর্ম-বিনয়ের আলোচনা ও পঠন-পাঠন চলেছিল। অতঃপর খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর ভারতীয় সম্রাট কণিঙ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় মহাকবি অশ্বঘোষের মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষায় প্রথম ত্রিপিটক সংগৃহীত হয়। ফলে পরবর্তীকালে বুদ্ধের শিক্ষা-উপদেশগুলোর ওপর যুগপৎ পালি ও সংস্কৃত এই উভয় ভাষাতেই অজস্র লেখালেখি চলে। এক সময়ে দেখা গেল দক্ষিণ ভারত, মধ্য ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব ভারতসহ মায়ানমার, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা, কম্বোডিয়া—এই দেশগুলোর বৌদ্ধ শাস্ত্রবিদেরা পালি ভাষাকে প্রাধান্য দিয়ে বৌদ্ধ শাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলোর লেখন ও অধ্যয়ন, অধ্যাপনা চলিয়ে গেলেন।

অপরদিকে নেপাল, তিব্বত, চীন, তাইওয়ান, কোরিয়া, জাপান এ সকল দেশের বৌদ্ধ শাস্ত্রবিদগণ সংস্কৃত ভাষাকে প্রাধান্য দিয়ে বৌদ্ধ শাস্ত্র চর্চা করলেন। এশিয়া মহাদেশে বৌদ্ধ শাস্ত্র চর্চার এই প্রথাগত ভিন্নতার পেছনে কাজ করলো দুই ভিন্ন মনোভাব। পালি ভাষাকে যারা ধারণ করলেন, তারা হলেন বৌদ্ধধর্মের তথা বুদ্ধের শিক্ষাদর্শের জন্মলগ্নের বৈশিষ্ট্যের অনুরাগী। গুরু-শিষ্যপরম্পরা সেই আদর্শ-বৈশিষ্ট্যের ধারক বলে তারা নিজেদের 'থেরবাদী' নামে অভিহিত করলেন।

আর সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধর্মের চর্চাকারীরা হলেন, ব্যাপক স্বাধীন চর্চার ধারক। তাদের এই স্বাধীনতার অপর নাম হলো 'মহাযান'। এই মহাযানীদের যুক্তি সারা বিশ্বের সকল প্রাণীর মুক্তিকে অগ্রাধিকার দেন বলে তারা মহান। আর থেরবাদীরা নিজের মুক্তিকে অগ্রাধিকার দেন, তাই তারা 'হীন্যানী'।

প্রথম দিকে অসঙ্গ, বসুবন্ধু, নাগার্জুনদের সময়ে বুদ্ধের প্রজ্ঞাবাদকে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উত্থানকে প্রতিরোধে তর্কযুদ্ধে মহাযানীরা প্রবৃত্ত হলেন। প্রথা হয়ে দাঁড়ালো যিনি তর্কে পরাজিত হবেন তিনি নিজের মতবাদ ত্যাগ করে জয়ীর মতে দীক্ষিত হবেন। নাগার্জুনের শূন্যতাবাদের জন্ম তখনই। অভিধর্মকোষের

জন্মও সেই পর্বে। অনন্য সাধারণ মেধাবীদের সূক্ষাতিসূক্ষ বিচার-বিশ্লেষণ, যুক্তির অনতিক্রম্য বেড়াজাল বুদ্ধের দুঃখমুক্তিময় সহজ সরল আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে পরিহার করে তর্কযুদ্ধের যুক্তিবাদী দর্শনসর্বস্ব হয়ে পড়লো। গবেষকগণ তাকে অভিহিত করলেন বৌদ্ধ দর্শনের চরম উৎকর্ষতা বা বৌদ্ধধর্মের স্বর্ণযুগ।

প্রবল প্রতাপী এই মেধাবীদের দার্শনিক মতবাদের প্রবল প্রতাপে পালি ভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চাকারীও তখন প্রায় কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন। ফলে সমগ্র এশিয়া এক সময়ে মহাযানী ভাবধারায় প্লাবিত হলো। কিন্তু বুঝতে হবে. চরম উৎকর্ষতাকে ধারণ করার জন্যে তদুপযোগী প্রজন্ম যদি সৃষ্টি না হয়, তা মহাবিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। বৌদ্ধ সাহিত্য, ধর্ম ও দর্শন চর্চার ইতিহাসে খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হতে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সেই বিপর্যয়ই চলতে থাকে। বৌদ্ধ ইতিহাসের এ পর্বেই বৌদ্ধধর্মে ব্রাহ্মণ্য মতের ভক্তিবাদ ব্যাপকভাবে অনুপ্রবেশ করে এবং এক বুদ্ধমূর্তির আসনে বোধিসত্ত নামধারী অসংখ্য নামে দেবদেবীর পূজা শুরু হয়। সাধারণ মেধায় দুর্বোধ্য বৌদ্ধ দর্শনকে তারা একপাশে রেখে দিয়ে, ব্রাহ্মণ্য মতবাদ প্রভাবিত তন্ত্রযান, মন্ত্রযান এবং অন্তিমে সহজ্যান, গুহ্যযান, বজ্র্যান, কালচক্র্যান ইত্যাদি নামক বৌদ্ধ শাস্ত্র রচনা আর অনুশীলনের জন্ম দেয়।

পৃথিবীতে সাধারণ মেধার সংখ্যাই সর্বকালে বেশি থাকে। এই সাধারণ মেধার উপযোগী করে বৌদ্ধর্ধর্মকে ঢালাওভাবে সাজানোর প্রক্রিয়া যখন বৌদ্ধ জনতার মাঝে চালু হলো, তখন এক পর্যায়ে থেরবাদ-মহাযান একাকার হয়ে গেল অসংখ্য দেবদেবীর অসংখ্য পূজা আর অনুষ্ঠানে। ফলে বুদ্ধের অনুশীলনধর্মী জীবন পরিবর্তনের আবেদনটি হয়ে পড়লো গৌণ, মুখ্য হয়ে পড়লো জাকজমকপূর্ণ প্রতিষ্ঠান আর অনুষ্ঠান। প্রজ্ঞাবাদের স্থান দখল করে নিল ভক্তিবাদ। ফলে ভক্তিবাদী বৌদ্ধসমাজে রক্ত-মাংসের মানব সন্তান বুদ্ধ হয়ে গেলেন অসাধারণ অতিমানবীয় গুণের আধার, সর্বজ্ঞাতা, সর্ব আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক জীবন্ত বুদ্ধমূর্তি, বোধিসত্তু মূর্তি, আর দেবদেবীর মূর্তি। সারা বিশ্বব্যাপী এই একবিংশ শতকের বিশ্ব বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী সেই ভক্তিবাদী বৌদ্ধধর্মের ধ্যান-ধারণারই অনুবর্তী। গবেষকগণ এই বৌদ্ধ সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ধর্ম এবং তার অনুগতদের নামকরণ করেছেন জন্মগত বৌদ্ধ ও

বৌদ্ধধর্ম বা ট্রেডিশনাল বুডিডজম অ্যান্ড ট্রেডিশনাল বুডিডস্ট।

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে কালে কালে ট্রেডিশনাল বুডিডজমের ধ্যান-ধারণাকে অস্বীকার করে কিছু কিছু সত্যসন্ধানীকে মৌলিক বুদ্ধশিক্ষার চর্চাকে প্রাধান্য দিতে দেখা যায়। তাঁরা বুদ্ধের মূল শিক্ষা দুঃখমুক্তিবাদ নীতি 'চার আর্যসত্য জ্ঞান' চর্চাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। থেরবাদীদের দ্বারা সাহিত্যিক পালি ভাষায় সংরক্ষিত বর্তমান ত্রিপিটক গ্রন্থগুলো কালে কালে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষার জন্যে খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে মগধের রাজধানী রাজগৃহের প্রথম ধর্ম-সঙ্গায়ন বা সঙ্গহ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান আডাই হাজার বছরের ব্যবধানে সে জাতীয় সঙ্গায়ন হয়েছে মাত্র ছয়টি। প্রয়োজনের তুলনায় তা একেবারেই নগণ্য। ফলে পালি ভাষায় সংরক্ষিত ত্রিপিটকও মহাযানী কাল্পনিকতার ভক্তিবাদী প্রভাবমুক্ত করা অদ্যাবধি সম্ভব হয়নি। তবুও আশার কথা, ইদানিং মায়ানমার, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা ও কমোডিয়া প্রভৃতি থেরবাদীপ্রধান দেশগুলোর কিছু কিছু ভিক্ষু ও বৌদ্ধ গবেষকেরা ব্রদ্ধের মৌলিক শিক্ষাদর্শের ধারক চার আর্যসত্যভিত্তিক দেশনাগুলো বিশেষ করে মহাসতিপট্ঠান সুত্তকে প্রাধান্য দিয়ে যেই ধ্যান-সাধনা করে থাকেন, তারই নাম বিদর্শন ভাবনা। ইংরেজিতে তাকেই বলা হয়- Meditation of Awarness, Mindfullness, অথবা Insight Meditation. বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষাদর্শের অনুসারী এই বিদর্শন ভাবনা এখন বিজ্ঞানমনস্কদের দ্বারা সারা বিশ্বে সমাদৃত।

পূজ্য বনভন্তে ছিলেন ঠিক এই পর্যায়েরই একজন নিখাত ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর বাইশটি বছরের আরণ্যিক জীবনের ধ্যান-গবেষণা ছাড়াও ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে আমার রাঙামাটি রাজবন বিহারে অবস্থান শুরুর পরবর্তী বছরগুলোতে দেখলাম বুদ্ধের মৌলিক শিক্ষা-উপদেশ— সেই চার আর্যসত্য জ্ঞানের আলোকেই প্রায় সময়ে ধর্মোপদেশ প্রদান করতেন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ থেকেই বুঝতে পারবেন, পূজ্য বনভন্তের দেশনাগুলোর ধরনটা কেমন।

একদিন পূজ্য বনভন্তের শ্রামণ্য জীবনের এক ধ্যানী বন্ধু ভিক্ষু, বহুকাল পরে রাজবন বিহারে এলেন। বনভন্তে নিত্যদিনের মতো ভোরে শিষ্যদের দেশনাকালে সেই বন্ধু ভিক্ষুও একপাশে বসলেন। তার কিছুদিন আগে পার্বত্য চট্টথামে শান্তিচক্তির পক্ষে-বিপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের চাকমা ছাত্রদের মধ্যে গোলাগুলিতে বেশ কয়েকজন চাকমা যুবক মারা যাওয়া প্রসঙ্গে বনভন্তে সেদিন খুব উত্তেজিতভাবে অনেকক্ষণ বকাবকি করাতে, বন্ধু ভিক্ষু এক পর্যায়ে অসম্ভন্ত হয়ে বললেন, ভন্তে, আমি বহুকাল পরে আপনার কাছে আসলাম, চার আর্যসত্য সম্পর্কে কিছু শোনার জন্যে। অথচ আপনার থেকে তেমন কিছুই তো শুনলাম না।

বন্ধু ভিক্ষুর এ বক্তব্যে তিনি কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, "হুঁ, তুমি তো এতদিন তাহলে চার আর্যসত্যকে কেবল বইয়ের পৃষ্ঠাতেই দেখে এসেছ। এই যে চাকমারা নিজেদের মধ্যে খুনাখুনি করছে তা কি চার আর্যসত্য নয়? চার আর্যসত্য নিজের ও পরের জীবনে দেখলেই জ্ঞান-প্রজ্ঞার উৎপত্তি হয়, বইয়ের পৃষ্ঠায় নয়।"

বস্তুত বুদ্ধজ্ঞানে এমন স্ব-অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিই ছিলেন এই নিখাত সাধক পূজ্য বনভন্তে। তিনি আমাকে প্রায় সময় বলতেন, "প্রজ্ঞাবংশ, তোমাকে কেউ ধর্মদেশনা করতে বললে চার আর্যসত্যের বাইরে কিছু বলবে না। চার আর্যসত্যই একমাত্র বুদ্ধজ্ঞান। বুদ্ধ তাঁর বহু বছরের প্রব্রজ্যা জীবনে যা দেশনা করেছেন তা সম্পূর্ণ চার আর্যসত্যভিত্তিক। চার আর্যসত্যের বাইরে ধর্মদেশনার নামে যদি কেউ কিছু বলে তা কখনো বুদ্ধের কথা নয়। বনভন্তে বুদ্ধধর্মের ইঞ্জিনিয়ার। তিনি বুঝতে পারেন ত্রিপিটকের কোনটি বুদ্ধবাক্য, কোনটি নয়। তাই তোমাদের বলি সতিপট্ঠান সূত্র অনুযায়ী অনুশীলন করো। সেখানে বুদ্ধকে খুঁজে পাবে।"

সত্যি বলতে কী, বুদ্ধজ্ঞানে প্রত্যক্ষ প্রজ্ঞাদশী এই মহাপুরুষের সান্নিধ্য পেয়ে আমার প্রব্রজ্যা জীবন সংশ্লিষ্ট অনেক দিন ধরে জমে থাকা বহু অমীমাংসিত প্রশ্লের প্রাঞ্জল সমাধানই কেবল পাইনি, সেই সঙ্গে বুদ্ধসমকালীন পরিশুদ্ধ ভিক্ষুজীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভেও ধন্য হয়েছি। নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেছি এই দুর্লভ আদর্শ মহাভিক্ষুর নিকট সান্নিধ্যে। সেই মহানের আশীর্বাদ আর অনুপ্রেরণাতেই শ্রীলংকা থেকে আগমনের চৌদ্দটি বছর পর প্রায় ভূলে যাওয়া পালি গ্রামার আবার চর্চা শুরু করি, এবং বভন্তের অনুমোদনে শিষ্যসংঘকে পালি ভাষা শিক্ষাদান করি। উদ্দেশ্য, শ্রদ্ধেয় ভত্তের ঐকান্তিক ইচ্ছা বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটকের অনুবাদ সম্পূর্ণ করা। কারণ ইতিপূর্বে প্রায় দেড়শ বছর ধরে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় সাধু অঘারনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ঈষান চন্দ্র ঘোষ

থেকে শুরু করে ড. বেণী মাধব বড়ুয়া, নলিনাক্ষ দণ্ড, পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, পণ্ডিত শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, ড. বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী, ড. সুকোমল চৌধুরী, ভিক্ষু শীলভদ্র (কলকাতা), রাজগুরু ধর্মরত্ন মহাস্থবির, পণ্ডিত জিনবংশ মহাস্থবির, সংঘরাজ শীলালংকার মহাস্থবির, সংঘরাজ জ্যোতিপাল মহাস্থবির, ভদন্ত আর্যবংশ মহাস্থবির ও ভদন্ত সত্যপ্রিয় মহাস্থবির, রেঙ্গুনস্থ ভদন্ত জ্যোতিপাল ভিক্ষু প্রমুখ আরও বহুজনের বিচ্ছিন্ন প্রয়াসে বিশাল ত্রিপিটকের বিভিন্ন খণ্ডের অনুবাদ হলেও সমগ্র ত্রিপিটকের আরও বেশ কিছু খণ্ড বাংলায় অনুবাদের বাইরে থেকে যায়।

পূজ্য বনভন্তের প্রেরণায় আমরা শিষ্যরা তাঁর ইচ্ছা ও স্বপ্লের পূরণে অবিচ্ছিন্ন প্রয়াস-প্রযন্তের মাধ্যমে আজ সমগ্র ত্রিপিটকের বাংলায় অনুবাদ সমাপ্তির পথে, এ সংবাদ কেবল সুসংবাদই নয়, বঙ্গভাষী বুদ্ধ অনুরাগীদের জন্যে বলতে গেলে প্রায় দেড় হাজার বছরের কলঙ্ক মোচনের পর্যায়ভুক্ত। কারণ, বাংলার মাটিতে এ যাবৎকালে তান্ত্রিক মহাযানী বৌদ্ধধর্ম চর্চার নমুনা ছাড়া পালি ভাষায় পিটকীয় চর্চার কোনো হিদস পাওয়া যায়নি। খ্রিষ্টীয় কম-৬ষ্ঠ শতকের চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন আর হিউয়েন সাঙ্ত-এর ভ্রমণ বৃত্তান্তেই কেবল জানা যায় যে, বাংলার মাটিতে মহাযান মতাবলম্বীদের পাশাপাশি থেরবাদী (তাদের প্রদন্ত নামে হীন্যানী) মতাবলম্বীদের অস্তিত্বও বিদ্যমান ছিল। এমনকি তাঁরা তখন বাংলার মাটিতে দেবদত্তের অনুসারী ভিক্ষুদের অস্তিত্বের কথাও উল্লেখ করেছেন।

সে যা-ই হোক, পূজ্য বনভন্তের মতো দুর্লভ পুরুষরত্ন, আর আমার শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু বিদর্শনাচার্য ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরোর দীর্ঘ লালিত স্বপ্ন আজ তাঁদেরই শিষ্যসংঘের মাধ্যমে পূর্ণ হচ্ছে আমার জীবনের ষাটের কোটায়। এটাই আমার তৃপ্তি। তবে অতৃপ্তিও কিছু আছে। তা হচ্ছে, পিটকীয় ভাষা পালি, প্রায় আড়াই

হাজার বছরের প্রাচীন একটি ভাষা যা এককালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া মহাদেশের এক বিশাল এলাকাজুড়ে শাস্ত্রীয় ভাষা হিসেবে ব্যাপক চর্চা ছিল। এমনকি মধ্য এশিয়ার গোবীওথর মরুভূমি হতে উদ্ধারকৃত পালি প্রাকৃত ভাষায় রচিত ধম্মপদ গ্রন্থ, মিলিন্দ-পঞ্হ গ্রন্থণুলো প্রমাণ করে যে, সেসব অঞ্চলের লোকদের কাছেও সমাদৃত ছিল এককালে এই ভাষা। কিন্তু কালের বিপর্যয়ে এ ভাষা এখন মাত্র গুটিকয়েক অঞ্চলের শাস্ত্রীয় ভাষা আর বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন-গবেষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। মানুষের নিত্যদিনের প্রয়োজনে ব্যবহার থেকে বঞ্চিত এই ভাষা এখন তাই বিংশ-একবিংশ শতকের মানুষের কাছে দুর্বোধ্য, আর ভাব প্রকাশে সীমাবদ্ধতার শিকার হয়ে গেছে। এ কারণেই পালি ত্রিপিটক গ্রন্থগুলোর বর্তমান বাংলা অনুবাদ করতে গেলে এক হাতের অনুবাদে অনেক ক্রটি-বিচ্যুতি অনিবার্য। এ জন্যে প্রয়োজন, পালি, ইংরেজি আর বাংলা ভাষায় সমান দক্ষতাসম্পন্ন একটি যৌথ অনুবাদক সংঘের। পূজ্য বনভন্তে প্রথমে যখন আমাকে একটির পর একটি পালি গ্রন্থ অনুবাদের দায়িত্ব দিচ্ছিলেন, তখন আমি ভন্তেকে ব্যক্ত করেছি একক অনুবাদের সমস্যাটি। তিনি বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করেই এক পর্যায়ে উৎসাহী শিষ্যগণকে আমার কাছে পালি ভাষা শেখার অনুমোদন দেন। তা সত্ত্রেও নানা বাস্তব কারণে আমরা জোটবদ্ধ হয়ে পিটকীয় অনুবাদের দায়িত্ব পালনে অক্ষম হই।

যা-ই হোক, আমাদের এই শ্রম, বাংলায় সমগ্র বিপিটকের এই প্রথম সংস্করণ তখনই সার্থক ভাববো, শত বিপত্তি সত্ত্বেও পাঠক সমাজ যদি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে বাংলায় অনূদিত এই পিটকীয় গ্রন্থগুলো পঠন-পাঠনে আগ্রহ প্রকাশ করে, পরম বুদ্ধজ্ঞানে জীবনকে ধন্য করতে এগিয়ে আসেন। ■

ভবতু সব্ব মঙ্গলম্! সবার কল্যাণ হোক!

তারিখ : ২৫৬১ বুদ্ধবর্ষের ২০ জুলাই ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ।

^{*} **লেখক পরিচিতি :** প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো, বহু পিটকীয় গ্রন্থের অনুবাদক, সুদেশক, সুলেখক, বিশিষ্ট সংগঠক ও অধ্যক্ষ, বুদ্ধগয়া প্রজ্ঞাবিহার ধ্যান কেন্দ্র, ফ্রান্স।

বুদ্ধবচন 'ত্রিপিটক' বাংলা ভাষায় অনূদিত: কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

ড. জিনবোধি ভিক্ষু

'অক্খরমেকেকং হি বুদ্ধরূপং সমযং সিযা, তস্মা হি পণ্ডিতো পোসো লিখেয্যং পিটকত্তযং'

অর্থাৎ, ত্রিপিটক শাস্ত্রের এক একটি অক্ষর বুদ্ধ সদৃশ। সে কারণে পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে ত্রিপিটকের বাণী প্রচার করা উচিত। মানব সভ্যতার ইতিহাসে মহামানব বুদ্ধের আবির্ভাব এবং তাঁর সাধনালব্ধ জ্ঞান দুটোই বিস্ময়কর বিষয়। তাঁর সাধনাদীপ্ত এবং প্রজ্ঞাদীপ্ত জীবন বিশ্বের বোধসম্পন্ন মানুষকে অভিভূত যেমন করেছেন তাঁর জীবন দর্শন ও জীবনোপলব্ধির বিষয়টিও অনেককে ভাবিয়ে তুলেছে শুধু নয় তাঁর এক একটা বাণী এক একটা মহান আদর্শে পরিণত হয়েছে। আজ তাঁর অমৃতময় মহান শান্তির বাণীগুলো বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে একেকটি মহিমা জাগিয়ে তুলেছে।

তাই বিশ্বসাহিত্য ভাগ্তারের ইতিহাসে বুদ্ধ ও তাঁর বচনগুলো এক অভিনব এবং গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। মানবের অনন্ত দুঃখমুক্তির পথ-প্রদর্শনই এ মহান বুদ্ধবচনের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিমুক্ত মহাপুরুষ তথাগত বুদ্ধের সাধনালব্ধ অর্জিত জ্ঞান হলো মুক্তির বাণী। এটা সম্পূর্ণ বুদ্ধজীবনে দীর্ঘ সাধনা সংযমতা এবং অপরিসীম ত্যাগমহিমা ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত। বলতে গেলে বুদ্ধের ধর্মদর্শন হলো বাস্তববাদী, বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিনির্ভর এবং জীবন দর্শন। যেখানে বর্ণ-বৈষম্য তথা জাতপাতের বালাই নেই। সাম্প্রদায়িক মনোভাব অনেকটা উৎখাত করা হয়েছে। সর্বজনীন ও মুক্ত বৌদ্ধিক চিন্তাচেতনার বিশ্লেষণের প্রোজ্জল দিগৃদর্শন। এ নীতি কার্যকারণের ওপর ভিত্তি করে সূপ্রতিষ্ঠিত। সর্বস্তরের মানুষের সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল ভাষায় হৃদয়ঙ্গম করার মানসে বিনয়, সূত্র এবং অভিধর্ম এ তিনটি স্তরে বিভাজনপূর্বক ত্রিপিটক নামে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ত্রিপিটকের 'ত্রি' মানে তিন এবং 'পিটক' (বিকল্পে

পেটক) শব্দের অর্থ পাত্র বা ঝুড়ি। অন্যমতে 'পিটক' শব্দের অর্থ ঝুড়িতে বা আধারে রক্ষিত পাণ্ডলিপি (পুঁথি)। 'পিটক' শব্দ ঐতিহ্য (TRADITION) অর্থেও প্রযোজ্য। প্রাচীন ভারতে গুরু-শিষ্যপরম্পরায় মৌখিক ঐতিহ্যে শাস্ত্রাদি সংরক্ষণের রীতি প্রচলিত ছিল। লিপিবদ্ধ করার রীতি প্রচলিত হওয়ার এই শাস্ত্র পৃথক আধারে রক্ষিত হতো, বুদ্ধবচন সংরক্ষণের জন্য শ্রেণিবিন্যস্ত রচনা-সংগ্রহ অর্থে 'পিটক' শব্দটি ব্যবহার শুরু হয়েছিল মনে হয়। বর্তমান পালি ত্রিপিটক তিনটি পিটকের সমষ্টি; যথা : (১) বিনয়পিটক—বৌদ্ধসংঘের বিবিধ কর্মে এবং ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণের নিয়মাবলি সম্পর্কিত রচনা-সংগ্রহ; (২) সূত্রপিটক—বুদ্ধের ধর্মদেশনা, ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যামূলক রচিত গদ্যে-পদ্যে সূত্ৰ-সংগ্ৰহ অভিধর্মপিটক—উচ্চতর ধর্মের তত্ত্ব বা ধর্মের উচ্চতর সৃক্ষ তত্ত্বালোচনা বিষয়ক রচনা-সংগ্রহ।

সূত্রপিটকে আলোচিত ধর্ম বা চিত্ত বিষয়ক শিক্ষার বিশদভাবে বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যাই অভিধর্মপিটকের প্রতিপাদ্য বিষয় (চৌধুরী, ড. বিনয়েন্দ্রনাথ. বৌদ্ধসাহিত্য; সম্পাদক : ড. সুকোমল চৌধুরী, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা-১৯৯৫)। ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে আমরা বুদ্ধবচনের নয়টি অঙ্গের (নবাঙ্গ সত্মসাসন) উল্লেখ দেখতে পাই। নয়টি অঙ্গ হলো—(১) 'সুত্ত' (সূত্ৰ) অৰ্থাৎ গদ্যে ধৰ্মোপদেশ, (২) 'গেয়্য' অৰ্থাৎ গদ্য ও পদ্যে মিশ্রিত ধর্মোপদেশ, (৩) 'বেয়্যাকরণ' (ব্যাকরণ) অর্থাৎ ব্যাখ্যা বা টীকা বৌদ্ধ সংস্কৃত ও পালি নিদান কথায় ভবিষ্যদ্বাণী অর্থে বেয়্যাকরণ শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে, (৪) 'গাথা' অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ রচনা বা কবিতা, (৫) 'উদান' অর্থাৎ সারবান সংক্ষিপ্ত আবেগময় উক্তি,

- (৬) 'ইতিবুত্তক' অর্থাৎ এটা তথাগত বলেছেন এরূপ

উক্তি আরম্ভ করে ক্ষুদ্র ভাষণ, (৭) 'জাতক' অর্থাৎ বুদ্ধের অতীত জীবনের কাহিনি, (৮) 'অব্ভূতধন্ম' (অদ্ভূতধর্ম) অর্থাৎ অলৌকিক ক্রিয়ার বিবরণ; (৯) 'বেদল্ল' অর্থাৎ প্রশ্নোত্তর বা কথোপকথনে ধর্মোপদেশ। বুদ্ধবচন বা শাস্তার শাসনের এই নবাঙ্গ, কিন্তু ত্রিপিটকের বিভিন্ন বিভাগ নয় কিংবা ত্রিপিটকের বিশেষ গ্রন্থকেও বুঝায় না। এর দ্বারা পালিশাস্ত্রের বিভিন্ন রচনাপদ্ধতির প্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে।

ত্রিপিটক কখন সংগৃহীত ও লিখিত হয় : তথাগত বুদ্ধ দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর স্বীয় সাধনালব্ধ অর্জিত জ্ঞান জীবজগতের হিত-সুখ কামনায় প্রচার করেছিলেন। তখনো কিন্তু ত্রিপিটক সংগৃহীত এবং লিপিবদ্ধ করা হয়নি। তাঁর মহাপরিনির্বাণ লাভের তিন মাস পর শাস্ত্রজ্ঞ মহাপণ্ডিত মহাকাশ্যপ মহাস্থবিরের সভাপতিত্বে

মেথেলের অশোক বিহারে পাঁচশত পণ্ডিত ভিক্ষুর উপস্থিতিতে এবং পণ্ডিত স্থবিরের সভাপতিতে এ মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। রাজার আদেশে সমস্ত ত্রিপিটক ও এর অর্থকথা তালপত্র বা ভূর্জপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। এভাবেই চতুর্থ মহাসঙ্গীতিতে ত্রিপিটক প্রথম লিখিত হয় পালি ভাষায়। এটাই বর্তমান পালি ত্রিপিটক। ত্রিপিটক বা বুদ্ধবাণীর সঙ্গে বুদ্ধের জীবন ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। উল্লেখ্য যে, পালিসাহিত্য ও বৌদ্ধদর্শনের ইতিহাস রচনার জন্য তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির মূল্য অত্যধিক। এতে শুধু বিবিধ বিনয় সম্পর্কিত মতভেদের বিষয় আলোকিত হয়েছে তা নয় 'কথাবখু' নামক মূল্যবান একটি গ্রন্থ রচনার পটভূমিকাও তৈরি হয়। 'কথাবখু' গ্রন্থে বৌদ্ধদর্শনের বহু মূল্যবান তত্ত্ব প্রশ্লোত্তরের মাধ্যমে আলোচিত। তা অনুষ্ঠিত হয়েছিল

ত্রিপিটকগুলো বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে জনসমক্ষে উপহার দেওয়ার সুসাহসী কাজ হাতে নিয়েছে যা ইতিপূর্বে কারো পক্ষে তথা সংস্থার পক্ষে তা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।

মগধরাজ অজাতশক্রর একান্ত পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বড়ভিজ্ঞ পাঁচশত অর্হৎ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে এক মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রাজগৃহের (বর্তমান রাজগির) বৈভার পর্বতের সপ্তপর্ণী গুহায় সাত মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত এই মহাসঙ্গীতিতে বুদ্ধের ধর্ম-বিনয় সংকলিত হয়। মহাপণ্ডিত মহাকাশ্যপ ছিলেন প্রশ্নকর্তা এবং বুদ্ধের প্রধান সেবক আনন্দ স্থবির ও উপালি স্থবির ছিলেন উত্তরদাতা। বিনয়ের উত্তরদাতা বিনয়শীল উপালি এবং সূত্রের উত্তরদাতা ছিলেন আনন্দ স্থবির। উপস্থিত অন্যান্য ভিক্ষুরা সেগুলোকে অনুমোদন করেন। মৌখিক আবৃত্তির মাধ্যমে প্রথম সংগৃহীত হয় মাগধী ভাষায় এ ধর্ম-বিনয়। স্মৃতিবিপুল অর্হৎগণ বিনা লিপিতে স্মৃতিদর্পণেই এই ত্রিপিটক বুদ্ধবাণী রক্ষা করেন। পরবর্তী সিংহলের রাজা বউগামনীর শাসনামলে খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতান্দীতে চতুর্থ মহাসঙ্গীতির অধিবেশন হয়।

পণ্ডিত মোগ্গলিপুত্ত তিস্স স্থবিরের নেতৃত্বে এবং মহামতি সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় আধুনিক পণ্ডিতদের মতে 'কথাবখু' অভিধর্মপিটকের গ্রন্থগুলোর মধ্যে সর্বশেষ রচিত এবং এটাই একমাত্র গ্রন্থ যার রচয়িতার নাম সিংহলী ঐতিহ্য হতে জানা গিয়েছে। সম্ভবত খ্রিষ্টপূর্ব তয় শতান্দীর পূর্বে অভিধর্মপিটকের গ্রন্থগুলোর রচনা আরম্ভ হয়েছিল (Wintermitz; History of Indian Literature. ii. P.ii)।

বুদ্ধবচনের বিশোধনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো দ্বিতীয় মহাসঙ্গীতি। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের একশত বছর পর রাজা কালাশোকের রাজত্বকালে বৈশালীতে বিনয়শীল পণ্ডিত রেবত স্থবিরের সভাপতিত্বেতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাতে সাতশ অর্হৎ ভিক্ষু অংশগ্রহণ করেন এবং আট মাসব্যাপী এই মহাসঙ্গীতির কার্য চলেছিল। এতে বজ্জীপুত্রীয় কতিপয় ভিক্ষু বুদ্ধের

বিনয়ের নিয়ম ভঙ্গ করে দশটি আলাদা নিয়ম বুদ্ধবাণীতে অন্তর্ভুক্ত করার অপচেষ্টা করেছিলেন। স্থবির যশ কাকন্দক পুত্র বজ্জী ভিক্ষুদের এরূপ আচরণের প্রতিবাদ করার দরুন বজ্জী ভিক্ষুণণ সম্মিলিতভাবে স্থবির যশকে 'পটিসারণীযকমা' নামক দণ্ড কর্ম প্রদান করেন। যশ স্থবির অপরাধী এবং দুর্বিনয়ী ভিক্ষুদের কথায় কর্ণপাত না করে বৈশালীবাসী গৃহীদের কাছে অধর্মের হাত থেকে বুদ্ধধর্মকে রক্ষা করার জন্য আহ্বান জানালে বজ্জী ভিক্ষুরা আরও ক্ষুব্ধ হয়ে পুনরায় যশ স্থবিরের ওপর 'উক্খেপনীয় দণ্ডকর্ম' আরোপ করেন। এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে যশ স্থবিরকে সংঘ থেকে বহিদ্ধার করা হয়। ফলে সংঘ দুভাগে বিভক্ত হয়। বজ্জীপুত্রীয় ভিক্ষুসংঘ যে সকল নিয়ম ভঙ্গ করেন এগুলোকে একত্রে দশ বখুনি বলা হতো।

সেই সময় মহামান্য সম্ভূত সানবাসী অহোগঙ্গ পর্বতে অবস্থান করছিলেন। তিনি উক্ত দশ বখুনি সম্পর্কে যশ স্থবিরের প্রতিবাদের বিষয়গুলো সম্পর্কে অবহিত হন এবং পশ্চিম-ভারতে ৬০ জন প্রাজ্ঞ ভিক্ষুসংঘ এবং দক্ষিণ ভারতের ৮৮জন ভিক্ষু সম্ভূত স্থবিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এগুলোর আশু সমাধানের জন্য সুব্যবস্থা করেন। তাঁরা সবাই বুঝতে পারলেন যে, 'দশ বখুনি' বুদ্ধের বিনয়বহির্ভূত এবং ভবিষ্যতে ভিক্ষুগণের বিরাট ক্ষতি এবং অনিয়ম হবে। তাঁরা সানবাসীর পরামর্শক্রমে সকলে মহামান্য রেবত মহাস্থবিরের সাক্ষাৎ করেন। পণ্ডিত রেবত স্থবির সমস্ত বিনয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করেন। যশ স্থবিরের পক্ষে রায় প্রদান করেন, দশবখুনী বিনয় সম্মত নয়। বজ্জী ভিক্ষুগণের এটি পরিত্যাগ করা কর্তব্য (বড়য়া, ড. রবীন্দ্র বিজয়; পালি সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী; ঢাকা-১৯৮০, পৃ. ৩৩৩)।

তখন সঙ্গীতির মাধ্যমে সর্বসম্মতভাবে 'দশ বখুনি' অবিনয়সম্মত বলে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। চূলবগ্ণো উল্লেখ করা হয়েছে, সব্বকামী সঙ্গীতি সভায় ধর্মাসন অলংকৃত করেন এবং রেবত স্থবির সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হয়ে সঙ্গায়ন কার্য পরিচালনা করেন এবং সাতশ অর্হৎ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। প্রথম মহাঙ্গীতির অনুকরণে সমস্ত কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। সেখানে দুই পক্ষের মধ্যে বহুপ্রকার বিষয় নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে আটজন ভিক্ষু দ্বারা একটি কারক সভা গঠিত হয়। পূর্ব ভারতীয় চারজন এবং পশ্চিম ভারতীয়

চারজন ভিক্ষু এতে অংশগ্রহণ করেন। মহাবংশে নিম্নলিখিতভাবে তাঁদের নাম দেওয়া হয়েছে। যথা : সব্বকামী, সালথ, খুজ্জসোভিত, বস্ভু (এই চারজন প্রাচীনকা) এবং রেবত, সম্ভূত সানবাসী, যশ কাকন্দক পুত্ত এবং সুমন (এই চারজন পাবেয়্যক) (পালি সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪)।

থেরবাদী বৌদ্ধরা এক বাক্যে স্বীকার করেন যে ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর থেকে সর্বমোট পাঁচটি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম তিনটি সঙ্গীতি বুদ্ধের পরিনির্বাণের তিনশ বছরের মধ্যে মগধে অনুষ্ঠিত হয়। চতুর্থ মহাসঙ্গীতি সিংহলে এবং পঞ্চম সঙ্গীতি রাজা মিনডনের রাজত্বকালে মান্দালয়ে অনুষ্ঠিত হয় ১৮৭১ সালে। পূর্বোক্ত সঙ্গীতিতে ত্রিপিটক আবৃত্তি ও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত। চতুর্থ সঙ্গীতির অবসানে সিংহল রাজ বট্টগামনীয় আদেশে সমস্ত ত্রিপিটক অট্ঠকথা ভূর্জপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং পঞ্চম সঙ্গীতির অবসানে ত্রিপিটক ত্রিপিটক রাজ্বসানে ত্রিপিটক ত্রিপিটক রাহ্যে বিনয়পিটক ১১১টি, সূত্রপিটক ৪১০টি, আর অভিধর্মপিটক ২০৮টি মার্বেল পাথরে খোদিত করা হয় (পালি সাহিত্যেও ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৪৪)।

আরও উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫৪ সালে ২৫০০তম বদ্ধজয়ন্তী বর্ষে ব্রহ্মদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী সদ্ধর্মানুরাগী উ নু-র পৃষ্ঠপোষকতায় ২৪জন বিশিষ্ট ও উপাধিপ্রাপ্ত ভিক্ষুদের নিয়ে সুপ্রিম সংঘ কাউন্সিল গঠন হয়েছিল। ভিক্ষুদের মধ্যে মহারাষ্ট্রগুরু উপাধিপ্রাপ্ত ঞো এতং ছেয়াদ নামে প্রখ্যাত অশীতি বৎসর বয়স্ক মহামান্য রেবত মহাস্থবিরকে এই সঙ্গীতির নায়ক নির্বাচিত করা হয়। ৬ বছর যাবৎ এই সঙ্গায়ন চলেছিল। বিশ্বের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। ষষ্ঠ বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি রেঙ্গুনের বুদ্ধশাসন কাউন্সিলের উদ্যোগে কাবা আয়ে বিশ্বশান্তি প্যাগোডায় অর্থাৎ মহাপাষাণ গুহায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত মহাসঙ্গীতিতে দেশ-বিদেশের ২৫০০ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ভিক্ষুগণ উপস্থিত ছিলেন। এই সঙ্গীতিতে ত্রিপিটক বিশোধনসহ বার্মা ভাষায় লিপিবদ্ধ করে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পালি ভাষায় বিরচিত ত্রিপিটক: তথাগত বুদ্ধের মহান বাণীকে ভিত্তি করে ত্রিপিটক সংকলিত হয়েছিল ত্রিপিটকের ভাষা পালি ভাষা নামে খ্যাত। তৎকালীন সর্বসাধারণের বোধগম্য ভাষা ছিল পালি। যে ভাষাতে বুদ্ধ সদা সর্বদা উপদেশ প্রদান করতেন। আজ সারা বিশ্বের পালি ভাষার চর্চা ও গবেষণা অপরিহার্য শুধু নয় মানবজীবন গঠনে বুদ্ধবাণী সত্যিই অভূতপূর্ব ও সর্বজনীন যা মানুষকে মানুষের পদমর্যাদা যুগে যুগে উন্নীত করেছে। পরবর্তীকালে সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, চীন, জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে ত্রিপিটক এবং ত্রিপিটকবহির্ভূত বহু পালি এস্থ রচিত হয়েছিল। পালি ভাষার ত্রিপিটক একান্তভাবে থেরবাদী বা বিভজ্জবাদীদের অবদান। পালি সাহিত্যের ইতিহাস বিরাট ও বিস্তৃত। পালি ভাষার তথাগত বুদ্ধের মুখনিঃসৃত ভাষা হিসেবে প্রতিভাত। অর্থকথাকার আচার্য বুদ্ধঘোষের সময়ে (খ্রিষ্টীয় ৫ম শতাব্দী) 'পালি' শব্দটি ত্রিপিটক মূল গ্রন্থ বুঝাতে প্রযুক্ত হতো। চূলবংসে উল্লেখিত আছে: 'পালিমত্তং ইধানীতং ন অটুঠকথা এব' অর্থাৎ পালিই শুধু এখানে (সিংহল) আনীত হয়েছে, অর্থকথা (টীকা) নয়। বুদ্ধঘোষ নিজেও তাঁর অর্থকথাণ্ডলোতে পালি শব্দটি একই অর্থে প্রয়োগ করেছেন। অর্থকথায় পালি শব্দের প্রতিশব্দগুলো পাওয়া যায়। আবার সিংহলী ঐতিহ্যে ত্রিপিটকের ভাষাকে অর্থাৎ পালির ভাষাকে বলা হয়েছে মাগধী নিরুক্তি অর্থাৎ মগধের ভাষা। বুদ্ধঘোষ ও বুদ্ধবচনের ভাষাকে মাগধী নিরুত্তি বলেছেন (চৌধুরী, ড. বিনয়েন্দ্রনাথ, বৌদ্ধসাহিত্য, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা-১৯৯৫, পু. १)।

ত্রিপিটক শাস্ত্রের শ্রেণিবিন্যাস : পালি ত্রিপিটক গ্রন্থগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে; যথা : ১। বিনয়পিটক, ২। সূত্রপিটক, ৩। অভিধর্মপিটক। তন্মধ্যে বিনয়পিটক একুশ হাজার, সূত্রপিটক একুশ হাজার এবং অভিধর্মপিটক ৪২ হাজার সর্বমোট ৮৪ হাজার ধর্মবাণীর মধ্যে ৮২ হাজার বুদ্ধভাষিত এবং অবশিষ্ট ২ হাজার শ্রাবকভাষিত। বুদ্ধের দেশিত উপদেশগুলো সাধারণত ধর্মস্বন্ধ নামে অভিহিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন:

'দ্বাসীতি বুদ্ধতো গণ্হি দ্বে সহস্সানি ভিক্খুতো, চতুরাসীতি সহস্সানি যে মে ধন্মা পবত্তিতো'। তথাগত বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণকালে ভিক্ষুগণকে

বলেছিলেন, এই চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ রইল। এতদিন আমি একাই তোমাদের উপদেশ দিয়েছি ও অনুশাসন করেছি। আমার পরিনির্বাণের পর এই চুরাশি হাজার ধর্মক্ষন্ধ তোমাদের উপদেশ দেবে এবং অনুশাসন করবে। এ কারণে বৌদ্ধশাস্ত্রে উক্ত চুরাশি হাজার ধর্মক্ষন্ধ বা ত্রিপিটক বুদ্ধের ধর্মকায় বিবেচিত হয়ে থাকে। বিনয়পিটক পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত; যথা : ১। পারাজিকা, ২। পাচিত্তিয়, ৩। মহাবর্গ, ৪। চূলবর্গ ও ৫। পরিবার পাঠ। এই বিনয়পিটক মূলত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের নিত্য প্রতিপাল্য শীল বা নীতিনিয়মগুলো দৃষ্টান্তসহ বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত এবং শীল লঙ্খনের শান্তি ও তার প্রায়শ্চিত্তাদি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এখানে 'বিনয়' শব্দের অর্থ পরিচালনা, নিয়ম বা নীতি-শৃঙ্খলা, ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের সামগ্রিক জীবন-যাপন ও আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ আরোপ-সংক্রান্ত আলোচনা শাস্ত্রই বিনয়পিটক।

এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ বলেছেন, 'বিন্যনাম বুদ্ধসাসনস্স আয়। বিনযং ঠিতে বুদ্ধসাসনং ঠিতং হোতি'—অর্থাৎ বিনয় বুদ্ধশাসনের আয়ুস্বরূপ। বিনয় ছাড়া বুদ্ধশাসনের স্থিতি অকল্পনীয়। জগতের সকল বস্তুই কোনো নিয়ম, শৃঙ্খলা দ্বারা পরিচালিত হয়। বিশ্বজগৎ নিয়ম-শৃঙ্খলা দারা পরিচালিত হয়। বিশ্বজগতে নিয়ম-শৃঙ্খলাহীনভাবে কোনো বস্তু বর্তমান থাকতে পারে না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও নিয়ম-শৃঙ্খলা, প্রমত্তা, আলস্যপরায়নতা, দুঃশীলতা প্রভৃতি সমস্ত প্রকার উন্নতির পরিপন্থী। অপরপক্ষে নিয়ম, শৃঙ্খলা, সংযম, আত্মত্যাগ, চরিত্রবল, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, নিয়মানুবর্তিতা, উদ্যম-উৎসাহ সকল প্রকার উন্নতির মূল। তথাগত বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের শ্রীবৃদ্ধির জন্যই বিনয়ের শিক্ষাপদগুলো বিধিবদ্ধ করেছিলেন। এই নিয়মাগুলো তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাপন ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য অপরিহার্য। তাই বুদ্ধ বলেন, 'যদি কোনো ভিক্ষু শতবর্ষব্যাপী ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়ন করেও যদি শীল পালনে বিমুখ হয়. তবে তাকেও নিরয়ে গমন করতে হয়। অপরপক্ষে পাত্রচীবর ধারণ তারই শোভা পায়, যার শীল সুনির্মল। শীলবান ব্যক্তির প্রব্রজ্যা জীবন সুখকর হয়।

আরও বলা হয়েছে: 'যে ব্যক্তি বিনয় বিষয়ে অজ্ঞ, তার পক্ষে শিক্ষাপদ পালন করা বাতুলতা মাত্র'। সাধনমার্গে অগ্রসর হলে প্রথমেই শিক্ষাপদগুলো পালন করা অবশ্যই কর্তব্য। দুঃশীল ব্যক্তির কখনো সমাধি লাভ হয় না। বিনয়-শিক্ষাপদ সমাধির ভিত্তিস্বরূপ। এই কারণে বিনয়ের পঠন-পাঠন একান্ত প্রয়োজন, বিনয়পিটকের প্রতিটি গ্রন্থ এসব নীতি-নিয়মে ভরপুর, যা অনুধ্যান ও অনুশীলন করলে উন্নত মার্গ ও ফলজ্ঞানে উন্নীত হতে সক্ষম হয়।

দ্বিতীয় **সূত্রপিটক**—এ পিটকও পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত; যথা : ১. দীর্ঘনিকায়, ২. মধ্যমনিকায়, ৩. সংযুক্তনিকায়, ৪. অঙ্গুত্তরনিকায়, ৫. খুদ্দকনিকায়।

আবার খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্গত ১৫টি গ্রন্থ; যথা : ১) খুদ্দক পাঠ, ২) ধর্মপদ, ৩) উদান, ৪) ইতিবুত্তক, ৫) সূত্রনিপাত, ৬) বিমানবখু, ৭) প্রেতবখু, ৮) থেরগাথা, ৯) থেরীগাথা, ১০) জাতক, ১১) নির্দেশ, ১২) প্রতিসম্ভিদামার্গ, ১৩) অপদান, ১৪) বুদ্ধবংশ ও ১৫) চরিয়াপিটক।

তথাগত বুদ্ধের উপদেশগুলো এই পিটকে সংগৃহীত। তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্য, উপাসক-উপাসিকাদের যখন যে উপদেশ প্রদান করেছেন সেই উপদেশগুলো এবং অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজক, শ্রামণ, ব্রাহ্মণ, রাজা, মহারাজা, ক্ষত্রিয়, রাজমহামাতা প্রভৃতির সঙ্গে বুদ্ধের আলাপ-আলোচনা হয়েছিল তা সূত্রপিটকে সংগৃহীত হয়েছে। ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপসিকাদের এতদ্যতীত আতারক্ষার জন্য যা বলেছেন তাও এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। বিনয়পিটক যেমন বৌদ্ধসংঘের ইতিহাস ও সংঘের মধ্যে ভিক্ষু-ভিক্ষুদের জীবনযাত্রার আচরণবিধি বানিয়ে রচিত এবং শীল বিষয়ক শিক্ষার ওপর আলোকপাত করে, তেমনই বুদ্ধপ্রচারিত ধর্মের মূলতত্ত্ব ও সেই তত্ত্তুলোর বিশদ বিশ্লেষণ এবং নৈতিক উপদেশ সূত্রপিটকে বিধৃত আছে। বুদ্ধের আধ্যাত্মিক ধ্যানসাধনার তিনটি পর্যায় শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা সূত্রপিটকে সুব্যাখ্যাত রয়েছে। চতুরার্যসত্য, কার্যকারণতত্ত্ব, নির্বাণ প্রভৃতি বুদ্ধের ভৌগোলিক বিবরণ এবং প্রাক-বৌদ্ধযুগের ধর্মীয় বিশ্বাস ও দার্শনিক চিন্তাধারার ওপরও সূত্রপিটক আলোকপাত করে।

তৃতীয় অভিধর্মপিটক—এ পিটক সাত খণ্ডে বিভক্ত; যথা : ১) ধর্মসঙ্গণী, ২) বিভঙ্গ, ৩) ধাতুকথা, ৪) পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি, ৫) কথাবখু, ৬) যমক ও ৭) পট্ঠান। ব্রিপিটকের তৃতীয় ও শেষ বিভাগ হলো 'অভিধর্মপিটক'। 'অভি' উপসর্গের সঙ্গে ধন্ম শব্দটি যোগ করে অভিধর্ম পদ গঠিত হয়েছে। 'অভি' উপসর্গের অর্থ অতিরিক্ত বা অধিকতর। এখানে 'ধর্ম' শব্দের অর্থ চিন্তনীয় বিষয়। সুতরাং অভিধর্মের অর্থ অতিরিক্ত ধর্ম বা অধিকতর ধর্ম। বলা বাহুল্য বুদ্ধের সেই দার্শনিক তত্ত ও

মনস্তত্ত্বমূলক দেশনাই 'অভিধর্ম' নামে অভিহিত। আচার্য অথসালিনী বুদ্ধঘোষ তাঁর **গ্রন্থে**র নিমূলিখিতভাবে অভিধর্মপিটকের পরিচয় করেছেন। পরম কারুণিক ভগবান বুদ্ধচরিত অসংখ্য লক্ষকল্প পারমীপূর্ণ করার পর ছয় বছর কঠোর তপশ্চরণ বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুমমূলে উপবিষ্ট হয়ে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করেন। তিনি সেই বোধিদ্রুমমূলে উপবেশন করে চিন্তা করতে গিয়ে 'আমি এই আসনে উপবেশন করে আড়াই হাজার ক্রেশ পরিত্যাগ করতে সমর্থ হয়েছি'। আচার্য বুদ্ধঘোষ অভিধর্মের অর্থ করেছেন ধর্মের অতিরিক্তই অভিধর্ম। এর সঙ্গে Metaphysics বা অধিবিদ্যার কোনো সম্পর্ক নেই (Wintermitz. HIL. II, p. ১৬৫)। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম ও অভিধর্মের আলোচ্য বিষয় প্রায় একরূপ (বৌদ্ধ সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫)। সূত্রপিটকে শীলধর্ম ও দার্শনিক তত্ত্বের যে তালিকা পাওয়া যায় অভিধর্মপিটকে সেই মাতিকা বা তালিকার বিশদ ও পরিবর্ধিত রূপ পাওয়া যায়। অভিধর্মপিটক সূত্রপিটকের পরিপুরক বলা যায়। বৌদ্ধ ঐতিহ্যে সূত্রকেই অভিধর্মের ভিত্তি বলা হয় (Wintermitz. HIL. II, p. ১৬৬)।

অভিধর্ম বুদ্ধের ধর্মদর্শনের গভীর মননশীল তার চরম বিকাশ। অভিধর্মে প্রকৃষ্ট জ্ঞান ছাড়া কেউ উত্তম ধর্মকথক হতে পারে না।

বুদ্ধবচন ত্রিপিটক বৌদ্ধ সাহিত্য একদিকে মানবিক মূল্যবোধের উন্মেষ অন্যদিকে বিশ্বমানবতা ও বিশ্বশান্তির বার্তা বহন করে। বুদ্ধবাণী এমনতর বাণী যেখানে মানুষের যা কিছু প্রয়োজন সবই উল্লেখিত রয়েছে। ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, রাজনীতি, গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, শিল্পকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, সাহিত্য, দর্শন, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, বিজ্ঞানের সর্বদিকসহ দেহতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের গভীর বিষয়াবলি সগৌরবে সময়োপযোগী বাস্তবতা ও বিজ্ঞান-মনস্কতার সম্যক পরিচয় বহন করে। বুদ্ধবচন ত্রিপিটক শাস্ত্রের গ্রন্থগুলো পালি ভাষাসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় ভাষান্তরিত হয়েছে। যে যে দেশের মানুষ বুদ্ধবচন বিষয়ে যথেষ্ট পারঙ্গমতা লাভে ধন্য ও কৃতার্থ; যেমন: ইংরেজি, দেবনাগরী, বার্মা, সিংহলী, থাই, হিন্দি ইত্যাদি ভাষায় সম্পূৰ্ণ ত্ৰিপিটক গ্ৰন্থ অনূদিত ও প্ৰকাশিত হয়েছে।

পালি ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার সম্পর্ক : বাংলা ভাষার সঙ্গে পালি ভাষার সম্পর্ক খুবই বেশি গভীর। এই পালি ভাষা বহুদিন ধরে পাক-ভারতের বৃহত্তর অংশের কথিত ভাষা ছিল। কালক্রমে তা প্রাক মৌর্য ও মৌর্যুগেরষ্ট্রীয় ভাষার স্থান অধিকার করে। এমতাবস্থায় প্রায় ১৮০০ বংসর ধরে এই ভাষার অধ্যয়ন অধ্যাপনা ও আলোচিত হওয়ার ফলে ওইসব অঞ্চলের স্থানীয় কথ্য ভাষার ওপর পালির প্রভাব বিশেষভাবে প্রকট। বাংলা, হিন্দী, নেপালি, অসমীয়া, বর্মী ও সিংহলী ভাষার উৎপত্তির ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে পালি ভাষার জ্ঞান অপরিহার্য।

চর্যাপদ বা চর্যাগীতির সঙ্গে বাংলা ভাষার সম্পর্ক:
কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে পালি-প্রাকৃত ভাষা হতে
বাংলা ভাষার উদ্ভব। ভাষার ক্রমবির্বতনের ধারা
অনুসারে অপদ্রংশই মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষার শেষ স্তর।
বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হলো চর্যাপদ বা
চর্যাগীতি। অপদ্রংশ ভাষার সঙ্গে চর্যাপদের ভাষার ঘনিষ্ঠ

আজ বিশ্ব মাতৃভাষার গৌরব অর্জন করেছে। বাংলা ভাষা এই বন্ধুর পথযাত্রায় যাদের অবদান সর্বাথ্রে স্মরণীয় তাঁরা হলেন, চুরাশী সিদ্ধাচার্য নামে খ্যাত। তাঁরা দোঁহা, গীতিকা ও সাধনভূমির গ্রন্থাদি প্রণয়ন করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মহান ধারাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। এই সময়ে পণ্ডিত শীলভদ্র, শান্তিদেব, শান্তিপাদ, কমলশীল, সরোরুহ বজ্র (পদ্মবজ্র), শান্তরক্ষিত, কুর্কুরিপাদ, শবরীপাদ, নাগবোদি, জেতারি, অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান, জ্ঞানশ্রী মিত্র, অভ্যাকর গুপ্ত, প্রজ্ঞাভদ্র, বোধিভদ্র, প্রজ্ঞাবর্মা প্রভৃতি বাঙালি বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করে বৌদ্ধ তথা বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের চর্যাপদ রচনার উত্তরকাল থেকে আধুনিককালে বৌদ্ধদের সাহিত্য অঙ্গনে বিচরণের নব প্রভাত বলা যায়। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের

বিশেষ করে বর্তমান ২০১২ সালে 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি' নামক একটি সংস্থার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পুরো ত্রিপিটকের ৫৯টি বইকে মোট ২৫ খণ্ডে কম্বাইন্ড করে পূর্ণাঙ্গ ও সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ একটি বিশাল দুরূহ কার্যক্রম সুসম্পন্ন করার উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

সম্পর্ক বিদ্যমান। চর্যাপদের ভাষায় প্রাচীনতম বাংলার সাহিত্যের রূপ বিধৃত। এই প্রাচীন বাংলায় আধুনিক চলিত বাংলার পূর্বসূরি। সুদূর পালি সাহিত্যের যুগ হতে বর্তমান চলিত বাংলার যুগ পর্যন্ত ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে একটি সামঞ্জস্য রয়েছে। এই সামঞ্জস্য সাধারণত শব্দ, বাক্যাংশ ও ক্রিয়াপদে বিদ্যমান। কিন্তু সাধু বাংলায় এর প্রভাব কিছুটা কম বললেই চলে। এসব শব্দ, বাক্যাংশ ও ক্রিয়াপদে এমন সব অর্থ থাকে যার ব্যঞ্জনা, অভিধেয় অর্থ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিশেষত বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশের ধারা, ধ্বনি, শব্দগুচ্ছ, বাগধারা পালি ভাষা ও বৌদ্ধসাহিত্যের বিবর্তনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত (বড়ুয়া, রবীন্দ্র বিজয়; পালি সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮০, পূ. ১৬)।

বৰ্তমান বিশ্বে বাংলা ভাষা এক সমৃদ্ধ ভাষা। এটি

ধ্যান-ধারণা ও জ্ঞানসাধনার এক অমূল্য অবদান।
সিদ্ধাচার্যদের রচিত চর্যা বা কবিতা বাংলা ভাষার
প্রাচীনতম সাহিত্য নিদর্শন। এই ভাষা থেকে কালক্রমে
বাংলা ভাষার প্রচলন হয়। সে-কারণে সিদ্ধাচার্যগণ
বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতিসন্তার জনক। তাদের রচিত
এই গানগুলোই আধুনিককালের চর্যাপদ বা চর্যাগীতি
নামে পরিচিত।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিংশ শতকে প্রথম পাদে ১৯০৭ সালে নেপালের দরবারে পুঁথিচালা থেকে এই চর্যাপদ (চর্যাচর্যবিনিশ্চয়) আবিষ্কার করেন। পড়ে ড. প্রবোধ চন্দ্র বাগচী, ড. শশীভূষণ দাশগুপ্ত, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (Buddhist Mystic Songs), সুকুমার সেন, ড. আর্নল্ড বাকের, সৈয়দ আলী আহসান (চর্যাগীতিকা), অতীন্দ্র মজুমদার (চর্যাপদ) এবং মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন (পুরাতাত্ত্বিক নিবন্ধাবলী) চর্যাপদ ও চৌরাশি সিদ্ধাচার্যের কাল্পনিক প্রতিকৃতি সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। (মহাথের, শ্রী জ্যোতিপাল, চর্যাপদ, চউগ্রাম, ১৯৯০, পৃ. ০৫)। বলা হয়ে থাকে বাংলা গানের এক সমৃদ্ধ উপাদান কীর্তন। তাই পণ্ডিত ও ইতিহাস গবেষকদের মতে, চর্যাপদগুলোই বাংলা কীর্তনের প্রাচীনতম নিদর্শন। অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান 'বাংলা সাহিত্য ও বৌদ্ধ প্রভাব' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'বৌদ্ধ চর্যাপদ ও দোঁহার মধ্যে দিয়ে বাংলা সাহিত্যের পরিচয় মেলে'। পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির লিখেছেন, বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ চর্যাগীতি ও দোঁহাবলি সাহিত্য রচনা করে বাংলা ভাষার ভিত্তি স্থাপন করেন।

সুপ্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশে পালি ভাষা ও বৌদ্ধ সাহিত্য চর্চা শুরু হয়। বৌদ্ধ সাহিত্য চর্চার ইতিহাসে সুবর্ণ যুগ ছিল অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে পাল আমলে। এরপর খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে ষোলো শতক তথা অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বৌদ্ধর্মের সঠিক ইতিহাস জানা যায় না। মূলত পাল রাজত্বের অবসানে বাংলায় সেন ও বর্মন আমলে বৌদ্ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। তখন বৌদ্ধ পণ্ডিত সিদ্ধাচার্য এবং প্রাচীন বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠগুলো অনেকটা নানাভাবে আক্রান্ত হয়ে ধ্বংসাবশেষে রূপ নিয়েছে শুধু নয় বৌদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য প্রায় লুপ্ত বললেও ভুল হবে না।

বুদ্ধবচন পালি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় ত্রিপিটক প্রণীত : উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁ যুগসন্ধিক্ষণে বঙ্গদেশে থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণ ও ক্রমবিকাশে মহামান্য সংঘরাজ মহাপণ্ডিত সারমেধ মহাস্থবির. আচারিয়া পূর্ণাচারসহ বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজে কতিপয় তরুণ সাংঘিক ব্যক্তিত্বদের আত্মত্যাগ ও প্রজ্ঞাময়তা গুণে ত্রিপিটক শাস্ত্রের নবজাগরণ সূচিত হয়েছে। বঙ্গদেশের প্রাচীন বৌদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য আদি পীঠস্থান চট্টগ্রাম-পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভিত্তি করে পুনরায় ভারতের প্রাচীন রাজধানী কলকাতা, মায়ানমার রেঙ্গুন এবং আরাকানে বঙ্গীয় বৌদ্ধ সাংঘিক ব্যক্তিত্বদের আন্তরিক সহায়তায় থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের কার্যক্রমকে বেগবান করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলা যায়। এ মহান আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে আজ পবিত্র ত্রিপিটক শাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ প্রকাশের এগিয়ে এসেছেন দেখে আমি আনন্দে আপ্লত এবং গৌরববোধ করছি দীর্ঘকাল। বৃদ্ধ

ও বৌদ্ধর্ম পুনর্জাগরণের প্রায় দেড়শ বছর পরে এই মহৎ কাজে 'ত্রিপিটক পাবিলিশিং সোসাইটি' এই গুরুদায়িত্ব পালন করে বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের কাছে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ শুধু হননি, বাংলা ভাষায় ত্রিপিটক সাহিত্যে জানার মহা সুযোগ করে দিয়ে তারা ধন্য ও গৌরবান্বিত হয়েছেন বলে মনে করি।

১৯৫৬ সালে ২৫০০তম বুদ্ধ জয়ন্তী উপলক্ষে মায়ানমার সাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদ্ধর্মানুরাগী ধর্মপ্রাণ উপাসক উ নু-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষকতায় ষষ্ঠ সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তখন ত্রিপিটক গ্রন্থগুলো মার্বেল পাথরে খোদাই এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল যা এখনো সেই গৌরবময় কীর্তিগাথা দেদীপ্যমান। বর্তমানে এই বুদ্ধবচন পবিত্র ত্রিপিটকভুক্ত মোট ৫৯টি গ্রন্থ 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি' হতে ২৫টি খণ্ডে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় প্রকাশ করার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। সে অনুসারে আজ সাধকশ্রেষ্ঠ পুণ্যপুরুষ মহাকল্যাণমিত্র শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবিরের (বনভন্তে) দীর্ঘদিনের সংকল্প ছিল 'বাংলা ভাষায়' বুদ্ধবচন ত্রিপিটক গ্রন্থগুলোর অনুবাদ প্রকাশ করে বাংলাভাষী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। আজ তাঁর সুযোগ্য শিষ্য-প্রশিষ্যগণ একত্রিত হয়ে এই মহৎ এবং মহতী পুণ্যকর্ম সম্পাদন করার জন্য এগিয়ে এসেছেন। যা ত্রিপিটক সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারের ইতিহাসে আরেকটি নব ইতিহাসের গোড়াপত্তন হয়েছে বলা যায়। যাঁরা (শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিত ভিক্ষু ও গৃহী) এই দুর্লভ ও শ্রমসাধ্য অনুবাদের কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও মননশক্তি দিয়ে সহায়তা করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রকাশনা সংস্থার তালিকা অনুসারে সকলের অবগতির জন্য গর্বিত অনুবাদকদের মধ্যে বর্তমান সম্পুক্ত অনুবাদকদের নাম উল্লেখ করা সমীচীন বলে মনে করি। যথাক্রমে—

১। ড. বেণীমাধব বড়ুয়া, ২। শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির, ৩। শ্রীমৎ জিনবংশ মহাস্থবির, ৪। শ্রীমৎ শীলালংকার মহাস্থবির, ৫। শ্রীমৎ ধর্মতিলক মহাস্থবির, ৬। শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির, ৭। শ্রীমৎ শান্তরক্ষিত মহাস্থবির, ৮। শ্রীমৎ ঈশান চন্দ্র ঘোষ, ৯। শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভত্তে), ১০। ভিক্ষু শীলভদ্র, ১১। ড. আশা দাশ, ১২। ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির, ১৩। ডা. সীতাংশু বিকাশ বড়ুয়া, ১৪। অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া, ১৫। শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ মহাস্থবির, ১৬। ড.

বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী, ১৭। শ্রীমৎ বুদ্ধবংশ ভিক্ষু, ১৮। শ্রীমৎ করুণাবংশ ভিক্ষু, ১৯। শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, ২০। শ্রীমৎ বঙ্গীস ভিক্ষু, ২১। শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু, ২২। শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু, ২৩। শ্রীমৎ রাহুল ভিক্ষু, ২৪। শ্রীমৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় স্থবির, ২৫। শ্রীমৎ প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু, ২৬। শ্রীমৎ সুমন স্থবির, ২৭। শ্রীমৎ আদিকল্যাণ ভিক্ষু, ২৮। শ্রীমৎ সমোধি ভিক্ষু, ২৯। শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু, ৩০। শ্রীমৎ পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু এবং ৩১। শ্রীমৎ জ্ঞানশান্ত ভিক্ষু।

উপরিউক্ত অনুবাদকবৃন্দ যেসব অমূল্য গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন তা হলো যথাক্রমে—প্রথম খণ্ডে পারাজিকা: দিতীয় খণ্ডে পাচিত্তিয় ও মহাবর্গ; তৃতীয় খণ্ডে চূলবর্গ ও পরিবার; চতুর্থ খণ্ডে দীর্ঘনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড); পঞ্চম খণ্ডে মধ্যমনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড); ষষ্ঠ খণ্ডে সংযুক্তনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড); সপ্তম খণ্ডে সংযুক্তনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড); অষ্টম খণ্ডে অঙ্গুত্তরনিকায় (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড); নবম খণ্ডে অঙ্গুত্তরনিকায় (পঞ্চক ও ষষ্ঠক নিপাত); দশম খণ্ডে অঙ্গুত্তরনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড); একাদশ খণ্ডে খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, সুত্তনিপাত, ইতিবৃত্তক, প্রেতকাহিনি; দ্বাদশ খণ্ডে থেরীগাথা, বুদ্ধবংশ, চরিয়াপিটক; ত্রয়োদশ খণ্ডে অপদান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড); চতুর্দশ খণ্ডে জাতক (প্রথম ও দ্বিতীয়), পঞ্চদশ খণ্ডে জাতক (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড); ষোড়শ খণ্ডে জাতক (পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড); সপ্তদশ খণ্ডে মহানির্দেশ ও চূলনির্দেশ; অষ্টাদশ খণ্ডে প্রতিসম্ভিদামার্গ ও নেত্রিপ্রকরণ; উনবিংশ খণ্ডে মিলিন্দ-প্রশ্ন ও পিটকোপদেশ; বিংশ খণ্ডে ধর্মসঙ্গণী ও বিভঙ্গ; একবিংশ খণ্ডে ধাতুকথা, পুদাল-প্রজ্ঞপ্তি ও কথাবখু; দ্বাবিংশ খণ্ডে যমক (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড); ত্রয়োবিংশ খণ্ডে পট্ঠান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড); চতুর্বিংশ খণ্ডে পট্ঠান (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড); পঞ্চবিংশ খণ্ডে পট্ঠান (পঞ্চম খণ্ড)।

আজ স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা বাংলা ভাষায় মূল পালি ত্রিপিটক প্রকাশ করার উদ্যোগকে স্বাগতম, অভিনন্দন এবং মহতী প্রয়াসকে সাধুবাদ জানাই। বঙ্গীয় বৌদ্ধসমাজে অনেক জ্ঞানী-গুণী এবং শাস্ত্রজ্ঞ ভিক্ষু এবং গৃহীদের মধ্যে থেকে ইতিমধ্যে ত্রিপিটক শাস্ত্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বাংলা ভাষায় এবং পালি অক্ষরে বাংলায় প্রকাশ করে এই সমাজকে উপহার দিয়েছেন। তা কিঞ্জ

সম্পূর্ণ ত্রিপিটক গ্রন্থগুলো নয়। সূত্র, বিনয় এবং অভিধর্মের কয়েকটি খণ্ড মাত্র। ভারত-বাংলা উপমহাদেশের অনন্য সাধক আত্মত্যাগী পুণ্যপুরুষ ভদন্ত সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) বাংলা ভাষায় পালি ত্রিপিটক গ্রন্থগুলো প্রকাশের জন্য তাঁর সুযোগ্য-শিষ্য-প্রশিষ্যদের উৎসাহ-অনুপ্রেরণা এবং ধর্মপ্রাণ পুণ্যার্থী দায়ক-দায়িকাদের আন্তরিক সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

বুদ্ধের পরিভাষায় 'সব্ব দানং ধন্ম দানং জিনাতি'। অর্থাৎ সমস্ত দানের মধ্যে ধর্মদানই হলো শ্রেষ্ঠ দান। তথাগত বুদ্ধের শাসনিক এবং পুণ্যচেতনাকে অন্তরে জাগ্রত করে এগিয়ে উদারপ্রাণ অগণিত ভক্তবৃন্দ। ধাপে ধাপে পূর্বে প্রকাশিত বহু অমূল্য গ্রন্থ এবং নতুন করে অনূদিত গ্রন্থাবলি অভিনব, দৃষ্টিনন্দন, শ্রদ্ধা ও মনোযোগ আকর্ষণ হয় মতো প্রকাশ করতে শুরু করেন। বর্তমান লেখকের পক্ষে রাজবন বিহারের প্রকাশনা কাজের সূচনাকাল থেকে সহযোগিতা করার সৌভাগ্য হয়েছে। এশিয়ার সর্বপ্রথম ডিলিট ডিগ্রীধারী ড. বেণীমাধব বড় য়ার কর্তৃক ১৯১৩ সালে প্রণীত এবং অনূদিত 'সতিপট্ঠান সূত্রের' বঙ্গানুবাদ গ্রন্থের একটি কপি শ্রদ্ধেয় ভন্তেকে দেওয়ার পর উক্ত অমূল্য গ্রন্থ এবং নতুন করে অনুদিত গ্রন্থাবলি অভিনব, দৃষ্টিনন্দন, শ্রদ্ধা ও মনোযোগ আকর্ষিত হয় মতো প্রকাশ করতে শুরু করেন। লেখকের পক্ষে এ প্রকাশনা কাজের সূচনাকাল থেকে সহযোগিতা করার সৌভাগ্য হয়েছে। এশিয়ার সর্বপ্রথম ডিলিট ডিগ্রীধারী ড. বেণীমাধব বড়ুয়ার প্রণীত একটি কপি শ্রদ্ধেয় ভন্তেকে দেওয়ার পর উক্ত অমূল্য গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশের কর্ম চালু হয়েছিল। এ পর্যন্ত এই বিহার থেকে অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশ করে বুদ্ধভাবাপন্ন সাহিত্যানুরাগীদের মনের খোরাক মিটিয়ে নন্দিত হয়েছে। বর্তমানে তাঁরই বহু শিষ্য-প্রশিষ্যরা একত্রিত হয়ে সম্পূর্ণ পালি ত্রিপিটক গ্রন্থগুলো বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে জনসমক্ষে উপহার দেওয়ার সুসাহসী কাজ হাতে নিয়েছে যা ইতিপূর্বে কারো পক্ষে তথা সংস্থার পক্ষে তা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। তাঁরা যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে তা অতীব শুভ ও মঙ্গলময় বার্তা।

দুর্ভাগ্যবশত প্রায় দেড় শতাধিক বছরের অধিকাল যাবং বঙ্গভাষী অনেক শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত, গবেষক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় এবং ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার উদ্যোগ না থাকার দক্ষন খণ্ড খণ্ডভাবে বঙ্গভাষায় কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ ত্রিপিটকের মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য বললেও ভুল হবে না। বিশেষ করে কলকাতা বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহার, রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, বুডিডস্ট রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন সেন্টার বাংলাদেশ, প্রজ্ঞালোক প্রকাশনী, প্রজ্ঞাবংশ একাডেমী, বনভন্তে প্রকাশনী রাঙামাটি, যোগেন্দ্র রূপসীবালা ট্রাস্ট কলকাতা, চট্টগ্রাম থেকেও ব্যক্তিগতভাবে লেখক বিনয়াচার্য জিনবংশ মহাস্থবির কর্তৃক মহামুনি সংঘরাজ বিহারে থাকাকালীন ত্রিপিটকের অর্থকথাসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ অনুবাদ করে সমাজে উপহার দিলেও সামগ্রিকভাবে এই মহৎ কাজটি হয়ে উঠেনি।

সম্প্রতি সাধকশ্রেষ্ঠ পুণ্যপুরুষ শ্রীমৎ সাধনান্দ মহাস্থবিরের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে তাঁর সুযোগ্য শিষ্য-প্রশিষ্যগণ, পালি ভাষায় শাস্ত্রজ্ঞ মহান ভিক্ষুসংঘ এবং কিছু পণ্ডিত গৃহী ব্যক্তিবর্গের আন্তরিক সহায়তায় এই জাতীয় দুর্লভ গ্রন্থাদি প্রকাশ করার সুব্যবস্থাপনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রকাশিত গ্রন্থগুলোতে দুর্বোধ্য কিছু কিছু শব্দগুলোর টিকাটিপ্পনি দিয়ে ব্যাখ্যা করলে পাঠকের পক্ষে বিষয়বস্তু বুঝা সহজবোধ্য হবে। যাঁরা ইতিপূর্বে এই বিষয়ের ওপর কয়েকটি খণ্ড বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে সমাজকে উপহার দিয়েছেন তাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ও ঋণ স্বীকার করছি। তাঁদের অনুবাদের পদ্ধতি ছিল অতি সহজবোধ্য এবং টিকাটিপ্পনিতে সমৃদ্ধ।

বিশেষ করে বর্তমান ২০১২ সালে 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি' নামক একটি সংস্থার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পুরো ত্রিপিটকের ৫৯টি বইকে মোট ২৫ খণ্ডে কম্বাইন্ড করে পূর্ণাঙ্গ ও সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ একটি বিশাল দুরহ কার্যক্রম সুসম্পন্ন করার উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। সাধকশ্রেষ্ঠ পুণ্যপুরুষ বনভন্তের প্রিয়শিষ্য ইন্দ্রগুপ্ত মহাস্থবির এই সংস্থার আহ্বায়ক এবং শ্রীমৎ বিধুর মহাস্থবির, শ্রীমৎ করুণাবংশ স্থবির, শ্রীমৎ সম্বোধি স্থবির, শ্রীমৎ বঙ্গীস স্থবির, শ্রীমৎ অজিত স্থবির এবং শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু সদস্য হিসেবে এই মহতী কার্যক্রমকে বাস্তবায়নে এগিয়ে এসেছেন তাঁদের অশেষ কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন এবং পুণ্যদান করছি এবং এই বিশাল কর্মযজ্রে যাঁরা আর্থিক অনুদানসহ প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ডে সহ্যোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদেরও অশেষ পুণ্যদান এবং উত্তরন্তোর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ভবিষ্যতে ত্রিপিটক শাস্ত্রের ওপর যে কয়েকটি অর্থকথাসহ মূল্যবান পালি ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি রয়েছে তাও সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশ করে জাতিকে উপহার দেওয়ার ব্যবস্থা করলে খুবই খুশি হবো। এতে করে বুদ্ধের জীবন দর্শন, জীবনোপলিরির ও জীবনমুক্তির অমিয় বাণী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করে মানবজীবনকে সার্থক এবং মৃত্যুঞ্জয়ীর দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে সন্দেহ নেই। সবার মধ্যে প্রজ্ঞার উন্মেষ ঘটুক এবং প্রকৃত বুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত হোক, এটাই সময়ের দাবি। ■

পাদটীকা :

① দশবখুনি—১) শৃঙ্গে পুরে লবণ জমা রাখা বিধেয়, ২) দুপুরের পর ছায়া দুই আঙুল অতিক্রম করলেও আহার গ্রহণ করা বিধেয়, ৩) এখন গ্রামে গমন করব এই ভেবে পরিতৃপ্তভাবে খেয়ে নিয়ে পুনঃ গ্রামে গিয়ে অতিরিক্ত ভোজন করা বিধেয়, ৪) এক সীমাভুক্ত বহুসংখ্যক আবাসে পৃথক পৃথকভাবে উপোসথ করা বিধেয়, ৫) পরে আগত ভিক্ষুগণকে জানাবাে এই ভেবে কিছুসংখ্যক ভিক্ষু দ্বারা বিনয়কর্ম করা বিধেয়, ৬) আমার উপাধ্যায় এরূপ আচরণ করেছেন, আমার আচার্য এরূপ আচরণ করেছেন বলে সেটা আচরণ করা বিধেয়, ৭) দুধ দুধত্ব ত্যাগ করেছে অথচ এখন দধিতৃপ্রাপ্ত হয়নি। সেটা ভুক্ত প্রবারিত ভিক্ষু অতিরিক্ত হিসেবে পান করা বিধেয়, ৮) যেই সুরা এইমাত্র চোয়ানাে হয়েছে, এখনাে সুরায় পরিণত হয়নি। সেটা পান করা বিধেয়, ১) ঝালরযুক্ত বসবার আসন ব্যবহার বিধেয়, ১০) সােনা, রূপা কিংবা টাকা স্পর্শ ও গ্রহণ বিধেয়। (চূলবর্গ, অনুবাদক: ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু)

* লেখক পরিচিতি: প্রফেসর ড. জিনবোধি ভিক্ষু, পালি বিভাগ, চউগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চউগ্রাম।

ই-মেইল: jinabodhi@yahoo.com

মোবাইল: 01818095371

'ত্রিপিটক' : তিনটি পেটিকা তাদের স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা

ড. জ্ঞান রত্ন মহাথেরো

আজ ২৫৬১ বুদ্ধবর্ষ ২০১৭ সাল, জুলায় মাসের ২ তারিখ রোজ শনিবার। আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ত্রিপিটক বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়নি। তবে ত্রিপিটকের অনেকগুলো বই ইতোপূর্বে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। আমরা কোনো একদিন পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হবে এটাই আশা করেছিলাম। আজ তা হতে যাচ্ছে দেখে ও শুনে মনে অনেক তৃপ্তি অনুভব করছি। পৃথিবীতে প্রচলিত ভাষাগুলোর মধ্যে বাংলা ভাষা এক থেকে ১০টি ভাষার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলেও কেন জানি না এত অধিক বছর গত হলেও মহান বুদ্ধের মুখনিঃসূত বাণী পবিত্র ত্রিপিটক বাংলা ভাষার মুখ দেখল না। কারণ হিসেবে হয়তো ধরা যেতে পারে, এই ধর্মের অনুসারী যারা (বাংলা ভাষাভাষী) তাঁরা হয়তো বেশি শিক্ষিত ছিল না, হয়তো এই ভাষায় দক্ষতা ছিল না, থাকলেও সংখ্যায় নগণ্য, দৈনন্দিন জীবনে এই ভাষার ব্যবহার কম ছিল, অর্থনৈতিক দুর্বলতা ছিল ইত্যাদি। বুদ্ধ পরিনির্বাণের ২৫৬১ বছর পরে আজ একটি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হতে যাচ্ছে যা আমার ভাবতেও অবাক লাগে। বাংলা ভাষাভাষী মানুষগুলো কিভাবে এতদিন ধরে বুদ্ধের এই ধর্মকে তাঁদের অন্তরে ধারণ করে আছে এবং অনুশীলন করে আসছেন? সম্পূর্ণ ত্রিপিটক বাংলা ভাষায় প্রকাশিত না হলেও তাঁরা যা হাতে পেয়েছিল সেগুলো বুঝে, না বুঝে এই ধর্মকে অন্তরে ধারণ ও অনুশীলন করে আমাদেরকে আজ এতটুকু নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন এতে আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারছি না। সুদীর্ঘকাল ধরে বাংলা ভাষাভাষী মানুষগুলো এই ধর্মকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে না পারার কারণ হিসেবে বাংলা ভাষায় ত্রিপিটকের অপ্রতুলতাকে দায়ী করা যায়। আজ তাই ২৫০০ বছরের অভাবকে পরিপূর্ণ করার ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি. প্রয়াস চালাচ্ছে

বাংলাদেশ। এই সংগঠনকে ধন্যবাদ জানিয়ে খাটো করতে চাই না, তাঁদের উত্তম প্রয়াসকে সাধুবাদ জানাই।

থেরবাদ ঐতিহ্যের ধর্মগ্রন্থ পালিশাস্ত্রকে 'ত্রিপিটক' বা তিনটি পেটিকা বা তিনটি ঝুড়ি বলা হয়। তাদেরকে 'পেটিকা বা ঝুড়ি' বলা হয়, কারণ যখন শাস্ত্রগুলি মূলত লিখিত হয়েছিল, তখন সেগুলো তালপাতাতে লিখিত হয়েছিল এবং ঝুড়িতে সংরক্ষিত ছিল।

তিনটি ঝুডি হলো:

- ক) বিনয়পিটক : শৃঙ্খলা বা নিয়ম-নীতির ঝুড়ি বা পেটিকা।
 - খ) সূত্রপিটক : বক্তৃতা বা দেশনার ঝুড়ি বা পেটিকা।
- গ) অভিধর্মপিটক : বৌদ্ধ দর্শন বা বৌদ্ধ মনস্তত্ত্ব বিষয়ক ঝুড়ি বা পেটিকা।

ক) বিনয়পিটক : মূলত বৌদ্ধ সংঘের জন্য শাস্ত্রীয় নিয়মকানুন

বিনয়পিটক হলো বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘের জীবন ধারনের বিধিবিধান। এই বিধিগুলি বুদ্ধকে তাদের নির্দিষ্ট অবস্থার হিসাব করে দেয়, সেইসঙ্গে পরিষ্থিতি ব্যাখ্যা করে যা নিয়মগুলি ভেঙে যাওয়ার নেতিবাচক প্রভাব কমাতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘ দুপুরের পর আহার গ্রহণ করবেন না; যদি তারা অসুস্থ অবস্থায় অসময়ে আহার গ্রহণ করেন, এতে যদি তাঁরা উপকৃত হন তবে তারা তা করতে পারেন এতে করে বিনয়বিধান লঙ্গিত হয় না। বৌদ্ধপ্রধান দেশেও এরূপ দেখা যায়। কিন্তু বাংলাদেশে এসব অনুশীলন দায়ক-দায়িকাদের পীড়িত করে। বিনয়বিধান ও বাস্তব জীবন সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকলে মানুষেরা তা সহজে গ্রহণ করতে পারতেন। বুদ্ধের উপস্থিতিতে বিনয়ের সব বিধানগুলো রচিত হয়েছিল এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রয়োজনীয় বিনয়বিধান করেছিলেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। বুদ্ধ ধর্মপ্রচারে

ব্রতী হলে দিন দিন যখন সংঘের পরিধি বেড়ে যেতে শুরু করল, তখন সংঘকে কিছু নীতি-নিয়মের মধ্যে এনে সুসংগঠিত ও সুসংঘবদ্ধ জীবনযাপনের মানসে, বুদ্ধের শিক্ষাকে যতটুকু পারা যায় দীর্ঘজীবী করার লক্ষ্যে এবং পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে বিনয় প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল। তার অর্থ এই নয় যে, বুদ্ধ বিনয় কারও ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন।

বিনয়পিটকে সাধারণত মূল তিনটি গ্রন্থ দেখা যায়। যথা:

১। সুত্তবিভঙ্গ : ক) পারাজিকা পালি

খ) পাচিত্তিয় পালি

২। খন্ধক : ক) মহাবগ্গ

খ) চূলবগ্গ

৩। পরিবার পাঠ

১। সুত্তবিভঙ্গ : এখানে সূত্র অর্থ হচ্ছে 'পাতিমোক্খসুত্ত' বা প্রাতিমোক্ষ সূত্র। 'বিভঙ্গ' অর্থ হচ্ছে ব্যাখ্যা করা। 'পাতিমক্খ-বিভঙ্গ' অর্থ হলো প্রাতিমোক্ষের ব্যাখ্যা। 'পাতিমোক্খ' গ্রন্থটি বিনয়পিটকের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। এতে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধণ্ডলোর গুরুত্ব অনুসারে শাস্তির বিধান রয়েছে।

প্রাতিমোক্ষ গ্রন্থে ভিক্ষুদের জন্যে ২২৭টি বিধি-বিধান এবং ভিক্ষুণীদের জন্যে ৩১১টি বিধি-বিধান উল্লেখিত হয়েছে। যেমন :

আমারা লক্ষ করেছি যে, বিনয়পিটকের কোথায়ও প্রাতিমোক্ষের উল্লেখ নেই কিন্তু সূত্রবিভঙ্গের অভ্যন্তরে প্রাতিমোক্ষের উল্লেখ দেখা যায়। ধারণা করা যায় যে, প্রাতিমোক্ষের সূত্রগুলোর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সূত্রবিভঙ্গের উৎপত্তি হয়। প্রাতিমোক্ষ গ্রন্থের প্রতিটি নিয়মের উৎপত্তি, উদ্দেশ্য এবং প্রসঙ্গ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা সূত্রবিভঙ্গে লিপিবদ্ধ করা আছে। উল্লেখ্য যে, ভিক্ষুদের সূত্রবিভঙ্গকে মহাবিভঙ্গ বা ভিক্ষুবিভঙ্গ ও ভিক্ষুণীদের সূত্রবিভঙ্গকে ভিক্ষুণীবিভঙ্গ বলা হয়।

মহাবিভঙ্গ ৮টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত—যেখানে দোষানুসারে কৃত অপরাধের শাস্তি কী হতে পারে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। অন্যদিকে ভিক্ষুণীবিভঙ্গ ভিক্ষুবিভঙ্গের নীতি-আদর্শের ন্যায় বিনয়-বিধানকে স্থান দিয়ে রচনা করা হয়েছে। এটি ৭টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। আকারে ভিক্ষুবিভঙ্গ থেকে ছোটো হলেও নীতি-আদর্শ ভিক্ষুবিভঙ্গের অনুরূপ। ভিক্ষুদের অনিয়তের মতো দোষগুলো ভিক্ষুণীদের নেই।

	ভিক্ষু	ভিক্ষূণী
🕽। পারাজিকা	8	ъ
২। সঙ্ঘদিসেস	50	১৭
৩। অনিয়ত	২	
৪। নিস্পগ্নিয় পাচিত্তিয়	೨೦	೨೦
৫। পাচিত্তিয়	৯২	১৬৬
৬। পাটিদেসনীয়	8	b
৭। সেখিয়	ዓ৫	৭৫
৮। অধিকরণ সমথ	٩	٩

১। সূত্রবিভঙ্গ গ্রন্থটি তুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে :

ক) পারাজিকা : এটি বিনয়পিটকের প্রথম গ্রন্থ। এখানে ভিক্ষুদের চারি প্রকারের দোষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন : পারাজিকা, সঙ্ঘদিসেস, অনিয়ত ও নিসসন্ধিয় পাচিত্তিয়।

খ) পাচিন্তিয় : এটি বিনয়পিটকের ২য় গ্রন্থ। এখানে প্রধানত অন্য চারি প্রকার আচার-আচরণের কথা আলোচিত হয়েছে। যেমন : পাচিত্তিয়, পাটিদেসনীয়, সেখিয় ও আধিকরণ সমথ।

২। খদ্ধক: এখানের বিনয়ের অনেক ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র বিধি-বিধান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বিষয়গুলোকে পরিচ্ছেদ বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে বর্ণনা করা হয়েছে বলে তাঁকে খদ্ধক বলা হয়। বিনয়পিটকের এই ভাগে মহাবগ্গ (বিনয়পিটকের তৃতীয় গ্রন্থ) ও চূলবগ্গ (বিনয়পিটকের চতুর্থ গ্রন্থ) নামক তুটি মূল্যবান গ্রন্থ আছে। নামানুসারে মহাবগ্গ বৃহৎ অধ্যায়

নিয়ে রচিত, আর চূলবঞ্গ ছোটো ছোটো অধ্যায় নিয়ে রচিত হয়েছে। মহাবঞ্গে ১০টি অধ্যায় আর চূলবঞ্গে আছে ১২টি অধ্যায়। খন্ধকের আলোচ্য বিষয় হলো : ভিক্ষু-ভিক্ষুণীসংঘের বিবিধ নিয়মনীতি, সংঘের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, দৈনন্দিন জীবনযাপন, পোশাক-আশাক, বর্ষাবাস, ভৈষজ্য, সংঘভেদ ও বিবিধ অপরাধের শাস্তিবিধান ইত্যাদি এই অংশে আলোচিত হয়েছে।

ত। পরিবার পাঠ: এই গ্রন্থটি বিনয়পিটকের পঞ্চম বা শেষ গ্রন্থ হিসেবে উল্লেখ পাওয়া যায়। এটি সমগ্র বিনয়পিটকের সারসংক্ষেপ হিসেবেও ধরা যায়। কারণ গ্রন্থটিতে সমগ্র বিনয়পিটকের আলোচনা লক্ষ করা যায়। সূত্রবিভঙ্গ ও খন্ধক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে হলে এই গ্রন্থটি পাঠ করা অপরিহার্য। এখানে যা নতুন তা হলো ভারত ও শ্রীলংকার বৌদ্ধসংঘের ইতিহাসের তালিকাটি যা তুষ্প্রাপ্য। পরিবার পাঠ গ্রন্থটি ২১টি অধ্যায়ে রচিত হয়েছে। অনেকের ধারণা গ্রন্থটি কোনো এক শ্রীলঙ্কান বৌদ্ধ ভিক্ষু দ্বারা রচিত হয়েছে।

খ) সূত্রপিটক: বৌদ্ধধর্মের উচ্চশিক্ষা বিষয়ক ঝুড়ি বা পেটিকা

সূত্রপিটক প্রধানত বুদ্ধ দ্বারা ভাষিত দেশনাগুলোর একটি সংগ্রহ। এতে বুদ্ধের পূর্বের জীবনকাহিনি (জাতক) এবং অন্যান্য পবিত্র মানুষদের কাহিনিও রয়েছে। সম্ভবত সূত্রপিটকের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ধর্মগ্রন্থ 'ধম্মপদ', এতে বৌদ্ধ নীতি-আদর্শের পথ অনুসরণকারীদের নির্দেশাবলি ৪২৩টি গাথার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

শুরুতেই বুদ্ধর্মকে আমরা ধর্ম এবং বিনয় হিসেবে দেখে আসছি। ওপরে বিনয় সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। তাই এবার আমরা ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করব। বুদ্ধের ধর্মের মূল বর্ণনা সচরাচর আমরা দেখি সূত্রপিটকে। এখানে তাঁর ধর্ম, দর্শন, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের যথেষ্ট আলোচনা লক্ষ করা যায়। ধ্যান-ভাবনা অনুশীলনের বিষয়েও অনেক আলোচনা আমরা এখানে লক্ষ করে থাকি। তা ছাড়াও শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, পঞ্চস্কন্ধ, আর্যসত্য, অষ্টাঙ্গিক মার্গ, প্রতীত্যসমুৎপাদ, জন্মান্তর, কর্ম, কর্মফল ও নির্বাণ সম্পর্কে এই পিটকে বিশ্বভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। বৌদ্ধযুগ পূর্বের অনেক ধর্মীয় বিশ্বাস ও দর্শন বিষয়ক অনেক শিক্ষা ও আমরা এই পিটকে লক্ষ করে থাকি। তাই বৌদ্ধ সাহিত্যজগতে এবং ঐতিহাসিক তথ্য ও তত্ত্ব অবগত হওয়ার জন্য এই

পিটকের গুরুত্ব অপরিসীম।

সূত্রপিটকের পাঁচটি ভাগ আছে; যেমন : ১। দীঘনিকায়, ২। মজ্জ্বিমনিকায়, ৩। সংযুত্তনিকায়, ৪। অঙ্গুত্তরনিকায় এবং ৫। খুদ্দকনিকায়।

১। দীঘনিকায় : এটি হলো সূত্রপিটকের প্রথম গ্রন্থ। আকারে দীর্ঘ সূত্রগুলো এই গ্রন্থে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই গ্রন্থে মোট ৩৪টি সূত্র আছে যা তিনটি বর্গে বিভক্ত। যথা : সীলক্ষন্ধ বন্ধ (সূত্রসংখ্যা ১৩টি), মহাবন্ধ (সূত্রসংখ্যা ১০টি) ও পাটিকবন্ধ (সূত্রসংখ্যা ১১টি)।

২। মজ্লিমনিকায় : মজ্লিম বা মধ্যমনিকায় সূত্রপিটকের দিতীয় গ্রন্থ। সূত্রপিটকের মধ্যম আকারের সূত্রগুলো এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তাই এই নিকায়ের নাম হলো মজ্লিম বা মধ্যমনিকায়। দীর্ঘনিকায়ের তুলনায় মধ্যমনিকায়ের সূত্রগুলো আকারে ছোটো কিন্তু সবগুলো সূত্র পরিপূর্ণ। এই নিকায়ে বুদ্ধের ধর্মশিক্ষাগুলো আলোচিত হয়েছে। মধ্যমনিকায়ের সূত্রগুলো আকারে ছোটো হলেও অনেক গুরুত্ব বহন করে। মধ্যমনিকায়ে সূত্রসংখ্যা ১৫২টি। এগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ৫০টি সূত্রকে মূলপঞ্ঞ্ঞাস বা মূল পঞ্চাশ, দ্বিতীয় ৫০টি সূত্রকে মিজ্বিমপঞ্জ্ঞাস বা মধ্যম পঞ্চাশ এবং শেষের ৫২টি সূত্রকে উপরিপঞ্জাস বা পঞ্চাশের ওপরে এভাবে ভাগ করা হয়েছে। মধ্যমনিকায় গ্রন্থে ধর্মকে বিভিন্ন দিক হতে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এই গ্রন্থের উপদেশগুলো সর্বজনীন। আচারিয় বুদ্ধঘোষের মতে. 'মধ্যমনিকায় পরমত খণ্ডনে ত্রিপিটকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ'। অধ্যাপক বি এম বড়ুয়ার মতে 'বুদ্ধের জীবন ও বাণীর যথার্থ মর্ম সম্যুকভাবে উপলব্ধি করতে হলে মধ্যমনিকায়ই একমাত্র প্রমাণিক গ্রন্থ। অন্য কোনো গ্রন্থে বৃদ্ধের ধর্ম শিক্ষাগুলো এত স্পষ্ট হয়ে ফটে ওঠেনি'।

৩। সংযুক্তনিকায় : এইটি সূত্রপিটকের তৃতীয় গ্রন্থ। ইংরেজরা একে Kindred Saying অর্থাৎ সাদৃশ্য বা সমগোত্রীয় বা সমবিষয়ক সূত্রাবলি এই নিকায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে বলেই এই গ্রন্থকে সংযুক্তনিকায় হিসেবে নামাকরণ করা হেয়েছে। এই গ্রন্থে ৫৬টি সংযুক্ত আছে যা ৫টি বর্গে ভাগ করা হয়েছে। সগাথাবপ্প (যাতে ১১টি সংযুক্ত আছে), নিদানবপ্প (যাতে ১০টি সংযুক্ত আছে), খন্ধবপ্প (যাতে ১৩টি সংযুক্ত আছে), সলায়তন বপ্প (যাতে ১০টি সংযুক্ত আছে) ও মহাবপ্প (যাতে ১২টি সংযুক্ত আছে)।

8। অঙ্গুওরনিকায় : অঙ্গুওরনিকায় সূত্রপিটকের অন্তর্গত চতুর্থ নিকায় গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি ১১টি ভাগে বিভক্ত। এক একটি ভাগকে নিপাত বলা হয়। তাই তাকে একোত্তর নিকায়ও বলা হয়।

একনিপাত : ভগবান বুদ্ধ জেতবন বিহারে অবস্থানকালে এক এক ধর্ম বা বিষয় নিয়ে ভিক্ষুদের যে উপদেশ দিয়েছেন তা-ই এই অংশে সংগৃহীত হয়েছে। এই নিপাত ২০টি বর্গে বিভক্ত। যেমন : সবচেয়ে দ্রুতগামী একটিমাত্র ধর্ম আছে, যার নাম চিত্ত। এর কোনো উপমা দেয়া সহজ নয়।

তুকনিপাত : বুদ্ধের শিক্ষার তুটি বিষয় নিয়ে দেশিত উপদেশ-সংগ্রহ। এতে ১৭টি বর্গ আছে। যেমন : তুই রকম মূর্খ, তুই রকম পণ্ডিত। মূর্খ—যে নিজের দোষ স্বীকার করে না এবং যে দোষ স্বীকার করে তাকে ধর্মানুসারে ক্ষমা করে দেয়।

তিকনিপাত : বুদ্ধের ধর্ম শিক্ষার তিনটি বিষয় নিয়ে উপদেশ-সংগ্রহ এতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এই নিপাত ১৬টি বর্গে বিভক্ত। যেমন : যা কিছু ভয়, উপদ্রব ও উপসর্গ উৎপন্ন হয় তা মূর্খ থেকেই হয়, পণ্ডিত থেকে নয়।

চতুরুনিপাত : এই অংশে চারটি ধর্ম নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং এই নিপাত ২৭টি বর্গে বিভক্ত। যেমন : ভগবান বলেছেন আর্যশীল, আর্যসমাধি, আর্যপ্রজ্ঞা, এবং আর্যবিমুক্তির জ্ঞান উপলব্ধি হলে ভবতৃষ্ণা উচ্ছেদ হয়ে যায়, আর সত্ত্বের পুনর্জনা হয় না।

পঞ্চকনিপাত : এই নিপাত ২৬টি বর্গে বিভক্ত। এখানে পাঁচটি বিষয় নিয়ে আলোচনা সংগৃহীত হয়েছে। যেমন : পাঁচ প্রকার শৈক্ষ্যবল—শ্রদ্ধা, লজ্জা, পাপভীরুতা বীর্য এবং প্রজ্ঞাবল।

ছক্কনিপাত : এই নিপাত ১২টি বর্গে বিভক্ত। এখানে ছয়টি বিষয় নিয়ে আলোচিত ধর্মগুলো সংগৃহীত হয়েছে। যেমন : ছয় অনুস্মৃতি ধ্যান—বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি ও দেবতানুস্মৃতি।

সত্তকনিপাত: এটি ১০টি বর্গে বিভক্ত। সাতটি বিষয় নিয়ে আলোচিত ধর্মগুলো এখানে সংগৃহীত হয়েছে। যেমন: সাত বল—শ্রদ্ধা, বীর্য, লজ্জা, পাপভীরুতা, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা।

অট্ঠকনিপাত : এখানে ১০টি বর্গ আছে। আট প্রকার ধর্ম নিয়ে প্রদত্ত উপদেশমালা এখানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যেমন : আট লোকধর্ম—এই পৃথিবীর মানুষগুলো ৮টি লোকধর্ম দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে আসছে। এগুলো হলো—লাভ, অলাভ, যশ, অপযশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ এবং তুঃখ।

নবকনিপাত : নয় প্রকার ধর্ম নিয়ে আলোচিত বিষয়গুলো নিয়ে এটি গঠিত হয়েছে। এখানে ৯টি বর্গ আছে। যেমন : ক্ষীণাসব অর্হতের পক্ষে ৯টি বিষয় অসম্ভব—সজ্ঞানে প্রাণিহত্যা করা, চুরি করা, মৈথুনধর্ম সেবন করা, মিথ্যা বলা, গৃহীদের ন্যায় আচরণ করা, রাগের বশীভূত হওয়া, দেষের বশীভূত হওয়া, মোহের বশীভূত হওয়া ও ভয়ের বশীভূত হওয়া।

দসকনিপাত: এটি ২২টি বর্গে বিভক্ত। দশটি ধর্মকে নিয়ে প্রদন্ত উপদেশমালা এই অংশে সংগৃহীত হয়েছে। যেমন: দশ সংযোজন বা বন্ধন—সংকায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রতে অত্যধিক আসক্তি, কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধৃত্য ও অবিদ্যা।

একাদসকনিপাত : একাদশ একাদশ করে যে ধর্মগুলো আলোচিত হয়েছে তা এই অংশে সংগৃহীত হয়েছে। এখানে ৩টি বর্গ আছে। যেমন : ভিক্ষু একজন অন্য ভিক্ষুর প্রতি আক্রোশ করলে নিম্নলিখিত ১১টি সমস্যার মধ্যে থেকোনো একটি সমস্যার মধ্যে পতিত হতে পারে। যেমন : যা অপ্রাপ্ত তা প্রাপ্ত হবে না, যা প্রাপ্ত হয়েছে তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, সদ্ধর্ম স্পষ্ট হবে না, সদ্ধর্মের বিষয়ে অহংকারী হয়ে যাওয়া, ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্রক্ষাচর্য পালন করা, কোনো গুরুতর দোষে অভিযুক্ত হওয়া, ভিক্ষুজীবন ত্যাগ করে হীন জীবন গ্রহণ করা, কোনো তুরারোগ্য ব্যাধিতে আতঙ্কিত হয়ে ওঠা, পাগল হয়ে যাওয়া, বেহুঁশ হয়ে মৃত্যুবরণ করা ও মৃত্যুর পরে তুর্গতি প্রাপ্ত হওয়া।

ে। খুদ্দকনিকায় : নিকায় গ্রন্থের শেষ বা পঞ্চম গ্রন্থ।
অন্য নিকায় গ্রন্থগুলো সূত্রের সংগ্রহশালার ন্যায় হলেও
খুদ্দকনিকায় সেরূপ নয়। এখানে ছোটো বড়ো অনেক
স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। এই
নিকায়ে অনেক মূল্যবান গ্রন্থের নাম দেখা যায়। থেরবাদী
দেশগুলোর মধ্যে এই নিকায়ের গ্রন্থের সংখ্যার নিয়ে
ভিন্ন মতামত রয়েছে। আমি তা নিম্নে উপস্থাপন করছি।

শ্রীলংকা	মিয়ানমার	থ্যাইল্যান্ড
১। খুদ্দকপাঠ	খুদ্দকপাঠ	খুদ্দকপাঠ
২। ধম্মপদ	ধম্মপদ	ধম্মপদ
৩। সুত্ত নিপাত	সুত্ত নিপাত	সুত্ত নিপাত
৪। উদান	উদান	উদান
৫। ইতিবুত্তক	ইতিবুত্তক	ইতিবুত্তক
৬। বিমানবত্থ	বিমানবথু	
৭। পেতবখু	পেতবত্থ	
৮। থেরগাথা	থেরগাথা	
৯। থেরীগাথা	থেরীগাথা	
১০। জাতক	জাতক	
১১। নিদ্দেস (মহানিদ্দেস ও চূলনিদ্দেস)	নিদ্দেস (মহানিদ্দেস ও চূলনিদ্দেস)	নিদ্দেস
১২। পটিসম্ভিদামগ্গ	পটিসম্ভিদামগ্গ	পটিসম্ভিদমগ্গ
১৩। অপদান	অপদান	
১৪। বুদ্ধবংস	বুদ্ধবংস	
১৫। চরিয়াপিটক	চরিয়াপিটক	
১৬।	মিলিন্দপঞ্হা	
১৭।	সুত্তসঙ্গহ	
১৮।	পেটকোপদেস	
791	নেত্তিপকরণ	

থেরবাদীদের মধ্যে এই নিকায়ে শ্রীলংকা ১৫টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছে। আবার মিয়ানমার ১৯টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছে। কিন্তু থ্যাইল্যান্ড মাত্র ৭টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছে। গ্রন্থুগুলোর ধারণা আমি এখানে বর্ণনা করছি না। আশা করি পাঠকমহল তা মূল গ্রন্থ পাঠ করে অবগত হবেন।

গ) অভিধর্মপিটক : বাস্তবতার স্বরূপ সম্পর্কে দার্শনিক ব্যাখ্যা বা গম্ভীর ব্যাখ্যা

বুদ্ধের ধর্মের গভীর অর্থ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনেই অভিধর্মপিটক আবিষ্কৃত হয়েছে। অভিধর্মের উচ্চশিক্ষা বাস্তবতার স্বরূপ ব্যাখ্যা করে : কোনো ব্যক্তিকে এবং বিশ্বকে পাশাপাশি বিকাশের আধ্যাত্মিক স্তরের ব্যাখ্যা হিসাবে একজন ব্যক্তির মানসিক মানচিত্র রয়েছে যা একজন ব্যক্তিকে পরিপূর্ণতার পথে ধাবিত করে। এই পিটক পালি ত্রিপিটকের তৃতীয় বিভাগ। বুদ্ধ জীবিত অবস্থায় 'ধর্ম' ও 'বিনয়' নামে বুদ্ধধর্ম পরিচিতি লাভ করে, যা দ্বিতীয় সঙ্গীতি পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তৃতীয় সঙ্গীতিতে অভিধর্মের আবির্ভাব সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে।

যদিও বুদ্ধ জীবিত অবস্থায় বিভিন্ন সূত্রে অভিধর্মের ইঙ্গিত দিয়েছেন কিন্তু স্বতন্ত্র অভিধর্মপিটকের উল্লেখ কোথাও দেখা যায় না। অভিধর্মকে সন্ধিবিচ্ছেদ (অভি+ধম্ম) এরূপ দাঁডায়। এখানে 'অভি' অর্থ 'অতি' বা 'অধিক' বা গম্ভীর, আর ধম্ম অর্থ ধর্মকেই বুঝানো হয়েছে। তাই অভিধন্ম অর্থ দাঁডায় 'অতিরিক্ত ধর্ম' বা 'অধিক ধর্ম' বা 'গম্ভীর ধর্ম'। আচারিয় বুদ্ধঘোষের মতে 'ধম্মাতিরেকধম্ম বিসেসটেঠন অভিধশ্ম হলো. অভিধম্মোতি' অর্থাৎ 'ধর্মগুলোর অতিরিক্ত বিশেষার্থদ্যোতক এই অভিধর্ম'। মধ্যমনিকায় ও অঙ্গুত্তরনিকায়ের অনেক সূত্রে অভিধর্মের সূচনা দেখা যায়। খুব সম্ভব সূত্রপিটকে উল্লেখিত দর্শন ও শীলধর্মের যে মাতিকা বা তালিকার কথা বিনয়পিটকে আলোচিত হয়েছে. অভিধর্ম সেই মাতিকারই বিস্তারিত রূপের বহিঃপ্রকাশ। যদিও অভিধর্মের উৎপত্তি বিষয়ে অনেক কথা বা প্রবাদ শুনা যায়। বুদ্ধগণের ধারাবাহিকতায় দেখা যায় তাঁদের জন্মের পরে মা মৃত্যুবরণ করেন এবং তাবতিংস বা ত্রয়োতিংশ স্বর্গে উৎপন্ন হন। গৌতম বুদ্ধ

তাঁর বুদ্ধতু জ্ঞান উপলব্ধির পরে সপ্তম বর্ষে ত্রয়োতিংশ স্বর্গে গিয়ে মাকে প্রথম এই ধর্মদেশনা করেছিলেন। বুদ্ধ প্রত্যেক দিন পূর্বাহ্নে পিণ্ডচারণের জন্যে হিমালয়ের অনবতপ্ত হ্রদের অঞ্চলে আগমন করতেন। উক্ত এলাকার উত্তরকুরু অঞ্চলে পিণ্ডচারণ শেষে অনবতপ্ত হদের তীরে বসে ভোজন গ্রহণ করতেন এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতেন। ঠিক ওই সময় ধর্মভাগ্রাগারিক অর্হৎ সারিপুত্র বুদ্ধের নিকট হতে ত্রয়োতিংশ স্বর্গে মাকে দেশিত অভিধর্ম সম্পর্কে জেনে নিতেন। বুদ্ধ তখন তাঁকে পুনঃ অভিধর্ম দেশনা করতেন। দেশনা শেষে বুদ্ধ ত্রয়োতিংশ স্বর্গে গমন করতেন এদিকে সারিপুত্র শ্রাবস্তীতে ফিরে এসে ভদ্দজী স্থবিরকে অবিকল বুদ্ধ দ্বারা ভাষিত অভিধর্ম আবত্তি করে শুনাতেন। এভাবে ত্রয়োতিংশ স্বর্গে তিন মাস অবস্থানকালে বুদ্ধ কর্তৃক ভাষিত অভিধর্ম বুদ্ধ থেকে সারিপুত্র, সারিপুত্র থেকে ভদ্দজী, ভদ্দজী থেকে রেবত গুরুশিষ্যপরম্পরা অভিধর্ম পৃথিবীতে প্রচারিত হয়। পরিশেষে সম্রাট অশোকের সময়ে এসে তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতিতে অভিধর্ম চূড়ান্ত রূপ ধারণ করল।

অভিধর্মপিটকে সাতটি গ্রন্থ আছে : ধর্মসঙ্গণী, বিভঙ্গ, ধাতুকথা, পুগ্গলপঞ্ঞিন্তি, কথাবখু, যমক ও পট্ঠান। লক্ষ্য। ধর্মসঙ্গণীতে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচিত হয়েছে তা বিষয়ভিত্তিক ১৮টি পরিচ্ছেদে ভাগ করে বিভঙ্গ গ্রন্থটি সংকলিত হয়েছে। বিভঙ্গ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হলো, তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে বিষয়গুলোকে বর্ণনা করা হয়েছে, যা বুঝতে ও অনুধাবন করতে সহজ বলে মনে হয়। যেমন : সুত্তন্তরীতি অনুসরণ করে প্রত্যেকটি ধর্মের অর্থ ও বিভাগ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অভিধর্মরীতি অনুসরণ প্রত্যেকটি ধর্মের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আবার প্রশ্ন-জিজ্ঞাসারীতি অনুসরণ করে প্রশ্লোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেকটি ধর্মকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

ধাতুকথা : বিভঙ্গের ১৮টি ভাগের তিনটি ভাগ হলো, খন্ধবিভঙ্গ, আয়তনব-বিভঙ্গ ও ধাতুবিভঙ্গ এই তিনটি অধ্যায় ধাতুকথা গ্রন্থের মূল ভিত্তি। অন্য ১৪টি অধ্যায় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নানাভাবে উপরিউক্ত তিনটি অধ্যায়ের মাধ্যমে বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

পুগ্গলপঞ্ঞন্তি: এটি অভিধর্মপিটকের সবচেয়ে ছোটো গ্রন্থ। দীর্ঘনিকায়ের সঙ্গীতি সূত্রের সঙ্গে রূপগতভাবে এই গ্রন্থের অনেক সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। আবার পুগ্গলপঞ্জন্তি গ্রন্থের তৃতীয় থেকে পঞ্চম অধ্যায়ের অধিকাংশ অঙ্গুত্তরনিকায়ে দৃশ্যমান। 'পুগ্গল'

আমি আবারও বলছি এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হচ্ছে, এটা ভেবে সত্যিই আমি ভীষণ আনন্দিত। ইতিহাসের মাইলফলক হিসেবে এটি সত্যিই বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন প্রচারে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখবে, এতে কোনো দ্বিমত নেই।

ধর্মসঙ্গণী : গ্রন্থটির নাম থেকেই বুঝা যায় তার বিষয়বস্তু কী হতে পারে। লৌকিক ও লোকোত্তর ভেদে ধর্মগুলোর সংগণনাই এর প্রকৃত অর্থ। গ্রন্থটি তিন ভাগে বিভক্ত—প্রথম ভাগে কামাবচর, রূপাবচর, আরূপাবচর ও লোকোত্তর ভেদে ১২০ প্রকার চিত্ত এবং ৫২ প্রকার চৈতসিকের স্বরূপ, প্রকৃতি এবং পরস্পরের সম্পর্ক বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে রূপের বিশদ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তৃতীয় ভাগে পূর্বোক্ত বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

বিভঙ্গ : মূল বিষয়গুলোকে ভেঙে-চুরে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়াটাই এর আসল

শব্দের অর্থ হলো, ব্যক্তি এবং 'পঞ্জঞ্জি' শব্দের অর্থ, প্রজ্ঞপ্তি বা পরিচিতি। তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় 'ব্যক্তি পরিচয় বা পরিচিতি'। গ্রন্থটি ১০টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং এখানে বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তির বিশেষ আলোচনাসহ, সম্যকসমুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ, আর্যপুদ্দালদের (স্রোতাপন্ন থেকে অর্হৎ) পরিচয় দেয়া আছে।

কথাবথু: বুদ্ধোত্তর সময়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘে অনেক দল লক্ষ করা যায়। সমূহ বিপদের হাত থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘ ও বুদ্ধধর্মকে রক্ষা করার মানসে সম্রাট আশোক তৃতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করেছিলেন। এই সঙ্গীতিতে বিরুদ্ধবাদীরা থেরবাদের বিরুদ্ধে নিজেদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সক্ষম হননি। থেরবাদীরা বিরুদ্ধ মতবাদ খণ্ডন করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন। বাদ-প্রতিবাদের ভিত্তিতে রচিত ও সংকলিত কথাবখুকে আমরা ন্যায়শাস্ত্রের অব্যবহিত পূর্ববর্তী পটভূমি বলে ধরে নেয়া যায়। এই গ্রন্থের উপস্থাপনার সঙ্গে পালি 'মিলিন্দপঞ্হা'-এর অনেক মিল লক্ষ করা যায়। বর্তমানে প্রাপ্ত কথাবখু গ্রন্থটি ২৩টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদে ৮ থেকে ১২টি পর্যন্ত প্রশ্নোত্তর আছে। এটিই একমাত্র অভিধর্ম গ্রন্থ যার রচয়িতা তৃতীয় সঙ্গীতির সভাপতি মোগ্গলিপুত্র তিম্প স্থবির।

যমক: 'যমক' শব্দের অর্থ 'জোড়া' বা 'যমজ' বা 'যুগাু'। এই গ্রন্থ—মূল যমক, খন্ধযমক ও আয়তন যমক ইত্যাদি ১০টি 'যমক' বা অধ্যায়ে বিভক্ত। আবার প্রত্যেকটি যমক বা অধ্যায়ই স্বয়ংসম্পূর্ণ। অভিধর্মপিটকের পূর্ববর্তী পাঁচটি গ্রন্থ পাঠ করেও যেসব কঠিন বিষয় বা সমস্যা সমাধান করা যায় না, সেসব সমস্যা ও কঠিন বিষয়ের সমাধান দেয়াটাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। সত্যিই এই গ্রন্থটি খুবই তুরহ।

পট্ঠান : পট্ঠান শব্দের অর্থ প্রধান কারণ। পালি অভিধর্মপিটকে এটি সর্ববৃহৎ গ্রন্থ। বৌদ্ধধর্মে কার্যকারণনীতি নির্ণয়ের দুটি রীতি। একটি প্রতীত্যসমুৎপাদরীতি, অপরটি পট্ঠানরীতি। পট্ঠানকে প্রতীত্যসমুৎপাদেরই বিস্তারিত ব্যাখ্যা বলা হয়। প্রতীত্যসমুৎপাদের ১২টি প্রত্যয় পট্ঠানের ২৪টি প্রত্যয়াকারে অতি সহজভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পট্ঠান অভিধর্মপিটকের শেষ গ্রন্থ হিসেবে সমস্ত সম্পর্কগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছে। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ধর্মগুলোর কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই, বরং সেগুলো একটি সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি সৃষ্টি করে যাতে ক্ষুদ্রতম অংশটিও অন্য সকলকে প্রত্যয়বদ্ধ করে নিজেও প্রত্যয়োৎপন্ন হয়ে যায়।

পট্ঠানের বিষয়বস্তু খুবই তুর্জ্ঞেয়, তুর্বোধ্য। কারণ ২৪টি প্রত্যয়ের মধ্যে কোন কোন প্রত্যয় কোন কোন ধর্মের উৎপত্তিতে সহায় হয় সেটা সাধারণের উপলব্ধির বাইরে। এটা কেবল সর্বজ্ঞ তথাগত বুদ্ধেরই উপলব্ধির বিষয়। তাই বলা হয় পট্ঠান বুদ্ধগণের বিষয়, অন্য কারও নয়। আচার্য বুদ্ধঘোষ তাঁর ধর্মসঙ্গণী অট্ঠকথা অত্থসালিনীতে উল্লেখ করেছেন, 'প্রথম ছয়টি অভিধর্ম গ্রন্থ দেশনাকালে বুদ্ধের শরীর থেকে কোনো জ্যোতি বা রক্মি নির্গত হয়নি, কিন্তু পট্ঠান দেশনাকালে তাঁর শরীর থেকে ষড়বর্ণের দিব্যরক্মি চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হয়েছিল। এতেও পট্ঠান গ্রন্থের মাহাত্য্য বোঝা যায়।

কেন শাস্ত্র এত গুরুতুপূর্ণ?

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থলো বৌদ্ধ সমাজগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, কারণ বৌদ্ধরা এই ধর্মগ্রন্থগুলো অনুসরণ করে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনধারাকে পরিচালনা করতে চেষ্টা করে। সূত্রপিটকে আমরা সামাজিক জীবনধারার চিত্র লক্ষ করে থাকি। বিনয়পিটকে আমরা ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকাদের যথাযথ আচরণের কথা লক্ষ করি, সূত্রপিটকে মানুষের কোন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশ করা প্রয়োজন এবং কোন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করা দরকার, এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট মতামত প্রকাশ করে এবং অভিধর্ম বুদ্ধের শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর বিষয়ে চিন্তাভাবনাকে স্পষ্ট করতে সাহায্য করে।

এ ছাড়া ধর্মগ্রন্থগুলো দৈনিক জীবন্যাপন কীভাবে করতে হবে, প্রার্থনা এবং ধ্যান-ভাবনার মাধ্যমে নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নয়নের জন্যও শিক্ষা দিয়ে থাকে। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলো একদিকে আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মীয় জীবন এবং নিয়মিত প্রতিদিনের জীবন যাপনের দিক নির্দেশিকা, উভয় জীবনের সকল দিক পরিচালনার নির্দেশ প্রদান করে থাকে।

আমার শত ব্যস্ততাকে উপেক্ষা করে ত্রিপিটকের ওপর সামগ্রিক একটা আলোচনায় হাত দিয়েছি। আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি সুধী পাঠকসমাজের নিকট সমগ্র ত্রিপিটকের একটা ধারণা তুলে ধরতে। জানি না কতটুকু সফল হয়েছি। আমি আবারও বলছি এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হচ্ছে, এটা ভেবে সত্যিই আমি ভীষণ আনন্দিত। ইতিহাসের মাইলফলক হিসেবে এটি সত্যিই বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন প্রচারে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখবে, এতে কোনো দ্বিমত নেই। আমি এই প্রথম বাংলা ভাষায় প্রকাশিত মহামূল্যবান পবিত্র ত্রিপিটকের বহুল প্রচার ও প্রসার কামনা করছি।

* লেখক পরিচিতি: ড. জ্ঞান রত্ন মহাথেরো, সহযোগী অধ্যাপক, পালি বিভাগ, চউগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চউগ্রাম।

এই প্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ : একটি অবিস্মরণীয় ও ঐতিহাসিক মাইলফলক

ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু

২৫ আগস্ট ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ এই দিনটি ভারত-বাংলা বৌদ্ধ ইতিহাসের একটি অবিম্মরণীয় ও ঐতিহাসিক দিন। এই দিনটি বৌদ্ধ ইতিহাসে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে অক্ষয় হয়ে লেখা থাকবে। কারণ এই দিনটিতেই ভারত-বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাসে সুদীর্ঘ বছরের পর প্রথমবারের মতো বাংলা ভাষায় 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে মোট ২৫ খণ্ডে পূর্ণাঙ্গ ও সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি অবিম্মরণীয় ও ঐতিহাসিক মাইলফলক।

শ্রাবকবুদ্ধ পূজ্য বনভন্তের মহান স্বপ্ন, মনে জোর এনে দেওয়ার মতো উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সঠিক দিকনির্দেশনা, পূজ্য বনভন্তের ধর্ম-অন্তেবাসী আদর্শিক শিষ্য আমার শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু পুজ্যস্পদ ভদন্ত প্রজাবংশ মহাস্থবির মহোদয়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা এবং পূজ্য বনভন্তের এক ঝাঁক উদ্যোগী নিবেদিতপ্রাণ শিষ্য ও ভক্ত-অনুরাগী গৃহী উপাসক-উপাসিকাদের সম্মিলিত উদ্যোগের ফলেই আজ বাংলা ভাষায় পূর্ণাঙ্গ ও সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশের মতো মহান, বিশাল ও ঐতিহাসিক কাজ সফলভাবে সুসম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসে পুজ্য বনভন্তে ও পুজ্যস্পাদ প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির মহোদয়ের নাম উজ্জল স্বর্ণাক্ষরে অক্ষয় হয়ে লেখা থাকবে। কারণ এই দুজন মহান ব্যক্তির কল্যাণেই এতো বড়ো একটি কাজ সফলতার সঙ্গে সুসম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে, এবং এতে করে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভের দার উন্যোচিত হলো।

এতক্ষণ ধরে আমার লেখায় ঐতিহাসিক ও অবিস্মরণীয় শব্দ দুটি বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। এই প্রথম বাংলা ভাষায় পূর্ণাঙ্গ ও সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করাটা কেন ঐতিহাসিক ও অবিস্মরণীয় ঘটনা সেটি বুঝতে চাইলে বাংলা ভাষায় ত্রিপিটক প্রকাশের অতীত ইতিহাসের দিকে একটু ফিরে তাকাতে হবে।

বাংলা ভাষায় বৌদ্ধধর্মীয় গ্রন্থ বা ত্রিপিটক গ্রন্থ লেখা, অনুবাদ করা বা প্রকাশ করার ইতিহাস খুব বেশি পুরনো নয়, মোটামুটি দেড়শ বছরের কাছাকাছি। যতদূর জানা যায়, ১৮৭২ সালে বাংলা ভাষায় হরগোবিন্দ মুচ্ছুদ্দি ও গোবিন্দ চন্দ্র বড়য়ার 'পাদিমুখ' (১৮৭২) নামে ধর্মগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। কেউ কেউ আবার **'মঘা-খমুজা'**-কে প্রথম হিসেবে ধারণা করেন। কেউ কেউ আবার ফুলচন্দ্র লোথকের 'বৌদ্ধ রঞ্জিকা' বইটিকে প্রথম হিসেবে দাবি করেন। (আমি আবার এখানে বাংলায় বৌদ্ধধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশের তথ্যভিত্তিক সঠিক ইতিহাস রচনা করতে বসিনি, দয়া করে আমার ওপর ইতিহাস বিকৃতির দায় চাপাবেন ন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলায় বৌদ্ধধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশের তথ্যভিত্তিক ধারাবাহিক ইতিহাস এখনো রচিত হয়নি, কাজেই আমার মনে হয় অচিরেই হয়ে যাওয়া উচিত। আমাদের দেশে এখন শিক্ষিত গবেষক পণ্ডিত ব্যক্তির ছড়াছড়ি. তাদের কেউ একজন কেন এ কাজে এগিয়ে আসছেন না, বিষয়টি আমার মোটেই বোধগম্য হচ্ছে না।)

সে যাই হোক, উনিশ শতকের আশির দশকের গোড়ার দিকে (১৮৭২) বাংলা ভাষায় বৌদ্ধর্মীয় গ্রন্থের প্রকাশ শুরু হলেও (যতদূর জানা যায়) তার প্রায় দেড় দশক পর ১৮৮৭ সালেই প্রথম পালি থেকে মূল পিটকীয় বইয়ের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। সেটি হলো চট্টগ্রামের আবুরখীল নিবাসী পণ্ডিত ধর্মরাজ বড়ুয়ার 'সূ্ত্রনিপাত' বইটি। এর আরও আড়াই যুগ পরে শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র ঘোষ মহোদয় অর্থকথার বিস্তারিত কাহিনি ও ব্যাখ্যাসমেত মোট ছয় খণ্ডে 'জাতক' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন ১৯১৬ সালে। তারপর আরও দীর্ঘ দেড়

যুগ ধরে মূল পিটকীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায় না।

প্রথম মূল পিটকীয় বই 'সূত্রনিপাত' প্রকাশের (১৮৮৭) দীর্ঘ চার দশক পর ১৯২৮ সালে অগ্রমহাপণ্ডিক শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির অনেক আয়াস স্বীকার করে বৌদ্ধপ্রধান দেশ বার্মার (অধুনা মায়ানমারের) রাজধানী রেঙ্গুনে ধারাবাহিকভাবে সমগ্র ত্রিপিটক ও বিভিন্ন ধরনের বৌদ্ধধর্মীয় বই প্রকাশের জন্যে 'বৌদ্ধ মিশন প্রেস' নামে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তিনি সমগ্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের জন্য একদল অভিজ্ঞ অনুবাদক গোষ্ঠী গড়ে তুলেন। তিনি নিজে ও তাঁর কাছ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত

এর মধ্যে আবার ১৯৩৬-৩৭ সালের দিকে ত্রিপিটক গ্রন্থগুলো পালি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশের জন্য কলকাতায় 'যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাস্ট' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখান থেকে বেশ কয়েকটি পালি ও বাংলায় পিটকীয় বই প্রকাশ করা হয়। এর প্রায় এক যুগ পরে ১৯৫৪-১৯৫৬ দুই বছর ধরে বার্মায় ষষ্ঠ বৌদ্ধ সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সঙ্গীতি শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরে ডা. শ্রীসুধাংশু বিমল বড়ুয়া ও তার সহধর্মিণী মিলে বাংলায় ধারাবাহিকভাবে ত্রিপিটকের প্রত্যেকটি বই প্রকাশ করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে 'শ্রীত্রিপিটক প্রকাশনী প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর 'ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড', 'পালি বুক সোসাইটি', 'মহাবোধি বুক এজেন্সী',

ভারত-বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাসে সুদীর্ঘ বছরের পর প্রথমবারের মতো বাংলা ভাষায় 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে মোট ২৫ খণ্ডে পূর্ণাঙ্গ ও সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি অবিস্মরণীয় ও ঐতিহাসিক মাইলফলক।

অভিজ্ঞ ভিক্ষুদের দিয়ে মূল পিটকীয় গ্রন্থসহ নানান স্বাদের নানান মেজাজের বৌদ্ধর্মীয় বই সেই বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে প্রকাশ করতে থাকেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে যতটুকু জানা যায়, সমগ্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলেন। বৌদ্ধ মিশন প্রেস হতে প্রকাশিত শ্রী জ্যোতিপাল ভিক্ষুর 'উদান'সহ বেশ কিছু বই এখনো তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, সমগ্র বুদ্ধবাণী ত্রিপিটক প্রকাশ করার আগেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের শক্তিশালী বোমার আঘাতে প্রেসসহ ছাপানো, অর্ধ ছাপানো বই ও অনেক বইয়ের মূল্যবান পাণ্ডুলিপি পুরোপুরি জ্বলে পুড়েছাই হয়ে যায়। শোনা যায়, এই ঘটনায় তিনি নাকি ভীষণ রকম হতাশ হয়ে পড়েছিলেন।

'ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী'সহ আরও ব্যক্তিক ও সামষ্টিক উদ্যোগ বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশের ক্ষেত্রে দেখা যায়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, একটি দুটি করে মূল ত্রিপিটকের বেশিরভাগ বই ইতিপূর্বে প্রকাশিত হলেও এখনো কি ব্যক্তি কি প্রাতিষ্ঠানিক কোনো উদ্যোগেই আজ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ও সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। নিয়তির কী নির্মম পরিহাস, এর আগের যেকোনো উদ্যোগই একটি দুটি বই প্রকাশ শুরু করেছে, তাদের কাজ কিছুদিন হয়তো চলেছে, কিন্তু তারপর কেন যেন কোনো এক অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ সবকিছু থমকে গেছে। ফলে এত বছরেও আমরা, ভারত-বাংলার বাংলাভাষীরা, বাংলায় পূর্ণাঙ্গ ও সমগ্র ত্রিপিটক পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

বিগত কয়েক বছর আগে অবশ্য 'সংঘশক্তি

প্রকাশনী' নামে একটি প্রকাশনী সমগ্র ত্রিপিটক ছাপানোর মহান প্রকল্প হাতে নিয়েছিল। উক্ত প্রকাশনীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও মূল কর্ণধার ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বাবু ঝুলন কান্তি বড়য়া। উক্ত প্রকাশনী থেকে পাঁচ খণ্ড বিনয়পিটকীয় গ্রন্থগুলোকে একত্র করে 'বিনয়পিটক' নামে বড়সড়ো একটি বইও প্রকাশ করেছে। কিন্তু এই একটি বই প্রকাশ করার পর কী এক বিচিত্র কারণে সংঘশক্তি প্রকাশনীর সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশের কাজও কোথায় যেন আটকে গেছে। মোদ্দা কথা হচ্ছে, সুদীর্ঘ বছর ধরে সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশের যাবতীয় উদ্যোগ কোনো এক অশুভ শক্তির প্রভাবে সব সময় বাধাগ্রস্ত হয়েছে। আজ অতীব আনন্দিত হওয়ার দিন এই কারণে যে. অনেক চড়াইউৎড়াই পেরিয়ে. অশুভ শক্তির প্রভাব কাটিয়ে, ব্যক্তিবিশেষের যড়যন্ত্রকে ভেঙেচুরে দুমরেমুচড়ে দিয়ে 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ' ভারত-বাংলার ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো মূল ত্রিপিটকের মোট ৫৯টি বইকে কম্বাইন্ড করে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে ২৫ খণ্ডে সফলতার সঙ্গে প্রকাশ করতে পেরেছে। মূলত এ কারণেই ২৫ আগস্ট ২০১৭ দিনটি অবিশ্মরণীয় ও ঐতিহাসিক।

এমন একটি মহান, বিরাট ও ব্যয়বহুল প্রকল্প কিভাবে সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়ন সম্ভব হলো, এবার একটু সে-প্রসঙ্গে দু-চারটা কথা বলা যাক।

স্মরণকালের বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসে পরম পূজ্য শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের আবির্ভাব একটি যুগান্তকারী ও অবিস্মরণীয় ঘটনা। তিনি তাঁর অসীম প্রজ্ঞা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, ধ্যান-জ্ঞান-মনন ও সাধনার দারা এদেশের ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধর্মকে অসামান্য উজ্জল করে তুলেছিলেন। তাঁর ধর্ম-বিনয়ানুকূল কঠোর জীবনযাপন ও অসামান্য ত্যাগের ফলে এদেশের আপামর বৌদ্ধদের মনে যে দুর্লভ শ্রদ্ধাবোধ ও ধর্মজ্ঞান তিনি জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলেন অন্তত এদেশের দেড়-দুশো বছরের বৌদ্ধ ইতিহাসে তেমনটি আর কোনো সাংঘিক ব্যক্তিত্বই পারেননি। তিনি শুধু মানুষের মাঝে শ্রদ্ধাবোধ ও ধর্মজ্ঞান জাগিয়ে দিয়েই থেমে থাকেননি, জীবনের শেষদিকে ১৯৯৯-২০০০ সালের পর থেকে আপরিনির্বাণকাল তিনি মূল ত্রিপিটক গ্রন্থগুলো পালি থেকে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করে সেগুলো মানুষের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করার মাধ্যমে ধর্মজ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার কথাও তাঁর ধর্মদেশনায় প্রায়শই

বলতেন।

আমার শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু বহুগ্রন্থ প্রণেতা পণ্ডিতপ্রবর ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথের মহোদয় ১৯৯৬ সালে রাঙামাটি রাজবন বিহারে প্রথম বর্ষাবাস যাপন শুরু করেন। তারপর তিনি প্রায় পূজ্য বনভন্তের সান্নিধ্যে দীর্ঘ ছয়টি বছর অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যেই মূলত পূজ্য বনভন্তেকে পালি শিক্ষা, ত্রিপিটক শিক্ষা, মূল পালি থেকে পিটকীয় বই বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার দিকে জোর দিতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে আমার শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু পূজ্য ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথের মহোদয়ের অসামান্য অবদান ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

পূজ্য বনভন্তে তাঁর ধর্মদেশনায় প্রায় সময় বলতেন, পুরো ত্রিপিটক আছে পালি, ইংরেজি, বার্মিজ, থাই ও সিংহলী ভাষায়। চাকমা-বড়ুয়াসহ এদেশের বৌদ্ধদের বেশিরভাগ লোকই সেসব ভাষা ভালোভাবে পড়তে পারে না, বুঝতে পারে না। তাই বৌদ্ধর্ম জানতে ও বুঝতে পারছে না। না জানার, না বুঝার ফলে বৌদ্ধর্ম ঠিকমতো অনুশীলন করতে পারছে না। কাজেই পুরো ত্রিপিটককে বাংলা ও চাকমা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করতে হবে। এদেশের বৌদ্ধরা যাতে সেগুলো পড়ে ধর্মকে বুঝতে পারে, জানতে পারে। ধর্মকে যত বেশি ঠিকমতো জানতে বুঝতে পারবে ততই লোকজন দুঃখ হতে মুক্ত হতে পারবে, নির্বাণ যেতে পারবে। পূজ্য বনভন্তে বলেন, কাজেই ধর্মকে সঠিকভাবে জানতে হলে, বুঝতে হলে ত্রিপিটক পড়ার, অধ্যয়ন করার কোনো বিকল্প নেই।

পূজ্য বনভন্তে জীবদ্দশায় বিশেষত ১৯৯৯ কি ২০০০ সালের দিকে বেশি করে পালি শিক্ষা, ত্রিপিটক অনুবাদ, প্রকাশ ও অধ্যয়ন করার দিকে তাঁর শিষ্য ভিক্ষু-গৃহী সবাইকে বিশেষভাবে উৎসাহিত-অনুপ্রাণিত করেন। পূজ্য বনভন্তের উৎসাহবাক্যে আপ্যায়িত হয়ে আমরা বেশ কজন ভন্তের শিষ্য অনেক প্রতিকূলতা ও চড়াইউৎড়াই পেরিয়ে পরম পূজ্য ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ ভন্তের কাছ থেকে পালি শিক্ষা করি। পালি থেকে অনুবাদ করার মতো আমরা যে টুকটাক যৎসামান্য জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি তার সবটুকুই পূজ্য বনভন্তে ও পণ্ডিতপ্রবর ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ ভন্তের স্নেহাশীর্বাদেই সম্ভব হয়েছে। তাই আমি ব্যক্তিগতভাবে ও অন্য যারা শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ ভন্তের কাছ থেকে পালি শিখেছে তারা সকলেই এই

দুজন মহান ব্যক্তির কাছে আন্তরিকভাবে চিরকৃতজ্ঞ।

পূজ্য বনভন্তে পুরো ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের যে মহান স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁর সেই স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন জীবদ্দশায় তিনি দেখে যেতে পারেননি। অথবা একটু অন্যভাবে বললে আমরা তাঁর সেই স্বপ্ন পূরণ করতে পারিনি। এটি পূজ্য বনভন্তের শিষ্যসংঘ ও সদ্ধর্মপ্রাণ গৃহী উপাসক-উপাসিকদের বিরাট এক ব্যর্থতা বলে আমি মনে করি। যাই হোক, তাঁর জীবদ্দশায় না হলেও পরিনির্বাণোত্তরকালে তাঁর সেই মহান স্বপ্লকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১২ সালের মাঝামাঝি নাগাদ ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখে খাগড়াছড়ি জেলার সদ্ধর্মপ্রাণ কিছু

উপাসিকার উত্তরোত্তর শ্রবৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনা করছি।

যাই হোক, এই ত্রিপাসো প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিবছর বেশ কয়েকটি পিটকীয় বই প্রকাশ করে আসছে। তারপর ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হয় যে, পূজ্য বনভন্তের স্বপ্ন পূরণের জন্য এবার আমরা পূর্ণাঙ্গ ও সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশের দিকে অগ্রসর হতে পারি। সিদ্ধান্ত হওয়ার পর থেকে আমরা যে কটি বই তখনো অনূদিত হয়নি সেগুলো অনুবাদের দায়িত্ব নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করি এবং যেগুলো এর আগে অনূদিত হয়েছে সেগুলো সম্পাদনার কাজ শুক্র করে দিই। শুক্রতে আমাদের লক্ষ্য

আজ বাংলা ভাষায় পূর্ণাঙ্গ ও সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশের মতো মহান, বিশাল ও ঐতিহাসিক কাজ সফলভাবে সুসম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসে পূজ্য বনভত্তে ও পূজ্যস্পাদ প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির মহোদয়ের নাম উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে অক্ষয় হয়ে লেখা থাকবে।

উপাসক-উপাসিকাদের স্বতঃস্কূর্ত আগ্রহে ও আমারই পরামর্শে 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ' নামে একটি ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা গড়ে ওঠে। এই ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থাটি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাবান উপাসক-উপাসিকাদের প্রদত্ত মাসিক শ্রদ্ধাদানের ওপর নির্ভরশীল। আমার মনে হয় এ রকম শ্রদ্ধাদানরির্ভর ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা গোটা বাংলাদেশে এই প্রথম। এর আগে এ রকম প্রকাশনা সংস্থা কোথাও গড়ে উঠেছে বলে আমার অন্তত জানা নেই। সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে দায়িতৃপ্রাপ্ত উপাসক-উপাসিকারা (এখানে আমি দু-চারজনের নাম বলে অন্যদের খাটো করতে চাই না) যেভাবে খুব আন্তরিকতা, সত্যা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে আসছে এখনো পর্যন্ত, আমি যারপরনাই মুপ্ধ ও পুলকিত। আমি এই প্রকাশনা সংস্থাটির ও এই সংস্থায় নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করা সকল উপাসক-

ছিল, পূর্ণাঙ্গ ও সমগ্র ত্রিপিটক আমরা ২০১৯ সালের ৮ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিন উপলক্ষে প্রকাশ করবো। কিন্তু প্রুফ রিডিং, সম্পাদনা ও ছাপার কাজ শুরু করার বছর দুয়েক পর একপর্যায়ে আমরা দেখতে পেলাম নির্ধারিত সময়ের প্রায় দেড় বছর আগেই প্রুফ রিডিং, সম্পাদনা ও ছাপার কাজ পুরোপুরি শেষ। ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই আমাদের বলতে লাগল, ছাপার কাজ যখন পুরোপুরি শেষ তখন খামোকা দেড়টি বছর কেন শুধু বসে বসে অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকা। ধন্মপদ গ্রন্থে বুদ্ধ বলেছেন, "দন্ধং হি করোতি পুঞ্ঞং, পাপস্মিং রমতি মনো।" আর বাংলায়ও একটা কথা চালু আছে: "শুভ কাজে দেরি করতে নেই।" তাই আর দেরি না করে সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের তারিখটিকে এগিয়ে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত হয়। কারণ শুভ কাজ পুণ্য কাজ যত তাড়াতাড়ি করা যায়

ততই মঙ্গল ততই শান্তি।

এবার একটু সম্পাদনার ক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা পাঠকদের জানাতে চাই।

বই লেখা, এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় বই অনুবাদ করা যতটা কঠিন অন্যের লেখা বা অন্যের অনৃদিত বইয়ের সম্পাদনার কাজও তার চেয়ে কোনো অংশে কম কঠিন কাজ নয়। একজন দক্ষ, অভিজ্ঞ ও ভালো সম্পাদক হতে হলে যেই বিষয়ের ওপর বইটি লেখা হয়েছে সেই বিষয়ের ওপর তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকতে হয়। সেই সঙ্গে বানান, ভাষা, ব্যাকরণ, সাহিত্য জ্ঞানসহ আরও অনেক কিছু সম্পর্কেও একজন ভালো সম্পাদকের জানা থাকতে হয়। সেই বিচারে আমরা যারা (বলতে গেলে সাহস করে) ত্রিপিটকের মতো বিশাল একগুচ্ছ বইয়ের সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছি তারা খুব একটা দক্ষ, অভিজ্ঞ ও ভালো সম্পাদক এমনটি দাবি করার ধৃষ্টতা আমাদের নেই। তবে সম্পাদনা পরিষদের প্রত্যেকেই কম-বেশি লেখালেখির সঙ্গে জড়িত, তাই প্রত্যেকের কম-বেশি দক্ষতা বলবো না, অভিজ্ঞতা তো কিছুটা আছেই। কাজেই সেই সামান্য অভিজ্ঞতাকে সম্বল করেই পূর্ণাঙ্গ ও সমগ্র ত্রিপিটকের মতো এত বড়ো বিশাল একটা বইয়ের সম্পাদনার কাজে যুক্ত হয়ে নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

এর আগে ত্রিপিটকের বিভিন্ন খণ্ড বিচ্ছিন্ন করে ছাপা হলেও এই প্রথম যেহেতু পূর্ণাঙ্গ ও সমগ্র ত্রিপিটক ছাপানো হচ্ছে তাই প্রথম সংস্করণ হিসেবে কিছু ভুলক্রটি থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এমনিতেই কোনো বইই সম্পূর্ণ শতভাগ ক্রটিমুক্ত করে ছাপানো কারো পক্ষেই সম্পূর্ণ শতভাগ ক্রটিমুক্ত করে ছাপানো কারো পক্ষেই সম্পূর্ণ শতভাগ ক্রটিমুক্ত করে ছাপানো কারো পক্ষেই সম্ব নয়, এটা লেখক/সম্পাদকমাত্রই ভালো করে জানেন। আমরাও এর বাইরে নয়। আমরা তো আর যান্ত্রিক রোবট নয়, আমরা হচ্ছি রক্ত-মাংসে গড়া একদম সাধারণ ক্যাটাগরির মানুষ। অতএব আমাদের ২৫ খণ্ডে সম্পাদিত পূর্ণাঙ্গ ও সমগ্র ত্রিপিটকেও খানিকটা ভুলচুক ও দুর্বলতা থাকাটা খুবি সম্ভব। তবে আমরা চেষ্টা করেছি যতটা সম্ভব নিখুঁত ও নির্ভুল বাংলা ত্রিপিটক উপহার দেওয়ার। কতটা পেরেছি তার বিচার বিজ্ঞ পাঠকরাই করবেন। সৌজন্যতা নয়, সত্য সত্যই মন থেকে বলছি,

বাংলা ভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হওয়া পূর্ণাঙ্গ ও সমগ্র ত্রিপিটকে সম্পাদনা বলেন আর প্রুফ রিডিং বলেন সবকিছুতেই ভালো কিছু হয়ে থাকলে তার কৃতিত্ব যেমন একান্তই আমাদের (সম্পাদনা পরিষদের), তেমনি অনিচ্ছাকৃত ভূলচুক কিছু হয়ে থাকলে তার দায়ভারও অবশ্যই আমাদের নিতে হবে। অবশ্য এর দায়ভার নিতেও আমাদের মনে কার্পণ্য কিছু একটা নেই। বরং হিতকামী হয়ে আমাদের কেউ যদি সেই ভুলগুলো ধরিয়ে দেন তাহলে আমরা তাকে অবশ্যই স্বাগত জানাবো। ভালো কিছুর জন্য প্রশংসা বা কৃতিত্ব আপনি আমাদের দিন বা না দিন, কিন্তু অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য তিরস্কার বা নিন্দা, আপনি যা-ই দিতে চান, আমরা তা বিনা প্রতিবাদে মাথা পেতে নিতে সব সময় প্রস্তুত। এখানে বলে রাখা ভালো যে, একান্তই হিতকামী হয়ে আপনার ধরিয়ে দেওয়া ভুলগুলো সঠিক ও যৌক্তিক মনে হলে আমরা অবশ্যই পরবর্তী সংস্করণে সেগুলো সংশোধন করবো, এই আশ্বাস আপনাকে দিতে পারি।

আমরাই যেহেতু প্রথম এরকম একটা মহান ও বিশাল একটি কাজে হাত দিয়েছি এবং বলা যায় সফলতার সঙ্গে সুসম্পন্ন করেছি, আমি অন্তত ব্যক্তিগতভাবে আশা করছি যে, আমাদের দেখে উৎসাহিত বা অনুপ্রাণিত হয়ে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের চাইতে আরও অভিজ্ঞ, দক্ষ, পণ্ডিত ব্যক্তিরা সাহস করে আরও নিখুঁত, আরও নির্ভুল বাংলা ত্রিপিটক প্রকাশ করতে এগিয়ে আসবেন।

পরিশেষে, আমি শুধু এটুকুই বলতে চাই, বাংলার ইতিহাসে এই প্রথম পূর্ণাঙ্গ ও সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশের মতো মহান এক কাজে অভাজন আমি নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছি এবং সাধ্যমতো অবদান রাখার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছি, তার জন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি এবং যারপরনাই আনন্দিত হয়েছি। আমি আবারও ভগবান তথাগত সম্যকসমুদ্ধকে, আমার উপাধ্যায় পূজ্য বনভন্তেকে এবং আমার শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু পূজ্যস্পদ ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ ভন্তেকে নতশিরে বন্দনা নিবেদন করে আমার নিবন্ধের এখানেই ইতি টানছি।

* লেখক পরিচিতি : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু, সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য, পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড), ত্রিপাসো; বহু পিটকীয় গ্রন্থের অনুবাদক; আবাসিক ভিক্ষু, রাজবন বিহার, রাঙামাটি।

ত্রিপিটক, ত্রিপাসো ও বৌদ্ধ সমাজ

শোভিত ভিক্ষু

ত্রিপিটক কী

ত্রিপিটক হলো বৌদ্ধদের মূল ধর্মীয় গ্রন্থের নাম। গৌতম বুদ্ধের ধর্ম, দর্শন ও উপদেশবাণীগুলো এই ত্রিপিটকে সংকলিত হয়েছে। পালি তি-পিটক (Tipitaka) হতে বাংলায় ত্রিপিটক শব্দের প্রচলন হয়েছে। তিনটি পিটক সমন্বিত বলেই ত্রিপিটক বলা হয়। এই তিনটি পিটক হলো বিনয়পিটক, সূত্রপিটক ও অভিধর্মপিটক। বিনয়পিটকে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের নিয়ম, শৃঙ্খলা, আচরণবিধি, অপরাধ ও দগুবিধি বিষয়ক উপদেশ রয়েছে। সূত্রপিটকে বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। অভিধর্মপিটক হলো সূত্রপিটকের পরিপূরক এবং অতিরিক্ত বিষয়ে আলোচনা; অর্থাৎ সূত্রপিটকে যে ধর্মতক্ত নিয়ে আলোচনা হয়েছে তারই বিশদ ও বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই অভিধর্মপিটকে।

বুদ্ধের ধর্ম-বিনয়কে ত্রিপিটকে রূপদান

এমন নয় যে গৌতম বুদ্ধ ত্রিপিটক নামে কোনো গ্রন্থাবলি রচনা করেছেন। আর সেই সময়ে লিখনপদ্ধতি কিংবা ছাপাখানাও ছিল না। তিনি ভিক্ষু-ভিক্ষুণী-উপাসক-উপাসিকাদের মৌখিকভাবে উপদেশ দিয়েছেন। বুদ্ধের সময় হতে স্মৃতিধর ভিক্ষুরা বুদ্ধের ধর্ম-বিনয়গুলো শুনে স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে আসছিলেন। সূত্রধরেরা সূত্রপিটক, বিনয়ধরেরা বিনয়পিটক এবং মাতিকাধরেরা অভিধর্মপিটক স্মৃতিতে সংরক্ষণ করেছিলেন। বুদ্ধের পরিনির্বাণের তিন মাস পরে রাজগৃহের বৈভার পর্বতের সপ্তপর্ণী গুহাদ্বারে অনুষ্ঠিত প্রথম মহাসঙ্গীতিতে প্রশ্নকর্তা ছিলেন মহাকশ্যপ স্থবির আর উত্তরদাতারা ছিলেন আনন্দ স্থবির ও উপালি স্থবির। যেসব বুদ্ধবচন বুদ্ধ হতে উপাধিপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ স্মৃতিমান আনন্দ স্থবির আবৃত্তি করেন তা 'ধর্ম' এবং যেসব বুদ্ধবচন বুদ্ধ হতে উপাধিপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ বিনয়ধারী উপালি স্থবির আবৃত্তি করেন

তা 'বিনয়' নামে অভিহিত হয়। তাঁরা সমস্ত বুদ্ধবচন স্মৃতিতে সংরক্ষণ করেছিলেন। বৌদ্ধ ইতিহাসে প্রত্যেকটি মহাসঙ্গীতি আয়োজনের উদ্দেশ্যই ছিল বুদ্ধবচন সঠিকভাবে সংগ্রহ করা। সঙ্গীতিগুলো বিভিন্ন বিরুদ্ধ ঘটনার প্রেক্ষিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল যা বৌদ্ধ ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর অন্যতম। তবে তৃতীয় মহাসঙ্গীতির বিশেষত্ব অন্যরকম এই কারণে যে, এতদিন যে বুদ্ধবচন ধর্ম-বিনয় নামে অভিহিত হতো, তা ত্রিপিটকে রূপদান করা হয়, অর্থাৎ বুদ্ধবচনগুলো বিনয়পিটক, সূত্রপিটক ও অভিধর্মপিটক, এই তিনটি পিটকে ভাগ করা হয়।

ত্রিপিটকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মহাপরিনির্বাণের পূর্বে বুদ্ধ আনন্দ স্থবিরকে বলেছিলেন, 'তোমাদের এরূপ মনে হতে পারে, প্রাবচন-বক্তা আর নেই, আমাদের শাস্তা আর নেই। কিন্তু আনন্দ, এই বিষয়কে সেভাবে দেখবে না। আনন্দ, আমি যে ধর্ম ও বিনয় উপদেশ দিয়েছি ও ঘোষণা করেছি, আমার দেহান্তে তা-ই তোমাদের শাস্তা।' (মহাপরিনির্বাণ সূত্র, দীর্ঘনিকায় ২য় খণ্ড, অনুবাদক: ভিক্ষু শীলভদ্র)। এই উক্তি হতেই বুঝা যায়, ত্রিপিটকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কতটুক!

একসময় পূজ্য বনভন্তে ধর্মদেশনায় বলেছিলেন, 'আমি অত্যন্ত আগ্রহসহকারে রাজবন বিহারে সম্পূর্ণ ত্রিপিটক সংগ্রহ করেছি। এই ত্রিপিটক শাস্ত্র পাঠ করে উত্তমরূপে আচরণ করলে তোমরা দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারবে, নির্বাণ লাভে সমর্থ হবে।' অন্য একসময়ে তিনি বলেছিলেন, 'যারা ত্রিপিটক পড়তে পারবে না তারা বিহারে বা বাড়িতে ত্রিপিটক বইগুলো সুন্দরভাবে সাজিয়ে শ্রদ্ধাসহকারে প্রতিদিন ধূপ, মোমবাতি ও ফুল দিয়ে পূজা করলেও বিপুল পুণ্যের অধিকারী হতে পারবে। কারণ, ত্রিপিটকের একেকটি বাণী একেকটি

বুদ্ধসৃদশ।'...

ত্রিপিটকের মূল ভাষা

গৌতম বুদ্ধ তাঁর ধর্মবাণী প্রচার ও প্রসারের জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেছেন। তা ছাড়া তাঁর কাছেও বিভিন্ন স্থান হতে লোকজন আসত। সেই সকল লোকদের বোধগম্যতার জন্য এবং বুদ্ধের ব্যবহৃত ভাষা হিসেবে সেই সময় পালি ভাষার প্রচলন ও বিকাশ ঘটে। বুদ্ধের শিষ্যরাও এই ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। যার কারণে পরবর্তীকালে মূল ত্রিপিটক পালি ভাষায় সংরক্ষিত হয়েছে।

কোন কোন ভাষায় সম্পূর্ণ ত্রিপিটক অনূদিত হয়েছে

আমার জানামতে (অবশ্য আমার জানারও ভুল থাকতে পারে) বর্তমানে সিংহলি, মায়ানমার (বর্মী), থাই, ইংরেজি, বাংলা, কম্বোডিয়ান (খমের) প্রভৃতি ভাষায় (থেরবাদীদের) সম্পূর্ণ পালি ত্রিপিটক অনুবাদ

দিয়ে বলে আসছিলেন, 'ত্রিপিটক হলো বুদ্ধের শিক্ষা-বুদ্ধের শিক্ষা-উপদেশগুলো আধার। সম্যকরূপে জানতে হলে, বুঝতে হলে ত্রিপিটকশাস্ত্র অধ্যয়ন করা একান্ত অপরিহার্য। বর্তমানে আমি সমগ্র ত্রিপিটক রাজবন বিহারে সংগ্রহ করে রেখেছি। আমি এতদঞ্চলে বুদ্ধের শাসন উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও সুরক্ষা করতে চাচ্ছি। তজ্জন্য পুরো ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার বিষয়ে জোর দিচ্ছি। ত্রিপিটকশাস্ত্র বাংলায় অনুবাদ করে সহজলভ্য করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। আমি সেটাই করতে চাচ্ছি। তাই রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেই সঙ্গে একটি শক্তিশালী অনুবাদক টিম গড়ে তুলতে হবে। বাংলা ভাষায় অনূদিত ত্রিপিটক ছাড়া এদেশে বুদ্ধের শাসন সমুজ্জল, রক্ষা করা যাবে না...' এই পরিকল্পনা যাতে বাস্তবায়ন হয়, সেজন্য তিনি ভিক্ষুসংঘকে বিভিন্ন সময় পদক্ষেপ নেওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর উপদেশ ও নির্দেশ পেয়ে ভিক্ষুসংঘ ২০০৪ সালে 'রাজবন অফসেট প্রেস' প্রতিষ্ঠা করে।

এই দিনটির একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। কারণ সুদীর্ঘ বছর পর এই প্রথম বাংলা ভাষায় একসঙ্গে পূর্ণাঙ্গ ও সমগ্র ত্রিপিটক সফলভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। অতীতে এ রকম চেষ্টা বহুবার হয়েছে, কিন্তু সফলতার মুখ দেখেনি।

করা হয়েছে। তা ছাড়া পালি ত্রিপিটক রোমান, সিংহলি, বর্মী, থাই, তিব্বতি, চাকমা, বাংলা, মালায়ালাম, তেলেগু, দেবনাগরী, গুজরাটি, গুরুমুখী প্রভৃতি স্ক্রিপ্টে বা লিপিতে সংরক্ষিত রয়েছে।

বাংলা ত্রিপিটক প্রকাশনায় রাজবন অফসেট প্রেস

বিগত ২৯ জুলাই ২০০৪, ১৩ শ্রাবণ ১৪১০, ২৫৪৮ বুদ্ধাব্দ, বৃহস্পতিবার, শুভ আষাট়া পূর্ণিমা তিথিতে পরম পূজ্য বনভন্তে আনুষ্ঠানিকভাবে 'রাজবন অফসেট প্রেস' উদ্বোধন করেন। তৎপূর্বে বহু বছর ধরেই তিনি জোর

বাংলায় ত্রিপিটক অনুবাদে পূজ্য বনভন্তের অবদান

ত্রিপিটক বঙ্গানুবাদের ব্যাপারে পূজ্য কাৰ্যক্ৰম ছিল সত্যিই চিন্তাধারা ও মহৎ ও অনুপ্রেরণাদায়ক! একসময় তিনি ধর্মদেশনায় বলেছিলেন, 'প্রথম দিকে প্রজ্ঞাবংশের মাধ্যমে ত্রিপিটক খণ্ডণ্ডলো বাংলায় অনুবাদ করার কাজ শুরু করেছিলাম। প্রজ্ঞাবংশ শ্রীলংকায় গিয়ে পালি ভাষা শিক্ষা করে এসেছে বলে অনুবাদ করতে পারছে। বাংলাদেশের এমএ পাশ ও পালি দিয়ে তা করা সম্ভব হতো না।

পরবর্তী সময়ে আমার নিকট উপসম্পদা নেয়া শিষ্যরাও ত্রিপিটক বঙ্গানুবাদ করেছে এবং করছে। তারা প্রজ্ঞাবংশের নিকট পালি শিক্ষা করে ত্রিপিটক অনুবাদ করতে সক্ষম হচ্ছে। রাজবন বিহারে যে ত্রিপিটক সংরক্ষিত রয়েছে, সবই ইংরেজিতে ও পালিতে, তাও আবার রোমান হরফে। প্রথমে সেগুলো বাংলা অক্ষরে রূপান্তরিত করা হয়েছে, তারপর পালি হতে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। আমি বিনয়পিটক, সূত্রপিটক ও অভিধর্মপিটক অর্থাৎ সম্পূর্ণ ত্রিপিটকই বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিতে চাচ্ছি, যাতে যারা নির্বাণ লাভেচ্ছু তারা এই ত্রিপিটক খণ্ডগুলো অধ্যয়ন ও গবেষণা করে, তদুক্ত উপদেশবাণী অনুশীলন করে দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারে. নির্বাণ লাভে সক্ষম হয়।' অন্য একসময়ে তিনি বলেছিলেন, 'বর্তমানে আমি সম্পূর্ণ ত্রিপিটক খণ্ডণ্ডলো রাজবন বিহারে সংগ্রহ করে দিলাম, বাংলা ভাষায় অনুবাদও হচ্ছে। এখন তোমরা ত্রিপিটক উত্তমরূপে অধ্যয়ন করে মনে-প্রাণে বৌদ্ধর্ম আচরণ ও অনুশীলন কর, দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ কর এবং এতদঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম শ্রীবদ্ধি ও উজ্জল কর।

বাংলা ত্রিপিটক প্রকাশনায় অনন্য অবদান যাদের

সত্যিই এটা অত্যন্ত অভাবনীয় যে, পুরো ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা সমাপ্ত হয়েছে; এখন মন খুলে পড়া যাবে। উপর্যুক্ত আলোচনায় এটা বুঝা গেছে যে, ত্রিপিটক বাংলায় অনূদিত হওয়ার পেছনে পরম পূজ্য বনভন্তের কার্যক্রম ও অবদান এবং ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবিরের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তা ছাড়া ১৯২৮ সালে বহুগ্রন্থ প্রণেতা, অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরও ত্রিপিটক ছাপানোর জন্য 'বৌদ্ধ মিশন প্রেস' নামে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যদিও বা সেটা বৌদ্ধপ্রধান দেশ বার্মার রেঙ্গুনে ছিল। তদুপরি তাঁর ও অন্যান্যদের বুদ্ধের শাসনদরদী চিন্তাধারা ছিল অনন্য। একথা নির্দ্ধিয়ে বলা যায় যে, ত্রিপিটক বঙ্গানুবাদে যে অনুবাদকদের এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান রয়েছে, বৌদ্ধ ইতিহাসে তাঁদের নাম সমুজ্জল হয়ে থাকবে।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ' হলো শুধু ত্রিপিটকীয় বই ছাপানোর জন্য একটি প্রকাশনা সংস্থা। মূলত পরম পূজ্য বনভন্তের শিষ্য ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত মহাস্থবির, ভদন্ত বিধুর মহাস্থবির ও ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষুর উৎসাহ-অনুপ্রেরণায় ও পরামর্শে এবং পূজ্য বনভন্তের ভক্ত সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের আন্তরিক উদ্যোগে এই প্রকাশনা সংস্থা 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ' নামে ২০১২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখে আত্মপ্রকাশ করে। এই সংস্থা সংক্ষেপে 'ত্রিপাসো' নামে অভিহিত হয়। প্রথম হতেই ত্রিপাসো-এর লক্ষ্য ছিল পরম পূজ্য বনভন্তের ইচ্ছা ও পরিকল্পনামাফিক পুরো ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে বুদ্ধশাসনের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধিতে সহায়তা করা। তাঁদের এই মহৎ প্রচেষ্টা ও কার্য নিঃসন্দেহে সাধুবাদের যোগ্য।

সম্পূর্ণ ত্রিপিটক ২৫ খণ্ডে ছাপানোর প্রকল্প

ভদন্ত জ্ঞানশান্ত ভিক্ষুর দ্বারা 'কথাবখু' বইটি ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে অনুবাদ করা সমাপ্ত হয়েছিল। অবশ্য বইটি প্রকাশিত হয়েছে তার কয়েক মাস পরে। কারণ সেই বছরে স্থবিরে উন্নীত পূজ্য বনভন্তের শিষ্যবৃন্দ ২০১৭ সালের পূজ্য বনভন্তের ৯৮তম জন্মদিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য জানুয়ারির ৮ তারিখ নির্ধারণ করেন এবং যথারীতি পূজ্য বনভন্তের জন্মদিন উপলক্ষেই রাজবন অফসেট প্রেস হতে সেটি ছাপানো হয়, যদিও বা বইটির লেখক অনলাইনে অনুবাদ সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই অক্টোবর মাসেই পিডিএফ আকারে বইটি প্রকাশ করে পাঠকদের পড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। এই বইটি অনুবাদের মধ্য দিয়েই পুরো ত্রিপিটকের বইগুলো বাংলায় অনুবাদ সমাপ্ত হয়। অবশ্য ত্রিপাসো-এর পুরো ত্রিপিটক ছাপানোর প্রকল্পের অধীনে ২০১৬ সালের ৩০ জানুয়ারি হতেই আনুষ্ঠানিকভাবে ত্রিপিটকীয় বইগুলো এক এক করে খণ্ডাকারে ছাপানো শুরু হয়েছে। তাদের পরিকল্পনা, বাংলায় অনূদিত ত্রিপিটকের ৫৯টি বইকে মোট ২৫ খণ্ডে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে রয়েল সেট আকারে ক্রমান্বয়ে ছাপানো। ইতোমধ্যেই ছাপানোর কাজ শেষ হয়ে গেছে বলে তাদের কাছ থেকে জেনেছি। আগামী ২৫ অক্টোবর ২০১৭ সালে সম্পূর্ণ ত্রিপিটক জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে গ্রাহক পড়য়াদের মাঝে বিতরণ করা হবে। এই দিনটির একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ আছে। কারণ সুদীর্ঘ বছর পর এই প্রথম বাংলা ভাষায় একসঙ্গে পূর্ণাঙ্গ ও সমগ্র ত্রিপিটক সফলভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। অতীতে এ রকম চেষ্টা বহুবার হয়েছে. কিন্তু

সফলতার মুখ দেখেনি।

ত্রিপিটক ছাপানোর মূল উদ্দেশ্য এবং বর্তমান বৌদ্ধ সমাজ

খুব সহজভাবে বলতে গেলে, ত্রিপিটকীয় বই অনুবাদ করা, ছাপানো... এসবের উদ্দেশ্য হলো ত্রিপিটক বা বৃদ্ধবচনের প্রচার ও প্রসার ঘটানো এবং এরই আলোকে উত্তম জীবন গঠন করা, দুঃখমুক্তি নির্বাণমার্গ অনুসর্বণ করা এবং বৃদ্ধশাসনের শ্রীবৃদ্ধি করা।

বর্তমানে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা কেমন, তা আপনারা সবাই কমবেশি জানেন এবং এই বিষয়ে এখানে বিশেষ আলোচনা করার কোনো ইচ্ছাই আমার নেই। শুধু এটুকুই বলব, এই বঙ্গদেশে থেরবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা পরম শ্রদ্ধেয় সারমেধ মহাস্থবির হতে শুরু করে পূজনীয় অর্হৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) পর্যন্ত এবং এই সময়েও যেসব শ্রদ্ধাভাজন ভিক্ষুরা এবং সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকারা বুদ্ধের ধর্মের শ্রীবৃদ্ধি ও রক্ষার জন্য অবদান রেখে গেছেন ও রাখছেন, তা এক কথায় অতুলনীয়। এদেশের বৌদ্ধদের ধর্মীয় ক্ষেত্রে কিছু চমৎকার ও অনুসরণীয় কাজ প্রতিনিয়তই হয়ে চলেছে। তদুপরি এখনো এদেশের বৌদ্ধসমাজে পূর্বের অনেক দোষণীয় মিথ্যাদৃষ্টি ও অপসংস্কৃতিমূলক কার্যক্রম রয়েই গেছে এবং কিছু নতুন বিশেষ দোষণীয় মিথ্যাদৃষ্টি ও অপসংস্কৃতিমূলক কার্যক্রম দেখা যাচ্ছে। এটা অবশ্যই বুদ্ধের শাসন অনুরাগীদের কাছে হতাশাজনক।

আমি একটা কথা অনেককে প্রায়ই বলি যে, ভক্তিবাদ আমাদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে অনেক ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সৃষ্টি করছে। ভক্তি হলো

অন্ধবিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা হলো যুক্তিযুক্ত বিশ্বাস।

আপাতদৃষ্টিতে ভক্তি নিয়ে মাথাব্যথা হওয়ার কথা নয়,

কিন্তু ভক্তিবশে যখন অন্ধভাবে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে,

সামাজিকভাবে, ধর্মীয়ভাবে বিভিন্ন ভুল কার্যক্রম করে

থাকে তখন তা নিজের ও অপরের জন্য অকল্যাণ সৃষ্টি

করে। তাই আমি বলি যে, ভক্ত নয়, শ্রদ্ধাবান হও।

আন্দাজে নয়, অন্ধবিশ্বাসে নয়, জেনে-বুঝে সম্যক

উপলব্ধির মাধ্যমে সব কাজ সম্পাদন করা উচিত।

তাহলেই নিজের, অপরের ও বুদ্ধশাসনের উপকার হবে।

এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে হিংসা, বিদ্বেষ ও হানাহানির প্রকোপ অতিমাত্রায় বেড়ে গেছে। দোষযুক্ত কর্মই বেশি সম্পাদিত হচ্ছে। নির্দোষ কর্ম সম্পাদনকারীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এতকিছুর মাঝেও জীবন থেমে থাকার নয়। এটা তো জানা যে, জ্ঞানযুক্ত জীবনই উত্তম ও আকাঙ্ক্ষিত এবং বুদ্ধের মৈত্রীবাণীই পারে মানুষে মানুষে সুখের মেলবন্ধন সৃষ্টি করতে। তাই মৈত্রীবাণী শুধু মুখেই নয়, কাগজে-কলমে নয়, বিশ্বের সকল মানুষ তার নিজের জীবনেই আচরণ ও অনুশীলন করুক। এটা একান্তভাবেই আশা করি যে, ত্রিপিটক ছাপানো শুধু ছাপানোতেই ও শোকেসের সৌন্দর্য বর্ধনে সীমাবদ্ধ না হোক, পূজ্য বনভন্তের ইচ্ছা এবং ত্রিপাসো-এর লক্ষ্য যেন একবিন্দুতেই মিলিত হয়, অর্থাৎ উত্তম জীবন গঠনে, দুঃখমুক্তিতে ও বুদ্ধশাসনের শ্রীবৃদ্ধিতে যেন পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকের এই প্রকাশনা ভূমিকা রাখে। ■

তারিখ: ১২ জুন ২০১৭, সোমবার

* **লেখক পরিচিতি : শো**ভিত ভিক্ষু, শান্তিগিরি বন ভাবনা কেন্দ্র, রাঙ্গাপানিছড়া, খাগড়াছড়ি।

প্রজ্ঞারত্ন ভাণ্ডার : বলো কোথা পাবো তারে?

শ্রীমৎ সানু কীর্তি ভিক্ষু

(٤)

তখন সবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি—এ যেন এক নতুন জগৎ, এ যেন কল্পনার রং ছড়ানোর বিস্তীর্ণ ক্যানভাস, এ যেন সম্ভাবনার অবারিত খোলা দ্বার। হাসি-আনন্দমাখা যুক্তি-তর্কের আড্ডাখানা। সাহিত্য থেকে সমাজনীতি, ধর্ম থেকে বিজ্ঞান—কোনো প্রসঙ্গই বাকি থাকে না, আমরা প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে যেতাম। প্রত্যেকেই পক্ষে-বিপক্ষে নানা মতামত দিতাম, কখনো জিততাম কখনো হারতাম এবং এভাবেই আমাদের জানার পরিধিটা ঋদ্ধ করতাম। কিন্তু লজ্জার ব্যাপার হলো তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব নিয়ে যখন আমরা কথা বলতাম, বিশেষ করে বুদ্ধধর্ম নিয়ে তখন আমাকে প্রায় সময়ই হারতে হতো কিংবা অপারগতা প্রকাশ করতে হতো। কেন? কারণ আমি নিজেই আমার ধর্ম সম্পর্কে জানি না, ধর্মীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার মতো ন্যুনতম জ্ঞানও আমার নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের আগ পর্যন্ত ১২ বছরের শিক্ষাজীবনে আমি সেভাবে ধর্মীয় বই পডিনি। ধর্মীয় বই পড়া বলতে কেবল কখনো কখনো মা-বাবা ধর্মীয় বই কিনে আনলে কিংবা কোনো ভন্তে দিলে সেই বইয়ের ভূমিকায় একটু চোখ বুলানো আর দুয়েক পৃষ্ঠা নিয়ম রক্ষার্থে রিডিং পড়ে যাওয়া। অন্যদিকে ধর্মীয় জ্ঞানের পরিধি ছিল কেবল এটুকুই— পঞ্চশীলের পাঁচটা শীলের নাম, সকল প্রাণী সুখী হোক, নির্বাণ গেলে আর জন্ম নিতে হয় না, বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থের নাম ত্রিপিটক... এরকম কয়েকটা মুখস্ত বুলি আওড়ানো। অথচ অন্য ধর্মাবলম্বী বন্ধুরা (হিন্দু হোক আর মুসলিম হোক) যখন তাদের নিজস্ব ধর্ম নিয়ে কথা উঠতো তখন তারা তাদের ধর্মের স্বপক্ষে নানা যুক্তি প্রদর্শন করতো। ভার্সিটিতে আসার আগ পর্যন্ত কখনো এমন অভিজ্ঞতা তথা প্রশ্নের সম্মুখীন হইনি। কারণ তখন নিজের শহরে, নিজস্ব পরিবেশে ধর্ম নিয়ে কেউ কখনো কোনো প্রশ্ন তুলেনি। আমার মনে হয়, এটা

কেবল আমার একার নয়; বরং পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে যাদের পড়াশোনা কিংবা কাজের জন্য থাকতে হয় প্রায় সবারই এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে, এখনো হচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও এ থেকে নিস্তার নেই।

(২

এখন ভত্তে হওয়ার পরও সে সমস্যাটা মিটে যায়নি। বরং এখন আরও বেশি গভীর হয়েছে। ভিক্ষু হওয়ার পর প্রথম প্রথম মনে হতো, উপাসক-উপাসিকাদের বোঝানো খুব সহজ। ভিক্ষুজীবনে দেশনা দেয়া বা মানুষকে পরামর্শ দেওয়া তেমন কঠিন নয়, কেবল মুখের জড়তা কাটাতে পারলেই হলো। কিন্তু সময় যত গড়াতে লাগলো, প্রব্জ্যাজীবন যত দীর্ঘ হচ্ছে তত অপারগতার মায়াজালে যেন আষ্টেপুষ্ঠে আটকে যাচ্ছি। কারণ প্রতিনিয়ত নানা ধর্মীয় বিষয় নিয়ে মানুষজনের সঙ্গে আলাপ করতে হয়। কখনো বাইরে পড়াশোনা করা ছাত্রছাত্রীরা প্রশ্ন করে, কখনো উপাসক-উপাসিকারা প্রশ্ন করে। সবক্ষেত্রেই যে তাদের সদুত্তর দিতে পারি ব্যাপারটা তেমন নয়। কারণ কখনো কখনো এমন এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যে, হয়তো সে প্রশ্নুটার উত্তর আমি নিজেও খুঁজছি। আবার কখনো কখনো দেশনা দিতে গেলে মূল বিষয়টি নিজের কাছে পরিষ্কার ধারণা না থাকায় পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করতে না পারা যায় না, যার দরুন উপস্থিত শ্রোতাদের সন্দেহ পুরোপুরি দূর করা সম্ভব হয় না। জাগতিক বিষয় নিয়ে যত সহজে অন্যজনকে বোঝানো যায়, বুদ্ধধর্মের অন্তর্নিহিত বিষয় সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা তত বেশি কঠিন। যেখানে অন্যান্য ধর্মে জাগতিকতাই প্রধান, সেখানে বুদ্ধধর্মের মূল নিহিত রয়েছে মন-চিত্তকে নির্ভর করে। এখানে কেবল বাইরের প্রলেপমাত্র। ত্রিপিটকের ওপর দখল না থাকলে নিজেকে বোঝানো যেমন কষ্টসাধ্য তেমনি অন্যদের বোঝানোর আশাও মাকাল ফলসদৃশ। এভাবে ভিক্ষুজীবনের আট বছরে

পেরিয়ে নিজের অক্ষমতায় কেবল নিজে নিজে দংশিত হয়ে, হদয়ে রক্তক্ষরণে ব্যথিত হয়ে সময় কেটে যাচছে। এই যে দ্বিধা-সংশয়-অপারগতা তার মূলে হচ্ছে জ্ঞানসমুদ্রের তীরে এখনো আমি ইতঃস্থৃত করে হাঁটছি। উপযোগী পরিবেশ, পর্যাপ্ত আনুষঙ্গিক উপাদান না থাকা, সেই সঙ্গে সামগ্রিক মানসিক টানাপোড়নে শক্ত হওয়ার আগেই বারবার হোঁচট খেয়ে মুঠি যেন আগলা হয়ে যাচছে।

(0)

আমরা যারা টুকটাক লেখালেখি করার চেষ্টা করি, বিশেষ করে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে তাদেরও প্রায় সময় নানা সমস্যায় পড়তে হয়। কারণ আমি যে বিষয়টি নিয়ে লেখার চেষ্টা করছি সে বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ना थाकल পুরো বিষয়টাই ধোঁয়াশার মধ্যে থাকবে। ফলে বিজ্ঞ পাঠকমাত্রই লেখার দুর্বলতা ধরতে পারবে। ধর্মীয় বিষয় নিয়ে লিখতে গেলে অবশ্যই সেই ধর্মের মূল গ্রন্থগুলো পড়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। এখন সমস্যা হলো মূল ত্রিপিটকটি পালি ভাষায় এবং এখনো সবগুলো খণ্ডের বঙ্গানুবাদ হয়নি। অন্যদিকে আমাদের বেশিরভাগেরই রয়েছে পালি ভাষায় দুর্বলতা। তা ছাড়া যেগুলো অনুদিত হয়েছে সেগুলোর সবগুলোও হয়তো নিজস্ব সংগ্রহে নেই। একদিকে পালিতে দুর্বলতা অন্যদিকে সবগুলো অনূদিত বই হাতের কাছে না থাকা—এ দুই বাধা ছাড়াও আরও কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। যেমন, কেবল বঙ্গানুবাদ থাকলেই সেই গভীর-গম্ভীর ধর্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা সহজসাধ্য নয়। এর জন্য অবশ্যই অর্থকথা পড়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। যেখানে মূল ত্রিপিটক খণ্ডগুলোই বঙ্গানুবাদ হয়নি সেখানে অর্থকথার বঙ্গানুবাদ প্রাপ্তি এখনো অনেক দূরের পথ। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই আমাদেরকে নানা জায়গায় হোঁচট খেতে হয়। আবার, ইংরেজিতেও আমরা দুর্বল। ত্রিপিটকের সবগুলো বই পালি থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে। যদিও কোনো কোনো জায়গায় ইংরেজিতেও অনেক সময় মূলভাবটি হয়তো ফুটে ওঠেনি, তবুও ইংরেজিতে দখল থাকলে আমাদের কাজ অনেকাংশেই সহজ হয়ে যেতো। অন্যদিকে, অতীতে বাংলায় প্রকাশিত অধিকাংশ বইয়ের লেখক হিন্দু ধর্মাবলম্বী। ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের লেখায় হিন্দুধর্ম ঘেঁষা অনেক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যেটা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে মৌলিক বুদ্ধধর্মের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

এমনকি বৌদ্ধদের দ্বারা লিখিত অনেক বইয়েও কিছু কিছু গড়মিল দেখা যায়। কারণ তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত অনেক সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতিতে হিন্দুধর্মীয় আচার প্রচলিত ছিল। ফলে তারা বৌদ্ধ হলেও স্বাভাবিক নিয়মে হিন্দুধর্মের দ্বারা অনেকাংশ প্রভাবিত ছিল। এজন্য দেখা যায় একই বিষয় বিভিন্ন বইয়ে বিভিন্ন রকমভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর মধ্য থেকে সঠিক উত্তরটি বের করা এত বেশি কঠিন যে এটাকে খড়ের গাদায় সুঁই খোঁজার সঙ্গে তুলনা করা যায়। এভাবে ধর্ম নিয়ে গবেষণা, পঠন, আলোচনাতেও আমাদের নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়।

(8)

বুদ্ধ তাঁর আবিষ্কৃত নির্বাণমার্গের ধর্ম প্রচার করার পর ২৫৬১ বছর চলে গেছে। এত এত লম্বা সময় বয়ে যাওয়ার পরও কেন আমাদের মাঝে এখনো বাংলায় অনূদিত পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক নেই? এই দীর্ঘ সময়ে কোথায় ছিল আমাদের অবস্থান? এর উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের চলে যেতে হবে সেই ২৫৬১ বছর আগের জীবস্ত বুদ্ধের কাছে। চলুন, টাইম ট্রাভেলে করে আপনাদের নিয়ে যায় সেখানে—

সমোধিজ্ঞান লাভের পর বুদ্ধ জগতে দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায় আছে—এ চারটি আর্যসত্য সম্যকরূপে উপলব্ধি করার পর দুঃখ হতে দুঃখমুক্তি লাভের পুরো প্রক্রিয়াটি প্রথম দেশনা করেন পঞ্চবর্গীয় শিষ্য—কৌণ্ডিণ্য, ভদ্দীয়, বপ্প, মহানাম ও অশ্বজিতের কাছে এবং এ দেশনার মধ্য দিয়েই বুদ্ধের ধর্মচক্রটি ঘুরতে শুরু করে যা এখনো চলমান। এই ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্রোপদেশ প্রদানের কিছুকাল পরে উপরিউক্ত পাঁচজনই বুদ্ধের লব্ধ জ্ঞান পরিপূর্ণরূপে জ্ঞাত হন এবং বুদ্ধের প্রব্রজিত শিষ্য হন। এভাবেই মানব-ইতিহাসের প্রথম ভিক্ষুসংঘ সৃষ্টি হয়। তৎপরবর্তীকালে যশ নামক এক ধনাত্য শ্রেষ্ঠীপুত্রও বুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং সুব্যাখ্যাত ধর্ম মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে অর্হত্তমার্গফলে অধিষ্ঠিত হন। তাকে দেখে তার গৃহী অন্তরঙ্গ চারজন বন্ধু—বিমল, সুবাহু, পূর্ণজিৎ ও গবস্পতিও ব্রহ্মচর্য জীবনে আগ্রহবোধ করেন এবং অচিরেই নির্বাণজ্ঞান লাভ করেন। তাদের দেখাদেখি তাদের অন্যান্য পঞ্চাশজন বন্ধুও ধর্মজ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। তখন পর্যন্ত পৃথিবীতে কেবল ৬১ (একষট্টি) জন অর্হৎ ছিলেন (বুদ্ধসহ)। এভাবেই

বর্ষাবাস কেটে গেলো বারাণসীতে। বর্ষাবাস শেষে বুদ্ধ
তখন তার একষট্টি জন শিষ্যকে ডেকে বলেন, "চরথ
ভিক্থবে চারিকং বহুজন হিতায বহুজন সুখায,
লোকানুকম্পায অথায হিতায সুখায দেবমনুস্সানং
দেসেথ ভিক্থবে ধম্মং আি কল্যাণং মজ্বেকল্যাণং
পরিযোসানকল্যাণং সাখং সব্যঞ্জনং কেবল পরিপুণ্নং
পরিসুদ্ধং ব্রহ্মচরিয়ং পকাসেথ"—অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ,
বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, জগতের
প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্য, দেবতা ও মনুষ্যগণের
অর্থ-হিত-সুখের জন্য দিকে দিকে বিচরণ করে
ধর্মদেশনা করো—যার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ ও
পর্যবসানে বা অন্তে কল্যাণ; এবং যার মাধ্যমে অর্থযুক্ত,
ব্যঞ্জনযুক্ত, সমগ্র পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত
হয়।

একটি খণ্ড 'বিনয়পিটকে' লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সেগুলো কিন্তু হঠাৎ করে বা এক দিন-দুদিনে আদিষ্ট হয়নি। বলতে গেলে বুদ্ধত্ব লাভের পর থেকে পরিনির্বাণ পর্যন্ত দীর্ঘ ৪৫ বছরের জীবনজুড়ে তাঁকে এ দিকনির্দেশনাগুলো দিয়ে যেতে হয়েছে। এই বিধিনিষেধগুলোকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মূলত দুটি কারণে এগুলো প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছিল; যথা : ১) সামাজিক কারণে ও ২) ভিক্ষুসংঘের অভ্যন্তরীণ কারণে।

১. সামাজিক কারণ : বুদ্ধের অনেক উপদেশের মধ্যে একটা সময়োপযোগী, আধুনিক চিন্তাধারার উপদেশ হলো দেশ-কাল-পাত্র ভেদে চলা। তাই তৎকালীন সমাজব্যবস্থা এবং সেই এলাকার অবস্থানুযায়ী যে কাজগুলো সাধারণ মানুষজনের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে, দৃষ্টিকটু হয়, বিঘ্নু ঘটায়, এমনকি পরিবেশের জন্য

কিন্তু লজ্জার ব্যাপার হলো তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব নিয়ে যখন আমরা কথা বলতাম, বিশেষ করে বুদ্ধধর্ম নিয়ে তখন আমাকে প্রায় সময়ই হারতে হতো কিংবা অপারগতা প্রকাশ করতে হতো। কেন? কারণ আমি নিজেই আমার ধর্ম সম্পর্কে জানি না, ধর্মীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার মতো ন্যুনতম জ্ঞানও আমার নেই।

বুদ্ধের নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে সেই যে শুরু হলো নির্বাণপ্রদায়ী ধর্মযাত্রার, নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে আজও তা চলমান। বুদ্ধধর্ম আজ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে আসতে তাকে পাড়ি দিতে হয়েছে অনেক বন্ধুর পথ যা শুধু কন্টকাকীর্ণই নয়, একই সঙ্গে পিচ্ছিল ও কাদাভরা ছিল। এ সমস্যা যে বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর শুরু হয়েছে তা কিন্তু নয়; বরং বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই এটা শুরু হয়েছে তা কিন্তু নয়; বরং বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই এটা শুরু হয়েছিল, যদিও তখন সেসব সমস্যাগুলো ততটা বৃহৎ আকারে ফুলে ফেঁপে উঠতে পারেনি। কারণ বুদ্ধ সেগুলো আপন প্রজ্ঞাবোধ ও বুদ্ধিমন্তায় সমাধান টেনে দিয়েছিলেন। ভিক্ষুসংঘের সদস্য সংখ্যা যতবেশি বৃদ্ধি পেয়েছে ধীরে ধীরে ততবেশি সমস্যার আকর সৃষ্টি হয়েছে। ত্রিপিটকের ইতিহাসের আলোকে দেখা যায়, নানা সমস্যার আলোকে বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে যে সমস্ত বিধিনিষেধগুলো প্রজ্ঞাপ্ত করেছিলেন সেগুলো ত্রিপিটকের

ক্ষতিকর হয় এবং সর্বোপরি যেগুলো সঠিক নয় সেগুলো করতে তিনি নিষেধ করেন। এই কাজগুলোকে আবার তিনি লঘু, মধ্যম ও মহা অপরাধ হিসেবে তিনভাগে ভাগ করেন।

২. ভিক্ষুসংঘের অভ্যন্তরীণ কারণ: তৎকালীন সময়ে ভিক্ষুসংঘ থাকতো সাধারণত লোকালয় থেকে একটু দূরে অরণ্যবেষ্টিত স্থানে যেখানে গ্রাম-নগরের কোলাহল, হই-হউগোল পৌঁছাত না। তো এমন নির্জন পরিবেশেও ভিক্ষুসংঘের মধ্যে নানা বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিত যেগুলো নিয়ে গৃহীসমাজের উদ্বেগ হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। কখনো ধ্যান-সমাধি বিষয়ে, কখনো আচরণজনিত কারণে, কখনো বা সন্দেহবশে নানা সমস্যা সৃষ্টি হতো। তখন বুদ্ধ সেসব জটিলতা সমাধানকল্পে নানা বিধিনিষেধ আরোপ করতেন সেগুলোই এখন ভিক্ষুসংঘের বিনয়-বিধান। ভিক্ষুসংঘের

অভ্যন্তরীণ কারণে উদ্ভূত সমস্যাগুলোও তিনি উক্ত তিন শ্রোণিতে বিভক্ত করেন।

এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, তার বিধিনিষেধ আরোপের পেছনে তিনি যে বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রেখে সমাধান দিতেন তার মধ্যে অন্যতম দুটি কারণ হচ্ছে: (১) নির্বাণমার্গপথে সেগুলো অন্তরায় করছে কিনা এবং (২) যে কাজগুলো না করলেও চলে, না করলেও কোনো ক্ষতি হয় না, বরং উপকার হয়।

এতদুসত্ত্বেও দেখা যেতো, কোনো কোনো সাধারণ ভিক্ষু তার সেসব আদেশ মানতেন না। ফলে ভিক্ষুসংঘের মধ্যে নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতো। শৌচাগার বিষয়ে সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে দুজন ভিক্ষুর মতপার্থক্যের জের ধরে যখন ভিক্ষুসংঘের মধ্যে পক্ষে-বিপক্ষে বিভেদ দেখা দিল, তখন বুদ্ধ এর সমাধান দিলেন। তবুও তারা বুদ্ধের এ আদেশকে অগ্রাহ্য করার কারণে বুদ্ধ ৯ম বর্ষাবাসটি পারিলেয়্য বনে যাপন করেন যেটা এখন 'মধু পূর্ণিমা' নামে খ্যাত। এ ছাড়া ষড়বর্গীয় ভিক্ষুর নাম উল্লেখ না করলেই নয়, যারা প্রায়ই নানা সমস্যা সৃষ্টি করতো। অন্যদিকে, দেবদত্তের কথা তো কারোর অজানা নয়। তিনি বুদ্ধের নিয়মকে প্রশ্নবিদ্ধ করে আলাদা কিছু নিয়ম বাধ্যতামূলক করতে চেয়েছেন, ভিক্ষুসংঘকে ভাগ করে সংঘভেদ নামক মহাপাপ কার্য করেছেন, এমনকি বুদ্ধকে প্রাণে মারার জন্যও বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেন। এভাবে বুদ্ধের জীবদ্দশায় যে বিভেদের রেশ দেখা গিয়েছিল তা কিন্তু সেখানে থেমে থাকেনি; বরং বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরপরই এই অশুভশক্তি দিন দিন বিকশিত হয়েছে। এর প্রমাণ পাই, বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরে সকলে যখন দুঃখে ভারাক্রান্ত তখন 'সুভদ্ৰ' নামক এক মহামূৰ্খ ভিক্ষু খুশিতে আত্মহারা হয়ে উচ্ছসিত হয়ে বলেন, "শ্রমণ গৌতম পরিনির্বাণ লাভ করে ভাল হয়েছে। তিনি বেঁচে থাকাকালীন কেবল নানা বিধিনিষেধ আরোপ করতেন। এখন আর আমাদেরকে বাধা দেয়ার কেউ রইল না. এখন আমরা যথাইচছা স্বাধীনভাবে চলতে-ফিরতে পারবো।" সুভদ্র যে অজ্ঞতাসুলভ আস্ফালন করেছিলেন সেই হুংকার কিন্তু এখনো তার বংশধরেরা করেই যাচেছ। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই বুদ্ধের পরিনির্বাণোত্তর কালে সংঘের ভাঙ্ক, খণ্ড থেকে খণ্ডিত হয়ে কেবল নানা বাদ ও মতের জন্ম হয়েছে।

পরিনির্বাণের পূর্বে বুদ্ধ আনন্দ ভন্তেকে বলে যান যে,

সংঘ ইচ্ছা করলে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র বিনয়গুলো পরিবর্তন বা বাদ দিতে পারবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মানসিক চাপে থাকা আনন্দ ভত্তে তখন সেই ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র বিনয়গুলো কী কী তা জিজ্ঞেস করতে ভূলে যান। বুদ্ধের পরিনির্বাণের মাত্র তিন মাসের মাথায় যখন মহাকাশ্যপ ভন্তের আহবানে ৫০০ অর্হৎ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে ধর্মসম্মেলন হয় তখন আনন্দ ভন্তের সেই কথার সূত্র ধরে সেই সম্মেলনেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উপক্রম হয়েছিল। কারণ সেই ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র বিনয়গুলো কী কী তা কেউই নির্ণয় করতে পারছিলেন না। তবুও শেষ রক্ষা হয় মহাকশ্যপ ভন্তের সঠিক মন্তব্যে যেখানে তিনি বলেন, যেহেতু এসব বিনয় আমাদের উপকারার্থে. নির্বাণমার্গপথে প্রযোজ্য বিধায় বুদ্ধ আমাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই আমরা সবগুলো পালন করবো। তখন উপস্থিত সকল ভিক্ষুসংঘ তা মেনে নেয়। এভাবেই সংঘ কর্তৃক বুদ্ধের প্রজ্ঞাপ্ত সকল বিধিনিষেধ মানতে সকলে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। তখন সবাই মৌখিকভাবে মেনে নিলেও কেউ সেগুলো লিখে রাখার চিন্তা করেননি বা তখন লেখার প্রচলন সেভাবে গড়ে ওঠেনি।

ফলে স্বাভাবিক নিয়মে মাত্র ১০০ বছরেই সেই নিয়মগুলো শিথিল করা শুরু করলো কিছু কিছু ভিক্ষু। তখন যশ নামক এক পণ্ডিত ভিক্ষুর তৎপরতায় সেটাও আপাতদৃষ্টিতে স্তিমিত করা হয়। কিন্তু ভেতরে ভেতরে এর রেশ থেমে থাকেনি। কারণ এর ১৫০ বছর পরে স্ম্রাট অশোকের আবির্ভাব এবং ঐতিহাসিকদের মতে, তার আমলেই বুদ্ধধর্মাবলম্বীরা ২০টি (মতান্তরে ১৮টি) সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। সেজন্য বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে পরিশুদ্ধ করতে তিনি ষাট হাজার (৬০,০০০) ভিক্ষুকে সংঘ থেকে বের করে দেন। এখন প্রশ্ন হলো, এই ষাট হাজার ভিক্ষু কোথেকে আসলো? সম্রাট অশোকের বুদ্ধধর্মের প্রতি আনুগত্য ও পৃষ্ঠপোষকতা দেখে অনেক ভিন্ন ধর্মাবলম্বী নকল ভিক্ষু সেজেছিলেন—এটা যেমন সত্যি, তেমনি এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে. বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর হতে ২৫০ বছরে ধীরে ধীরে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি অশোক কর্তৃক বৌদ্ধ সংঘ হতে বিতারিত হলেও তারা কিন্তু এটা মন থেকে স্বীকার করেনি। তাদের গোপন তৎপরতা তারা চালিয়ে গেছে। যদিও সম্রাট অশোক বুদ্ধধর্ম বিশুদ্ধি, সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসারার্থে ৩য় ধর্মসঙ্গীতির আয়োজন করেন, চুরাশি হাজার ধাতুচৈত্য স্থাপন করেন এবং দেশ-বিদেশে দক্ষ দক্ষ ভিক্ষু পাঠিয়ে বুদ্ধধর্মের আলো ছডিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তিনিও ধর্মসম্মেলনের বিষয়গুলো লিখে রাখার ব্যবস্থা করেননি। যদিও ধারণা করা হয়, পরবর্তী সময়ে সিংহল দ্বীপে তামুপাতায় লিখিত ত্রিপিটকের আদিরূপ সম্রাট অশোকের ৩য় সম্মেলন। সেই সম্মেলনে আলোচিত বুদ্ধবাণীগুলো লিখে না রাখার দরুন মৌর্যবংশের সমাপ্তি অর্থাৎ সম্রাট অশোকের নাতি বৃহদ্রথের পরাজয়ের পর হতে ভারতবর্ষে মৌলিক বুদ্ধধর্মের আলো ক্ষীণ হতে থাকে। একদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজন্যবর্গের আগ্রাসন, অন্যদিকে বিনয়নীতি শিথিলপন্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি সব মিলিয়ে এ সময়টা সত্যিই বুদ্ধধর্মের জন্য যেন তমসাচ্ছন্নতায় ভরা। কথিত আছে, এ সময় তৎকালীন রাজা পুষ্যমিত্র মগধ থেকে অধুনা পাঞ্জাবের অন্তর্গত জলন্ধর পর্যন্ত প্রচণ্ড বৌদ্ধ নিপীড়ন, নির্যাতন চালিয়েছিলেন, বোধিবৃক্ষের মূলোৎপাটনের চেষ্টা করেছিলেন, অশোকের অনেক শিলালিপি ধ্বংস করেছিলেন। এতদসত্ত্বেও নানা বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে তখনো বুদ্ধধর্ম হারিয়ে যায়নি ভারতবর্ষ থেকে। এরপর আসে কুষাণ যুগ। কুষাণ যুগের আগ পর্যন্ত চারটি প্রধান বৌদ্ধ সম্প্রদায় পাওয়া যায়।

- ১. সর্বান্তিবাদী বা বৈভাসিক সম্প্রদায় : অভিধর্মপিটককেই এরা গুরুত্ব দিতো এবং বিনয় ও সূত্রপিটককে তারা প্রযোজ্য মনে করতেন না। সেজন্য অভিধর্ম বিষয়ে তারা নানা গবেষণা ও বিশ্লেষণমূলক টীকা, অর্থকথা প্রণয়ন করেন। এই টীকাগুলোকে 'বিভাস' বলা হতো। এজন্যই এ সম্প্রদায়কে বৈভাসিক নামে ডাকা হতো। তাদের প্রধান আচার্য ছিলেন কাত্যায়নীপুত্র। এ সম্প্রদায়ের প্রবক্তাগণের মধ্যে বসুমিত্র, ঘোষক, বুদ্ধদেব, ধর্মত্রাত, ভদন্ত, সংঘভদ্র, দীপকারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
- ২. সৌতান্ত্রিক সম্প্রদায় : সর্বান্তিবাদীদের পরে এদের উদ্ভব হয়। এরা অভিধর্মকে মানলেও সর্বান্তিবাদীদের রচিত টীকাগুলো স্বীকার করতেন না। তাদের মতে, বুদ্ধের ধর্মকে জানতে হলে বুঝতে হলে বুদ্ধের মুখনিঃসৃত সূত্রগুলোর ওপরই পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করতে হবে। সূত্রের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে তাদেরকে 'সৌতান্ত্রিক' বলে আখ্যায়িত করা হতো। আচার্য কুমারবর্ত (বা কুমারলয়) এবং তার শিষ্য হরিবর্মণ এই মতবাদ প্রচার করেন। বিনয় ও সূত্রে এদের অগাধ বিশ্বাস ছিল। মূলত এরাই সম্রাট

অশোকের সময় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল এবং অশোক কর্তৃক বিভিন্ন দেশে বুদ্ধধর্ম প্রচার করতে গিয়েছিলেন। এ সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য প্রবক্তাগণ হলো বসুবন্ধু, যশোমিত্র, পরমার্থ, স্থিরমতি।

- ৩. মাধ্যমিক বা শুন্যবাদ সম্প্রদায় : মাধ্যমিক প্রবক্তা আচার্য নাগার্জুন। তিনি শূন্যতাবাদের প্রতীত্যসমুৎপাদকেই শূন্যতা বলেছেন। অর্থাৎ কর্ম ও কর্তা ছাড়া কোনো কিছুই সম্পাদিত হতে পারে না। তাই কর্ম ও কর্তা উভয়েই নিজেদের কার্যসিদ্ধির জন্য পরস্পর-সাপেক্ষ। সেজন্য অস্তিত্বমাত্রই সাপেক্ষ. নিরপেক্ষ নয়। এটাই শূন্যতাবাদ। তাদের মতে, জগতের জড়-অজড় ধর্মগুলোর স্বভাব বলে কিছুই নেই। এদের উৎপত্তি নিজেদের দারাও হয় না. অন্যের দারাও হয় না কিংবা উভয়ের সংযোগেও হয় না। আবার এরা অহেতুকও নয়। এরা কেবল কার্যকারণের বিচ্ছিন্ন প্রবাহ। যদি সেসব জড়-অজড় ধর্মগুলোর সত্যিকার অর্থে স্বকীয় স্বভাব বলে কিছু থাকে তাহলে হেতু-প্রত্যয় না থাকলেও সেই স্বভাব থাকার কথা। যার স্বভাবই নেই তার নিরোধের প্রশ্ন অবান্তর। এটাই শূন্যতাবাদের মূল কথা। নাগার্জুন মাধ্যমিক-কারিকা রচনা করেন বলে এ সম্প্রদায়ের নাম মাধ্যমিক হয়। তারা মধ্যম পস্থাকেই তাদের প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করেন। যদিও বুদ্ধের উপদিষ্ট মধ্যম পন্থার সঙ্গে তাদেরটি সম্পূর্ণই ভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে মাধ্যমিকের এই শূন্যতাবাদ এতই বিভ্রান্তিকর যে, সাধারণের পক্ষে তা উপলব্ধি করা ছিল অত্যন্ত দুরূহ এবং এই 'শূন্যতা'কে কোনো প্রতিশব্দ দিয়ে বুঝিয়ে বলা किंग। এ সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য প্রবক্তাগণ হলো আর্যদেব, রাহুলভদ্র, বুদ্ধপালিত, ভব্য, চন্দ্রকীর্তি, জ্ঞানপ্রভ, শান্তিদেব।
- 8. যোগাচারী সম্প্রদায় : নাগার্জুন ও আর্যদেব রচিত গ্রন্থগুলোর সার সংকলন করে তাদের মতবাদকে আরও শ্রীবৃদ্ধি ও প্রগতিশীল করার মানসে আচার্য মৈত্রেয়নাথ একটি নতুন গ্রন্থ সংকলন করেন। কিন্তু সেগুলো এত সংক্ষিপ্ত ছিল যে, সাধারণের পক্ষে কিছুই বোধগম্য হতো না। তাই পরবর্তীতে তার শিষ্য আচার্য অসঙ্গ এটাকে সাধারণের উপযোগী করে বিভিন্ন ব্যাখ্যা-উপমাসহকারে শাস্ত্র রচনা করেন। তিনি এর নাম দিলেন 'যোগাচার'। যোগের (ধ্যানের) আচরণ অর্থাৎ ধ্যান-সাধনার মাধ্যমেই বোধি বা পরমার্থ সত্যের উপলব্ধি সম্ভব। তবে বোধি লাভের পূর্বে বোধিসত্ত্ব অবস্থায় সমস্ত দশভূমি অতিক্রম

করতে হবে এবং একমাত্র যোগ-সাধনার মাধ্যমে তা সম্ভব। এটাই যোগাচার মতবাদের মূল কথা। তাদের মতে, বিজ্ঞানবাদই জগতে একমাত্র সত্য। সেজন্য যোগাচারের নামান্তর হচ্ছে বিজ্ঞানবাদ। এ সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য প্রবক্তাগণ হচ্ছে অসঙ্গ, বসুবন্ধু, দিঙনাগ, গুণমতি, স্থিরমতি, ধর্মকীর্তি, শীলভদ্র, শুভগুপ্ত, শান্তরক্ষিত, ধর্মোত্তর, কমলশীল, হরিগর্ভ, জ্ঞানগর্ভ।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এ চারটি
সম্প্রদায়ের মধ্যে আদর্শগত নানা মতপার্থক্য থাকলেও
তখনো তারা বুদ্ধের পথ থেকে সরে যায়নি। এমনকি
তারা পরস্পরের সঙ্গে এতটাই সংযুক্ত ছিলেন যে,
সেভাবে আলাদা করে বিভাজনটা ততটা স্পষ্ট হয়ে
ওঠেনি বা শক্রতার রেশও সৃষ্টি হয়নি, সবই ছিল যুক্তির
আলোকে বিপক্ষীয় ধারণার খণ্ডন। তাদের পরস্পরের
মধ্যে কেবল বুদ্ধের বাণী নিয়ে গবেষণার পথটা ভিন্ন
ছিল। সেজন্য নানা মত নানা পথের উদ্ভূত হয়েছিল।

হতে হবে। তাই তারা বলেন যে, যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে একটি সত্ত থাকবে তাকে মুক্ত না করা পর্যন্ত তারা পরিনির্বাপিত হবেন না। এর ফলে তারা ধীরে ধীরে তাদের মূল লক্ষ্য নির্বাণ থেকে দূরে সরে গিয়ে অধিক মাত্রায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতে লাগলেন। জনগণের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ততার কারণে তারা রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলেন এবং তাদের মতবাদে বিশ্বাসীর সংখ্যা বাড়াতে লাগলেন। অন্যদিকে হীন্যানপন্থীরা রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাব ও প্রতিকূল পরিবেশের কারণে ধীরে ধীরে কমে যেতে লাগলেন।

এভাবে সময়ের পরিক্রমায় মৌর্যবংশের শেষ সময়ে এসে মহাযানপন্থীদের মধ্যে প্রবেশ করলো তান্ত্রিকতা। বুদ্ধধর্ম গবেষণার চাইতে তারা জনহিতকর কাজ অর্থাৎ নানা তন্ত্র–মন্ত্র সাধনের মাধ্যমে অলৌকিকতায় ডুবে গেলো। এই তান্ত্রিক সাধনার মূল সূত্র হলো দেহবাদ

বুদ্ধের নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে সেই যে শুরু হলো নির্বাণপ্রদায়ী ধর্মযাত্রার, নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে আজও তা চলমান। বুদ্ধধর্ম আজ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে আসতে তাকে পাড়ি দিতে হয়েছে অনেক বন্ধুর পথ যা শুধু কণ্টকাকীর্ণই নয়, একই সঙ্গে পিচ্ছিল ও কাদাভরা ছিল।

যাই হোক, মৌর্যবংশের পতনের পর হতে কুষাণবংশের আগমন পর্যন্ত সময়ে বুদ্ধর্ম বিপর্যন্ত হলেও সম্রাট কণিঙ্কের সময়ে এটা আবার রাজধর্মরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। তবে এটাও ঠিক যে, তার সময়েই উপরিউক্ত চারটি সম্প্রদায় দুটি পৃথক যানে বিভক্ত হয়। প্রথম দুটি হীনযান ও শেষের দুটি মহাযান নামে আখ্যায়িত হয় এবং এ নামকরণের উৎপত্তি মহাযানীদের থেকে। বলা যায়, মহাযানীরা তাদের পদ্ধতিটি রাজকীয় পরিষদে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। কারণ তারা তাদের মতবাদে অন্তর্ভুক্ত করেন যে, প্রত্যেকেই সম্যকসমুদ্ধ হতে পারে তবে তার জন্য বোধিসন্তের মতো করে সাধারণের সহায়

অর্থাৎ দেহকে অবলম্বন করেই ধর্মের সাধনা। এই তান্ত্রিক ধর্মই কিছুদিনের মধ্যে 'বজ্র্রযান' নাম নিল। বজ্র শব্দের অর্থ শূন্যতা, তাই বজ্র্রযান মানে শূন্যতাযান। এই বজ্র্রযানে মন্ত্র, মুদ্রা ও মণ্ডলের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে যোগ হলো দেবদেবীর পূজা, তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম এবং কিছু গুহ্য সাধনা। কিছুকাল পরে আরেকটি মতবাদের সৃষ্টি হলো যার নাম 'কালচক্র্রযান'। কাল মানে সময় আর সময়ের বাহন হলো নিশ্বাস-প্রশ্বাসের প্রবাহ। কিন্তু ততদিনে অন্য ধর্মাবলম্বী রাজাদের আক্রমণে মহাযানপন্থীদের অবস্থাও টালমাতাল আর হীন্যানপন্থীরা তো তখন লুগুপ্রায়।

এরপর অষ্টম শতকের মধ্যভাগে বুদ্ধধর্ম আরেকবার জ্বলে ওঠে। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষ ভাগে এমন এক অরাজক পরিবেশের উদ্ভব হয় যে, তখন দেশে কোনো রাজা ছিল না। তখন দেশের লোকজন 'গোপাল' নামক একজন বীর, সাহসীকে রাজপদে অভিষিক্ত করান। এভাবেই পালবংশের উৎপত্তি। পালবংশের রাজাগণ বুদ্ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাদের সময়েই মগধের প্রসিদ্ধ ওদন্তপুরী, সোমপুরী ও বিক্রমশীলা বৌদ্ধ বিহার নির্মিত হয়। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের ত্রৈকুটক, উত্তরবঙ্গের দেবীকোট, চউগ্রামের পণ্ডিত বিহার, ময়নামতির সন্নগর ও পটিকেরক, বিক্রমপুরের বিক্রমপুরী এবং রাজশাহীর জগদ্দল প্রভৃতি বিহার উল্লেখযোগ্য। তাদের সময়েই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (৯৮২-১০৫৪ খ্রি.) বুদ্ধর্মর প্রচারার্থে তিব্বতে গিয়েছিলেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে. পালবংশের সময়েই বাংলা ভাষার প্রথম উন্মেষ ঘটে। বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ তখন রচিত হয়। এর রচনাকাল ৮ম-১১শ শতাব্দীর মধ্যে বলে গণ্য করা হয়।

পালবংশের সমাপ্তি টানেন কর্ণাটক দেশ থেকে আগত ক্ষত্রিয় 'সেন' বংশ। তারা ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদের ভক্ত। এই নব্য ব্রাহ্মণ্যবাদীদের প্রকোপে পড়ে বৌদ্ধরা আর টিকতে না পেরে ধীরে ধীরে ক্ষয়িষ্টু জাতিতে পরিণত হলো। এই সেনবংশের শেষ সেন রাজা লক্ষণ সেনের রাজত্বকালে 'গীতগোবিন্দ' প্রণেতা কবি জয়দেব স্বয়ং বুদ্ধকেই শ্রীকৃষ্ণের নবম অবতাররূপে বর্ণিত করে তাঁকে হিন্দুধর্মের দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। মাত্র ৫০ বছরের শাসনে তারা বৌদ্ধদের এত নিপীড়ন করেন যে, তার রেশে বুদ্ধধর্মের পতন খুব দ্রুত গতিতে ঘটতে থাকলো।

খ্রিষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তুর্কি ও আফগান থেকে আগত মুসলিমদের পুরোপুরি আয়ত্তে চলে আসে মগধ। তুর্কি সৈন্যরা প্রথমে বর্তমান উত্তর-পশ্চিম বিহারের ভাগলপুরে অবস্থিত বিক্রমশিলা মহাবিহার ধ্বংস করে, বিহারের আচার্য, ভিক্ষু, শিক্ষার্থী সবাইকে হত্যা করে, শাস্ত্রগুলোর মর্মার্থ বুঝতে না পেরে এগুলো এবং বিহারটি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। বিক্রমশিলার দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়লে অন্যান্য ধর্মীয় শিক্ষালয়গুলোর আচার্যসহ সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং যে যেভাবে পারে পালাতে থাকেন। ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী, উত্তরদিকে নেপাল ও তিব্বতে এবং পূর্বদিকে চট্টগ্রামের দিকে তারা অগ্রসর হন। আর যারা রয়ে গেল তাদের কিছু অংশ হিন্দু আর কিছু অংশ মুসলিম হয়ে গেল।

এভাবে প্রথমে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের আক্রমণ এবং পরবর্তীকালে মুসলমানদের আক্রমণে ১২শ-১৮শ শতক পর্যন্ত এই ছয়'শ বছরে ভারতবর্ষে সত্যিকার অর্থে বুদ্ধধর্মের উল্লেখ করার মতো আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না। প্রকৃত পণ্ডিত আচার্য এবং প্রয়োজনীয় শাস্ত্র ও শিক্ষাদীক্ষার বিলুপ্তিতে সাধারণ বৌদ্ধরা তান্ত্রিকতার পথেই আবার আরেকটি মতবাদ তৈরি করে টিকে থাকার চেষ্টা করে, যার নাম 'সহজযান'। তাদের মতে, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই একটা সহজ স্বরূপ আছে—যা সকল পরিবর্তনশীলতার ভিতরে অপরিবর্তিত স্বরূপ। এই সহজ স্বরূপকে উপলব্ধি করতে হলে সাধকদের মহাসুখে মগ্ন থাকতে হবে এবং সহজ সাধনার জন্য কোনো বক্র পথ অবলম্বন করা যাবে না. সবই গ্রহণ করতে হবে সোজা পথে। শাস্ত্র-তর্ক-পাণ্ডিত্যের পথ, ধ্যান-সমাধির পথ, বিবিধ তন্ত্র-মন্ত্র-আচার হলো বাঁকা পথ। আর সহজ পথ হলো দেহসাধনা—নিজের দেহযন্ত্রকে ব্যবহার করে পরম সত্যকে উপলব্ধি করা। এই দেহের মধ্যেই অবস্থান করছে সেই সত্য-স্বরূপ এবং এটাই বুদ্ধ-স্বরূপ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যেখানে মৌলিক বুদ্ধধর্মমতে সমাধির পথেই বোধিচিত্ত/বুদ্ধজ্ঞান লাভ করা সম্ভব. সেখানে সহজিয়ারা বোধিচিত্তকে খুঁজতে লাগলেন তাদের দেহ-মনকে নানা বীভৎস আচারক্রিয়ার মাধ্যমে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সহজিয়াদের আসল রূপ ফুটে উঠতে থাকে। ফলে তাদের এরূপ আচরণে সাধারণ মানুষ প্রথম দিকে কৌতৃহলী হলেও পরবর্তীকালে দেখা গেল, তারা এটাকে খুব একটা গ্রহণ করেনি। অনিবার্য ফলস্বরূপ, একদিকে হিন্দু ও মুসলিমদের আক্রমণ অন্যদিকে সাধারণ মানুষ মুখ ফেরানোর কারণে টিকতে না পেরে তারা কেউ কেউ হিন্দু-মুসলিম হয়ে গেল আর কেউ কেউ আরও পূর্বদিকে চউগ্রামের দিকে সরে আসলো। আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেনের মতে, এই সহজিয়ারাই পরবর্তীকালে বিবর্তনের পথে নিমুস্তরের জনসাধারণের মধ্যে বাউল, দরবেশ, কর্তাভজা, রামবল্লভী ইত্যাদি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশে বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রাচীন বৌদ্ধদের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। বিশেষ দ্রষ্টব্য যে, এইসব সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রহ্ম/শিব/ঈশ্বর ধারণা নেই; বরং আছে 'মনের ঠাকুর', 'প্রাণের মানুষ', 'প্রাণের গোঁসাই' ইত্যাদি এবং এরা সবাই দেহতত্ত্বের বিষয়টি তাদের নাচে, গানে, সংকীর্তনে, আনন্দে প্রকাশ করে। এমনকি

প্রসিদ্ধ লালন ফকিরের গানগুলোও এই পর্যায়ের বললে অত্যুক্তি হবে না। তবে নানা পথপরিক্রমায় তারাও হিন্দু-ইসলাম ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে অনম্বীকার্য। অন্যদিকে যে কজন বৌদ্ধ নামধারী তখনো অবশিষ্ট ছিল তারাও কেবল নামেই বৌদ্ধ ছিল, তারা হারিয়ে ফেলেছিল সকল বৌদ্ধ আচার, ধর্মতত্ত্ব।

প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর প্রথমে কিছু বিনয়গত পার্থক্য এবং পরবর্তীকালে সূত্র ও অভিধর্ম নিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে যে নানা বিভাজন সৃষ্টি হয়, সেই বিভাজিত সম্প্রদায় পরবর্তীকালে অনেকগুলো দার্শনিক মতবাদ সৃষ্টি করে। এত এত দার্শনিক মতবাদের জন্য সহজ ছিল তন্ত্র-মন্ত্রের ভেতর পারেনি; বরং তাদের জন্য সহজ ছিল তন্ত্র-মন্ত্রের ভেতর আশ্রয় খোঁজা এবং তারা সেটাই করেছিল। ফলে নানা দেবদেবীর আবির্ভাব ও পূজা, তান্ত্রিকতাবাদ, তান্ত্রিক আচার-আচরণ মৌলিক বুদ্ধধর্ম ও দর্শনের ভিত্তি নাড়িয়ে দেয়। তান্ত্রিকতার পথে দেহতত্ত্ববাদ এসে এটা বুদ্ধধর্মের ভিত্তিটাই একেবারে টলিয়ে দেয় এবং এতে বৌদ্ধদের নৈতিকতা, শুচি-শুদ্ধ চারিত্রিক পতন ঘটতে থাকে। শেষ পর্যন্ত দেহতত্ত্ববাদের রূপান্তর ঘটে ব্যভিচারের মতো নিকৃষ্ট কার্যাবলিকে গ্রহণ করে।

অষ্টাদশ শতক: ১৮শ শতকের মধ্যভাগ থেকেই ভারতবর্ষে আবার বুদ্ধধর্মের উন্মেষ ঘটতে থাকে। ১৮৭৫ সালে ব্রিটিশ শাসনামলে Light of Asia গ্রন্থের প্রণেতা স্যার এডউইন আরনল্ড লন্ডনের 'টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় বুদ্ধগয়া বিষয়ে একটি চিঠে লিখে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেটা পড়ে শ্রীলংকার 'ধর্মপাল' নামক এক ভিক্ষু বুদ্ধগয়া আসেন এবং পরবর্তীকালে মহাবোধি সোসাইটি গঠন করেন। এরপর তিনি ভিক্ষুত্ ত্যাগ করে গৃহী অবস্থায় ১৮৯১ সালে মহাবোধি সোসাইটি পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। মূলত তখন থেকেই ভারতবর্ষে আবার বুদ্ধর্মের কর্মচাঞ্চল্য শুরু হয়ে বর্তমান অবস্থায় এসেছে। বর্তমানে ভারতের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি ভাষা শিক্ষা ও গবেষণার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এর সঙ্গে নানা ধর্মীয় কার্যক্রমও বেশ জোরেশোরে চলছে।

অন্যদিকে, তখন মূল ভারতবর্ষে বুদ্ধধর্ম বলতে কেবল বর্তমান বাংলাদেশের বৃহত্তর চট্টগ্রামে কিছু কিছু ছিল, তাও নামে মাত্র। তখন প্রধানত 'রাউলী/লুরী'-রাই বৌদ্ধ পৌরহিত্য করত। তাদের কাছে একটা বুদ্ধমূর্তি ছাড়া আচার-অনুষ্ঠানের সবই ছিল হিন্দুধর্মীয় রীতিতে। তবে এর থেকে অনুধাবণ করা যায়, বুদ্ধধর্মের ক্রমবিবর্তনে ক্ষয়িষ্ণু থেকে অধিকতর ক্ষয়িষ্ণু হতে হতে বুদ্ধধর্মের নিদর্শনস্বরূপ কেবল বুদ্ধমূর্তিটাই টিকে গিয়েছিল, তাও অন্য নামে 'গোঁই' এবং এখানকার বৌদ্ধরা যে আদি বৌদ্ধ ছিল তাও এর থেকে প্রতীয়মান হয়।

প্রকৃতপক্ষে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে থেরবাদী বুদ্ধধর্মের ছোঁয়া লাগে ১৮৫৬ সালে বার্মার আরাকানের সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবিরের আগমনে। তার কাছে চাকমা রানি কালিন্দী থেরবাদী বুদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর বার্মা ফিরে গিয়ে পুনরায় ১৮৬৪ সালে আবার একদল ভিক্ষসংঘসহ এসে পুরোদমে বুদ্ধধর্ম প্রচার করতে লাগলেন। তিনি এক বছর চট্টগ্রামে ছিলেন। কিন্তু তার রচিত বীজ শাখা-প্রশাখায় বর্ধিত হয়ে একসময় মহীরূহে পরিণত হলো। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পূর্ণাচার মহাস্থবির, জ্ঞানলংকার মহাস্থবির, কপাশরণ মহাস্থবির, প্রজ্ঞালোক স্থবির, জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির, বংশদ্বীপ মহাস্থবির, প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির, ধর্মবংশ মহাস্থবির, অভয়তিষ্য মহাস্থবির, বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির, আনন্দমিত্র মহাস্থবিরসহ অসংখ্য জ্ঞানীগুণী ভিক্ষুমণ্ডলী। এরা বার্মা ও সিংহলে গিয়ে ত্রিপিটক শিক্ষা করে তা এদেশের বৌদ্ধদের মাঝে বিলিয়ে দিতে অশেষ ভূমিকা রেখেছেন।

বাংলায় ত্রিপিটক অনুবাদের সূচনা : বাংলা ভাষায় ত্রিপিটক অনুবাদের কার্যক্রম মূলত শুরু হয়েছিল ধর্মীয় প্রয়োজনে অর্থাৎ মানুষ ধর্মীয় ভাষা হিসেবেই পালিকে গ্রহণ করেছিল। তাই নিজেদের বুঝার জন্য এবং সাধারণ বৌদ্ধদের বুঝানোর জন্য বাংলা ভাষায় ত্রিপিটকের অনুবাদ করা ছাড়া বিকল্প পথ ছিল না। তবে এই ত্রিপিটক অনুবাদের ইতিহাসও খুব বেশি আণের নয়। পালি ভাষা শেখানোর জন্য যার অবদান সবচেয়ে বেশি তিনি পূর্ণাচার মহাস্থবির মহোদয়। ইতিহাসমতে, ১৮৮৫ সালে জমিদার হরগোবিন্দ মুৎসুদ্দীর অর্থানুকূল্যে চট্টগ্রামের পাহাড়তলীর মহামুনিতে তিনিই প্রথম একটি পালি টোল স্থাপন করেন। দ্বিতীয় পালি টোল স্থাপত হয় ১৯০২ সালে 'সারানন্দ' নামক এক সিংহলী ভিক্ষুর উদ্যোগে। এভাবে ধীরে ধীরে বেশ কয়েকটি পালি ভাষা

শিক্ষা কেন্দ্র বাংলাদেশে গড়ে ওঠে।

বৃহৎ পরিসরে পালি ভাষা শিক্ষার প্রথম নবদিগন্ত উদ্রাসিত হয় ১৮৯৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি বিভাগ খোলার মধ্য দিয়ে। এর মাধ্যমে বাংলা ও ভারতের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও পালি ভাষার দ্বার উন্মোচিত হয়। তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি বিভাগে অধ্যাপনা করতেন বেণীমাধব বড়য়া, নলিনাক্ষ দত্ত, শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, ভগবান চন্দ্র মহাস্থবির, অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাসচন্দ্র মজুমদার, সুকুমার সেনগুপ্ত, শ্যামাসুন্দর বন্দোপাধ্যায়, ধর্মাধার মহাস্থবির প্রমুখ বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ। তারা অনেকেই বুদ্ধধর্ম, পালি ভাষা ও ত্রিপিটকের বিভিন্ন খণ্ড বাংলায় অনুবাদ করেন। পালি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার বিস্তার বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২১ সালে ও চউগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬৮ সালে সম্প্রসারিত হয়।

স্কুলভিত্তিক পালি ভাষা শিক্ষা কাৰ্যক্ৰম শুরু হয় ১৯০৮ সালে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে পালি ভাষা শিক্ষা অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে। পরে চট্টগ্রামের প্রধান প্রধান কাৰ্যক্ৰম স্কুলগুলোতে এর শুরু २য়। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে কলেজ পর্যায়েও এর বিকাশ ঘটে। প্রথমে তিনটি কলেজে পালি ভাষা শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়—কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ ও বিদ্যাসাগর কলেজ এবং চট্টগ্রামের চট্টগ্রাম কলেজ। তখন সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, অমূল্যচরণ ঘোষ, নীরদরঞ্জন মুৎসুদ্দী, প্রাণকৃষ্ণ ভিক্ষু, ধর্মবংশ মহাস্থবির প্রমুখ বেশ কয়েকজন পণ্ডিত এসব কলেজে অধ্যাপনা করতেন।

বাংলা ভাষায় প্রথম পালি থেকে অনূদিত গ্রন্থ হচ্ছে হরগোবিন্দ মুচ্ছুদ্দি ও গোবিন্দ চন্দ্র বড়ুয়ার 'পাদিমুখ' (১৮৭২)। তবে কেউ কেউ 'মঘা খমুজা'-কে প্রথম হিসেবে ধারণা করেন। যদিও এর স্বপক্ষে জোরালো কোনো প্রমাণ নেই। সেই সময়ের সমসাময়িক আরও যে সমস্ত বই পাওয়া যায় সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পণ্ডিত ধর্মরাজ বড়ুয়ার 'হস্তসার' (১৮৮৩), 'স্ত্রনিপাত' (১৮৮৭), 'সিগালোবাদ স্ত্র' (১৮৮৯), ফুলচন্দ্র লোথক 'বৌদ্ধ রঞ্জিকা' (১৮৯০) যেটি পালি ধাতুবংশ থেকে পদ্যে রচিত হয়, রামচন্দ্র বড়ুয়ার 'শ্রমণ কর্তব্য' (১৯৩১), 'অভিধর্মার্থ-সংগ্রহ' (১৯৪১), 'নির্বাণ দর্শন' (১৯৪২)। মূল ত্রিপিটকের কোনো খণ্ডের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ বিবেচনা করলে প্রথম বই হবে পণ্ডিত ধর্মরাজ

বড়ুয়ার অনূদিত সূত্রপিটকের 'সূত্রনিপাত' (১৮৮৭) বইটি। এ ছাড়া শ্রী ঈশান চন্দ্র ঘোষ অনূদিত সূত্রপিটকের 'জাতক - ছয় খণ্ড' (১৯১৬), শ্রী জ্যোতিপাল ভিক্ষু অনূদিত সূত্রপিটকের 'উদান' (১৯৩০), প্রজ্ঞানন্দ স্থবিরের বিনয়পিটকের 'মহাবর্গ' (১৯৩৭), বেণীমাধব বড়ুয়ার সূত্রপিটকের 'মহামনিকায় - ১ম খণ্ড' (১৯৪০) বইটিসহ বেশ কিছু বই, কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সেগুলো আর উল্লেখ করলাম না।। এ সমস্ত মহৎপ্রাণ গুণীদের কল্যাণে পালি ত্রিপিটক বই অনুবাদের যে ধারা শুরু হয়েছিল তার ধারা কিন্তু এখনো বজায় রয়েছে। যদিও মাঝখানে কিছু সময়ের জন্য নিভু নিভু হয়েছিল, তবে ইদানিং অনুবাদ করার ধারাটি অত্যন্ত বেগবান বলা যায়।

পালি থেকে অনূদিত বই কিংবা বুদ্ধধর্মীয় বিশ্লেষণমূলক বই যেটাই হোক না কেন, এগুলো প্রকাশের জন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রকাশক হিসেবে যিনি সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি চাকমা রানি কালিন্দী। তার অর্থানুকূল্যে 'পাদিমুখ', 'বৌদ্ধ রঞ্জিকা'সহ বেশ কয়েকটি বই আলোর মুখ দেখে। তার পরবর্তীকালে প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের অগ্রণী ভূমিকায় রেঙ্গুনে গঠিত হয় 'রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন' (১৯২৮)। এখান থেকেও অনেক বই প্রকাশ করা হয়। তাদের সংগঠনটি এতই দক্ষ ও ক্রিয়াশীল ছিল যে, ১৯৩৫-১৯৩৬ সাল এই এক বছরের মধ্যে ২৬টির অধিক বই প্রকাশ করেছে যা সত্যি বিস্ময়কর। এ ছাড়া আরও রয়েছে ১৯৩৭ সালে গঠিত 'যোগেন্দ্ৰ-রূপসীবালা কলকাতার আরও উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হচ্ছে 'মহাবোধি বুক এজেন্সি', 'ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী'। তাদের মাধ্যমেও অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে। এভাবে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে বিগত সময়ে আমরা বুদ্ধধর্মের মূল ত্রিপিটকসহ ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ের রস আস্বাদন করতে পেরেছি।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বুদ্ধর্মের বিকাশ : ১৮শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রাজনৈতিক ও পারিপার্শ্বিক নানা কারণে চাকমা রানি কালিন্দী ও তার প্রজাদের পূর্বদিকে চলে আসতে হয়। ১৮৬৯ সালে ব্রিটিশ সরকার চন্দ্রঘোনা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা সদর দফতর রাঙামাটিতে স্থানান্তর করে। সব দিক বিবেচনা করে অগত্যা চাকমা রানিকেও রাজধানী রাঙামাটিতে নিয়ে

আসতে হয় ১৮৭৪ সালে এবং রাজবাড়ি নির্মিত হয় রাঙামাটি শহরের পূর্বদিকে কর্ণফুলীর পূর্বপাড়ে। 'ভাগ কর শাসন কর'—এ তত্ত্ব প্রয়োগ করে ১৮৮১ সালে ব্রিটিশরা গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি সার্কেলে ভাগ করে। এভাবেই ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হতে থাকে আর পর্যায়ক্রমে এর প্রভাব জনজীবনে পড়তে থাকে।

পার্বত্য চউগ্রামে থেরবাদী বুদ্ধধর্মের গোড়াপত্তন হয় মূলত ১৮৫৬ সালে বার্মার আরাকানের সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবিরের আগমনের মধ্য দিয়ে। এরপর সময়ের পরিক্রমায় পার্বত্য চউগ্রামে যে দুজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব পশ্চাৎপদ সমাজকে জাগরিত করেছেন তারা হলেন রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথের ও অর্হৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে। দুজনই তারা ছিলেন সমসাময়িক। তবে দুজনের মধ্যে আদর্শগত কিছু পার্থক্য ছিল;

নিরন্তর কাজ করে যান তবে কোনো একসময় আপনার সে স্বপ্ন ফলবতী হবে। তাই আপনার স্বপ্নটা যত বড় হবে ঠিক ততটাই আপনি বিকশিত হতে পারবেন।

এমনই এক স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তে। কেবল স্বপ্ন দেখেই তিনি ক্ষান্ত হননি; বরং সেই স্বপ্নকে প্রস্ফুটিত করতে তিনি ১২টি বছর গভীর অরণ্যে কাটিয়ে দিয়েছেন এবং অবশেষে জয়ের মুকুটিটি ছিনিয়ে এনেছেন—তিনি অর্হত্তুমার্গফলে উন্নীত হন। তিনি আদর্শ বৌদ্ধ সমাজ গঠনের পাশাপাশি স্বপ্ন দেখতেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে এমন বিহার থাকবে যেখানে শত শত ভিক্ষু অবস্থান করবেন, সেখানে পালি ভাষা শেখার জন্য পালি কলেজ থাকবে যেখানে ত্রিপিটক পঠন-পাঠন ও গবেষণা হবে, ভিক্ষু-শ্রামণদের চিকিৎসার জন্য আলাদা হাসপাতাল থাকবে যেখানে সকল প্রকার

আগামী ২৫ আগস্ট ২০১৭ তারিখে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ জমকালো প্রকাশনা উৎসব উদ্যাপনের মধ্য দিয়ে এদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো পূর্ণাঙ্গ ও সমগ্র বাংলা ত্রিপিটক ২৫ খণ্ডে প্রকাশ করা হচ্ছে। এই দিনটি বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে অক্ষয় হয়ে লেখা থাকবে।

যেমন—রাজগুরু ভন্তে মূলত নিরক্ষর সমাজকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট ভূমিকা রাখেন। আর পূজ্য বনভন্তে ছিলেন ধর্মীয় সংস্কারের মূর্ত প্রতীক, সামাজিক নানা অবৌদ্ধ রীতিনীতিকে পরিহার করে সঠিক মৌলিক বুদ্ধধর্মকে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপালনই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। নিঃসন্দেহে এটা আমাদের জন্য সৌভাগ্য যে, একই সময়ে দুজন কল্যাণকামী ব্যক্তি আমাদের পাহাড়কে আলোকিত করার কাজে আজীবন নিবেদিত ছিলেন।

বাংলায় পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক প্রকাশ ও একজন স্বপ্নদুষ্টা :
কথায় আছে, মানুষ নাকি তার স্বপ্নে সমান বড়।
তার মানে হচ্ছে আপনি জীবনকে কোন পর্যায়ে নিতে
চান সেটা একান্তই আপনার ওপর নির্ভর করে। যদি
আপনি মহৎ কিছুর স্বপ্ন দেখেন এবং সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে

চিকিৎসা সুবিধা থাকবে, ত্রিপিটক ও ধর্মীয় বই প্রকাশের জন্য আলাদা প্রেস থাকবে, মোট কথা একটা পরিপূর্ণ বিহার যেটা জ্ঞানচর্চার অনবদ্য কেন্দ্র হিসেবে অবদান রেখে যাবে। তার সেই স্বপ্লের আলোকে আমরা দেখতে পাই, এক এক করে তার সেই লালিত স্বপ্লগুলো ধীরে ধীরে আলোর মুখ দেখেছে।

তাঁর আরেকটি লালিত স্বপ্ন ছিল সমগ্র ত্রিপিটক পালি থেকে বাংলা ও চাকমা ভাষায় অনুবাদ করে এ দেশের বৌদ্ধ সমাজকে বুদ্ধের ধর্মোপদেশগুলোর সঠিক রস আস্বাদন করানো। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'তোমাদের পালি, বার্মিজ, সিংহলীজ, ইংরেজি ভাষার সম্পূর্ণ ত্রিপিটক সংগ্রহ করে দিয়েছি। এবার সেটাকে বাংলা ও চাকমা ভাষায় অনুবাদ কর।' তবে দুঃখের বিষয়, তার সেই স্বপ্নটা এখনো অধরাই রয়ে গেছে। এ দেশে

১৯০০ সালের প্রথমার্ধ থেকে ত্রিপিটকের সঙ্গে প্রথম পরিচয়, অথচ আজ শতাধিক বছর চলে যাওয়ার পরও আমরা বাংলায় পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক পাইনি। এর পেছনে কারণ কী? অনেকগুলো কারণের মধ্যে যে বিশেষ কয়েকটি কারণ আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে সেগুলোর দিকে একটু আলোকপাত করলাম:

- ১. বিহারভিত্তিক শিক্ষা : একজন মানুষ শৈশবে যে শিক্ষা লাভ করে তা তার সারা জীবনপ্রবাহে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে। তাই শৈশবের শিক্ষাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের এখানে ছেলেমেয়েরা সেই শিক্ষা লাভে বঞ্চিত। বিশেষ করে বর্তমানকালে মা-বাবারা চিত্রাঙ্কন, নাচ-গান, খেলাধুলায় যেভাবে সন্তানদের গুরুত্ব দেয় তার সিকি ভাগও ধর্মীয় শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয় না। এভাবে অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত কয়েক প্রজন্য ধরে আমরা ধর্মীয় শিক্ষাহীন হয়ে গড়ে উঠার কারণে পালি ভাষার মাহাত্ম্য অনুধাবনে ব্যর্থ হচ্ছি। একদিকে বিহারগুলোতে পর্যাপ্ত ও দক্ষ ভিক্ষুর অভাব, অন্যদিকে মা-বাবাদের অনীহার ফলে পালি ভাষাকে শ্রদ্ধা করতে আমরা শিখিনি। ফলে পালি ভাষাটি সবসময়ই আমাদের হিসাবের বাইরে রয়ে গেছে। যদি শিশুকাল থেকে পালি ভাষাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম, লালন করতাম তাহলে প্রতি প্রজন্ম থেকে অবশ্যই ক্ষুদ্রতম একটি অংশ পালি ভাষার উন্মেষ, গবেষণা, সংরক্ষণ ও প্রসারে কাজ করতো এবং তাদের দ্বারা এতদিনে বাংলায় পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক প্রাপ্তি ঘটতো। একই সঙ্গে আমরা ধর্ম-বিনয়ে দক্ষ দায়ক ও ভিক্ষু লাভ করতাম।
- २. विश्वविদ্যालय পर्यात्य पूर्वल भिक्का कार्यक्रम : বাংলায় পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক অনুবাদে যারা সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে পারতো তারা হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগ। কারণ প্রতি বছর ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শ' খানেক ছাত্রছাত্রী বের হয়। অথচ তাদের মাঝে পালি ভাষা তথা ত্রিপিটক নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো কর্ম নেই। এর জন্য অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় পালি বিভাগের শিক্ষক তথা কোর্স কারিকুলাম অনেকাংশেই দায়ী। তারা তাদের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে সেই চেতনার বিকাশ ঘটাতে পারেননি, তাদের মাঝে পালি ভাষার ব্যাপকতা ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করাতে পারেননি। পালি বিষয়ে পড়া অনেক ছাত্রছাত্রীকে বলতে তাদের কাছে পালি বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সার্টিফিকেট অর্জনের মাধ্যম।

এমনকি পালি বিভাগে পালি ভাষাটি গৌণ করে বাংলা ভাষাটিকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, এটা অনেকটা যেন বাংলা ভাষায় 'ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য' বিষয়ে পড়াশোনা করার মতো। অবশ্য শিক্ষকদের ব্যক্তিগত অনেক অর্জন ও অবদান রয়েছে কিন্তু পালি বিভাগ প্রতিষ্ঠার এত বছর পরেও সামগ্রিকভাবে তেমন কোনো অবদানই এ বিভাগটি রাখতে পারলো না। পাশ করে বের হওয়া ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে এ যাবৎ ছিটেফোঁটা দুয়েকটা প্রবন্ধ ছাড়া ধর্মীয় বই-সংশ্লিষ্ট বড় কোনো অবদান চোখে পড়েনি। অথচ তারা যদি পালি ভাষাকে গুরুত্ব দিতো তাহলে অবস্থাটা অন্যরকম হতো। আরও বহুবছর আগে আমরা পেয়ে যেতাম পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক, কেবল মূল ত্রিপিটকটিই নয়; অট্ঠকথাসহ অনেক বুদ্ধর্মীয় গ্রন্থও এতদিনে প্রকাশিত হতো। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন তিন মাস, ছয় মাস মেয়াদী বিভিন্ন ভাষা যেমন—ইংরেজি, স্প্যানিশ, জাপানি, কোরিয়ান ইত্যাদি ভাষা শেখার কোর্স করানো হয়। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে না পড়েও অনেকে সেই কোর্সগুলো করে উক্ত ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে পারে। ঠিক সে-রকম, যদি পালি ভাষা শেখার জন্য খণ্ডকালীন কোর্স যুক্ত করা হতো তবে অনেক আগ্রহী ব্যক্তি পালি ভাষা শিখতে পারতো যা আখেরে বুদ্ধধর্মের জন্য মহাফল বয়ে আনতো।

৩. বৌদ্ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট : অনূদিত ত্রিপিটকের বইগুলো প্রকাশে যে সংস্থাটি অগ্রণীয় ভূমিকা পালন করতে পারতো তা হলো বৌদ্ধধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট। অথচ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এর ভূমিকা অনেকটাই প্রশ্নবিদ্ধ। কারণ প্রতি বছর কয়েকটা বিহারে কিছু বাৎসরিক অনুদান আর দুয়েকটা সেমিনার ব্যতীত এ প্রতিষ্ঠানের কোনো কার্যক্রমই চোখে পড়ে না। এমনকি সেখানে বসা পদবীধারীদের ধর্মীয় জ্ঞান ও ব্যক্তিগত ইমেজও অনেকের কাছে অগ্রহণযোগ্য। সব মিলিয়ে এ সংস্থাটি একটি নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। অথচ তারা যদি বছরে একটি বা দুটি অনূদিত বই প্রকাশের ব্যয়ভার বহন করতো তবে আজ আর পূর্ণাঙ্গ বাংলা ভাষার ত্রিপিটকটি নিয়ে হাহুতাশ করতে হতো না। বাংলা একাডেমি যেভাবে বাংলা ভাষার সংস্কার ও শুদ্দিকরণে নানাভাবে নানা ভূমিকা রাখছে, ঠিক সেভাবে বৌদ্ধধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টও চাইলে পালি ও ত্রিপিটক শিক্ষা বিস্তারে অনেক কার্যকর অবদান রাখতে পারতো।

বিগত ২০/২৫ বছরে অনেক দক্ষ অনুবাদক সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু বই প্রকাশের মতো আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় তারা ধীরে ধীরে এ কাজটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। যদি এ সংস্থাটি তাদের সহযোগিতা করতো তবে বুদ্ধধর্মীয় জগৎটা অনেক বেশি আলোকিত হতো, একই সঙ্গে আরও অনেক নবীন এর প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠতো এবং আমাদের ধর্মীয় জ্ঞান ও সমাজ আরও ঋদ্ধ হতো।

ধর্মীয় উত্থানের তিনটি (জনপ্রিয়তা/শিক্ষা/বিকাশ) অনুপস্থিতি : এই দায়ভারটি প্রায় পুরোটাই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ওপর বর্তায়। আমরা যদি পর্যালোচনা করি, পূজ্য বনভন্তের ধর্মসাম্রাজ্যে উত্থানের পর সেখানেই তিনি বসে থাকেননি। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় যা করেছেন তা একজন মানুষের পক্ষে এত বেশি যে, তাঁর অসমাপ্ত বা অকৃত কাজগুলোর জন্য তাঁকে দোষারোপ করার কোনো সুযোগই আর অবশিষ্ট নেই। তবে তাঁর পরবর্তীকালে তাঁর যেসব শিষ্য জনসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করেছেন তারা সেভাবে ধর্মীয় ক্ষেত্রটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। ফলে এতটা পথ পেরিয়ে এসেও আমাদের প্রকৃত ধর্মীয় জ্ঞানের স্তরটা প্রাথমিক স্তরেই রয়ে গেছে। ধর্ম জগৎটাকে বিস্তৃত করতে হলে প্রথম পর্যায়ে প্রয়োজন 'জনপ্রিয়তা'। অর্থাৎ প্রথমে সেই ভিক্ষুটিকে নিজের জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও আচার-আচরণের মাধ্যমে লোকসমাজে জনপ্রিয় বা উচ্চ আসনে যেতে হবে (নিজের মধ্যে সেই জ্ঞান থাকলে জঙ্গলে থাকলেও তার সুনাম আপনাআপনি ছড়িয়ে পড়বে)। তারপর দিতীয় ধাপ হচ্ছে 'শিক্ষা'। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ তাঁর আরাধ্য পূজনীয় ভিক্ষুর কথা সর্বদা রক্ষা করতে চেষ্টা করে। সেটাকে কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষকে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে উদ্যোগী করা। তাদের সুবিধার্থে ধর্মবই পড়ার সরাসরি নির্দেশ দেয়া এবং সে সম্পর্কে পাঠ-পরবর্তী আলোচনার ব্যবস্থা রাখা। এভাবে বাৎসরিক প্লান করে গ্রামে গ্রামে একটা করে পাঠ-পরবর্তী আলোচনা সভা করা এবং নিজের বিহারে মাসিক একটি বা দুটি করে এমন সভার আয়োজন করা যেখানে দান, সূত্রপাঠ এসব কার্যাদি থাকবে না। অর্থাৎ এটা সম্পূর্ণই নির্দিষ্ট একটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে মুক্ত আলোচনা। যে কজন জনপ্রিয় ভত্তে রয়েছেন তারা যদি এ ধারাটি প্রবর্তিত করতো তাহলে আপনাআপনি অন্যান্য ভিক্ষু ও বিহারেও এসব চালু হয়ে যেত। এর ফলে ধীরে ধীরে একটা

সামগ্রিক পরিবর্তন হতো। সবশেষে তৃতীয় ধাপ হচ্ছে 'বিকাশ'। অর্থাৎ মানুষ যখন ধর্ম বই পড়ে এবং মুক্ত আলোচনা করে তখন আপনাআপনি তার মধ্যে জ্ঞানের স্কুরণ ঘটে। মিথ্যাদৃষ্টিমূলক কাজগুলো বাদ দিয়ে সেনজে নিজেই সম্যক দৃষ্টিমূলক কাজগুলো বেছে নেয়। সে তখন ধর্মীয় বই পঠন, লেখন ও প্রকাশনে স্বাভাবিকভাবেই উদ্যোগী হয়ে উঠে। সত্য ও সঠিক কর্মের মাধ্যমে মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধিত হয়। ফলে ধর্মীয় জগণ্টা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিকশিত হতে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের এখানে তিনটি পর্যায়ের মধ্যে কেবল জনপ্রিয়তা স্তরটিতে আমরা আটকে গেছি। পরবর্তী দুটি ধাপ অনেকটাই স্তিমিত। সে-কারণে আজ আমাদের ধর্মীয় সমাজে নানা অসঙ্গতি এবং এর প্রভাবে অন্যান্য সামাজিক, রাজনৈতিকসহ সবক্ষেত্রে নানা পঞ্চিলতা বিরাজ করছে।

শাস্ত্রমতে, লোভ-দেষ-মোহ-অজ্ঞানমুক্ত মহাপুরুষের বাণী নাকি বৃথা যায় না। তাদের বাণী কোনো না কোনো সময় ফল দেবেই দেবে। তাই তো এত এত বাধা-বিপত্তি, অপ্রতিকৃল পরিবেশ সত্ত্বেও পূজ্য বনভন্তের পরিনির্বাণের বহু আগে থেকেই বনভন্তে ও রাজবন বিহারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে একঝাঁক নবীন অনুবাদক ও বহু শ্রদ্ধাসম্পন্ন উপাসক-উপাসিকা এবং সেই সঙ্গে বই প্রকাশনার অতি প্রয়োজনীয় উপাদান 'রাজবন অফসেট প্রেস'। ফলে ইতোমধ্যেই আমরা মূল পালি ত্রিপিটকের বিভিন্ন খণ্ডের অনূদিত বই হাতে পেয়েছি এবং এখনো পাচ্ছি। এমনকি বহু আগে প্রকাশিত সমতল ও ভারতীয় লেখকদের লিখিত দুর্লভ ধর্মীয় বইগুলোও এখান থেকে পুনর্মুদ্রণ করা হচ্ছে। এটা নিঃসন্দেহে পূজ্য বনভন্তের অবদান। বলতে দ্বিধা নেই যে, বনভন্তেকে ঘিরে যে মাত্রায় বই প্রকাশ হচ্ছে তার তুলনায় অন্যান্য জায়গায় খুবই শমুক গতিতে পাকেচক্রে একটা-দুটা বই প্রকাশ হচ্ছে। সেজন্য এক কথায় বলতে গেলে পূজ্য বনভন্তে আমাদের জন্য যা করেছেন, করে যাচ্ছেন তার তুলনা কেবল তিনি নিজেই।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ : ত্রিপিটকের বইগুলো অনুবাদ হচ্ছে, প্রকাশ হচ্ছে কিন্তু কোথাও যেন সুরটা কেটে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল কোথাও যেন সামান্য অপূর্ণতা রয়ে যাচ্ছে। তবে সেটা কী? কেটে যাওয়া সুরটা পরীক্ষা করতে গিয়ে খুঁজে পেলাম আসল কারণটা। একটি পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ ত্রিপিটকের

অপ্রাপ্তি। এই অভাববোধটি সম্ভবত শুধু আমার মধ্যেই ছিল না। আরও অনেকের মনেও উঁকি দিয়েছিল। সে-কারণেই তো পূজ্য বনভন্তের স্বপ্নকে পরিপূর্ণতা দিতে কিছু সদ্ধর্মহিতৈষী ব্যক্তির উদ্যোগে কিছু একটা করার পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়। সেই সম্মিলিত পরিকল্পনার প্রয়াস হচ্ছে এই 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ'। ইতোপূর্বে বাংলাদেশে অনেক ধর্মীয় সংগঠন গড়ে উঠলেও কেবল পিটকীয় বই প্রকাশনাকে লক্ষ্য রেখে কোনো সংস্থা গড়ে ওঠেনি। সে-কারণে কার্যক্রমের দেখা গেছে. তাদের ছড়ানোছিটানো যে তারা বই প্রকাশে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেনি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, একটি-দুটি বই প্রকাশ করে তাদের দৌড় শেষ হয়েছে। তার বিপরীতে, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি অত্যন্ত ব্যতিক্রম। ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এটি এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি পিটকীয় বই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছে। কেবল বই প্রকাশে তাদের কার্যক্রম থেমে থাকেনি। সংস্থাটির সদস্য সংখ্যাও তারা খুব দ্রুত বৃদ্ধি করতে পেরেছে নিজেদের কর্মোদ্যোগ ও আর্থিক স্বচ্ছতা এবং সম্পূর্ণ অলাভজনকভাবে স্বেচ্ছাসেবী হয়ে ত্রিপিটক প্রকাশের লক্ষ্যকে সামনে রেখে। সম্ভবত বৰ্তমানে এই সংস্থাটিই অলাভজনক, স্বেচ্ছাসেবী পিটকীয় বই প্রকাশনা সংস্থা যার সদস্য সংখ্যা এখন ৯০০-র অধিক। তবে তাদের সবচেয়ে স্মরণযোগ্য ও ঐতিহাসিক উদ্যোগ হচ্ছে সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশ করা। এ লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপদান করতে বর্তমানে তাদের কার্যক্রম পূর্ণশক্তি নিয়ে

চলছে। শুনেছি ইতোমধ্যেই সমগ্র ত্রিপিটক ছাপানোর কাজ শেষ হয়েছে। পরম পূজ্য বনভন্তের ও এদেশের সদ্ধর্মপ্রাণ হাজারো মানুষের মহান স্বপ্ন চূড়ান্তভাবে ফলবতী হতে চলেছে। আগামী ২৫ আগস্ট ২০১৭ তারিখে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ জমকালো প্রকাশনা উৎসব উদ্যাপনের মধ্য দিয়ে এদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো পূর্ণাঙ্গ ও সমগ্র বাংলা ত্রিপিটক ২৫ খণ্ডে প্রকাশ করা হচ্ছে। এই দিনটি বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে অক্ষয় হয়ে লেখা থাকবে। আমি এ প্রকাশনা সংস্থাটির উত্তরোত্তর সাফল্য, উন্নতি, সমৃদ্ধি কামনা করছি।

প্রবন্ধটির শুরু করেছিলাম আমার জীবনে সম্মুখীন হওয়া ব্যক্তিগত কিছু অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে। আসলে আমরা প্রত্যেকেই এসব সমস্যার ভেতর দিয়ে চলছি। বুদ্ধধর্মের উত্থান-পতন, বিস্তৃতি-বিকৃতি তথা নানা চড়াই-উৎরাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও পরোক্ষভাবে এর প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছি। মেঘ যত ঘন কালো হোক, বাতাস যতো উন্মাদনা করুক, বৃষ্টি যত ভারী হোক, সবকিছুর শেষে আলোকোজ্বল মৃদু-মন্দ হাওয়াময় একটা দিন কিন্তু আসেই। তেমনি অলীক থাকা সেই জ্ঞান আধারও অবশেষে ধরা দিচ্ছে। সেই প্রজ্ঞারত্ম ভাগুর আর কটা দিন পরেই আমাদের হাতে আসছে। সেই জ্ঞানভাগ্ররের জ্ঞান সবাই আহরণের চেষ্টা করবে, নিজে আলোকিত হবে এবং অন্যকে আলোকিত করবে, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে লেখার ব্যাপ্তি এখানেই ইতি টানলাম।

'প্রজ্ঞায় আলোয় প্লাবিত হোক সমস্ত ধরণী!'

সহায়ক গ্রন্থাবলি:

- ১. বুদ্ধ ও বৌদ্ধ, ড. বারিদবরণ ঘোষ
- ২. গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, ড. সুকোমল চৌধুরী
- ৩. বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম এবং প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজ, শ্রী শান্তিকুসুম দাশগুপ্ত
- 8. গৌতম বুদ্ধ দেশকাল ও জীবন, রুবী বড়য়া / বিপ্রদাশ বড়য়া
- ৫. প্রবন্ধ সমগ্র ২য় খণ্ড, ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথের
- ৬. মহামানব বুদ্ধ, অধ্যাপক রণধীর বড়ুয়া
- ৭. উইকিপিডিয়া, ইন্টারনেট

^{*} লেখক পরিচিতি : শ্রীমৎ সানু কীর্তি ভিক্ষু, শান্তিপুর অরণ্য কুটির, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি।

মানবতা ও বৌদ্ধধর্ম

ড. সুধীন কুমার চাকমা

প্রত্যেক মানুষের জীবনপ্রবাহ তার নিজ ধর্ম ও আদর্শ দারা পরিচালিত হয়। আর প্রতিটি ধর্মের সঙ্গে জীবন ও দর্শন গভীরভাবে সম্পর্কিত। বৌদ্ধর্ম এর ব্যতিক্রম নয়। পৃথিবীতে ধর্মের উদ্ভব হয়েছিল জীবনের প্রয়োজনে। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললে জীবন সহজ, সরল ও সুন্দর হয়। ভিন্নমাত্রিক জীবনবোধ ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শ সৃষ্টি করলেও সব কিছুর মূলে রয়েছে মানবতা। যে চারিত্রিক গুণাবলি এবং মনস্তাত্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জনের মাধ্যমে একজন মানুষ পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত হয় তাকে মনুষ্যত বা মানবতা বলে। সোজা কথায় যে আচরণগত বা মনস্তাত্ত্রিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকলে কোনো Homo Sapien-কে যদি মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় তাকেই মনুষ্যত্ব বা মানবতা বলে। এ কথা অনস্বীকার্য যে মতই যেন পথের সৃষ্টি করে। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ কোনো-না-কোনো মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে বিভক্ত হয়ে যাত্রা করে ভিন্ন ভিন্ন পথে। যে যে পথে চলে সে পথেই তাঁর ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক মনে করে. চেষ্টা করে সে পথে থেকে চরম সত্যকে জানার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বৌদ্ধধর্ম এমন একটি মতবাদ যা গৌতম বুদ্ধের বাণী ও উপদেশের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম খ্রি. পূ. ৬২৫ অব্দে। জন্মের পর জ্যোতিষীরা ভবিষ্যদাণী করেছিলেন যে গৌতমের শরীরে মহাপুরুষের বত্রিশটি সুলক্ষণ বিদ্যমান। কাজেই কুমার গৌতম হয় রাজচক্রবর্তী হবেন, নয়তো বা পূর্ণজ্ঞানী মহাপুরুষ হবেন। সিদ্ধার্থের জন্মের এক সপ্তাহ পরেই তাঁর মায়ের মৃত্যু হয় এবং তাঁর লালন-পালনের ভার একাধারে তাঁর মাসি এবং বিমাতা প্রজাপতি গৌতমীর ওপর বর্তায়। সিদ্ধার্থকে সাংসারিক বিষয়ে বিশেষ উদাসীন এবং সতত চিন্তামগ্ন দেখে রাজা শুদ্ধোন ভীত হয়ে পড়েন এবং ধ্যানমুখী থেকে সংসারমুখী করার জন্য তিনটি ঋতুর উপযোগী তিনটি মহল নির্মাণ করেন। মহাপ্রাচুর্যের মধ্যে উপভোগের বহু

সামগ্রী নিয়ে অপরূপ রূপসী নর্তকীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সিদ্ধার্থ চূড়ান্ত পার্থিব সুখ ভোগ করতে লাগলেন। ইতোমধ্যে রাজা শুদ্ধোদন প্রতিবেশী কোলিয়গণের সুন্দরী কন্যা ভদ্রা কপিলায়নী (যশোধরার) সঙ্গে সিদ্ধার্থের বিবাহ দেন। তাঁর একটি পুত্র সন্তান জন্মে। তিনি পুত্রকে অভীষ্ট লক্ষ্যপথের রাহু (বন্ধন) মনে করে তাঁর নাম রাখেন রাহুল। বৃদ্ধ, পীড়িত, মৃত এবং প্রব্রজিত (সন্যাসী) এই চার দৃশ্য দেখে সংসার সম্বন্ধে তার অনীহা আরও তীব্র হয়ে ওঠে এবং এক নিশীথ রাত্রিতে তিনি সংসার ত্যাগ করেন।

জীবনজিজ্ঞাসাই কুমার সিদ্ধার্থকে টেনে এনেছিল রাজপ্রসাদ থেকে মেঠো পথে। ছয় বছর ধরে যোগতপস্যা করেন সকল মানুমের দুঃখ মোচনের সংকল্প
নিয়ে। ধ্যান এবং গভীর আত্মচিন্তার দ্বারা ৩৬ বছর
বয়সে তিনি বোধিজ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে 'বুদ্ধ' নামে পরিচিত
হন। এই তপস্যার মধ্যে কোনো অধিকারভেদ ছিল না।
কেউ ছিল না ফ্রেচ্ছ, অনার্য। তিনি তাঁর সবকিছু ত্যাগ
করেছিলেন দীনতম, মূর্যতম মানুমের জন্য। তাঁর সেই
তপস্যার মধ্যে ছিল নির্বিচারে সকল দেশে সকল
মানুমের প্রতি শ্রদ্ধা। সুসাহিত্যিক আবুল ফজল তাঁর
'মানবপুত্র বুদ্ধ' গ্রন্থে লিখলেন, "সর্বত্যাগী এই
রাজভিক্ষুর সুদীর্য ছয়় বছর অবর্ণনীয় কঠোর সাধনার
দ্বারা লব্ধ এ অগ্নিবাণী তাই ব্যর্থ হওয়ার নয়, নয় তা
দেশ-কালের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই সত্যের
উত্তরাধিকার সর্ব মানুমের, সর্ব দেশের ও সর্ব যুগের।"

বুদ্ধ যে ধর্ম প্রচার করলেন তা ছিল মানবধর্ম। বুদ্ধের মানবতা সর্বব্যাপী। স্নেহ-মায়া-মমতা, দয়া-করুনা, সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সামাজিক কল্যাণ ও ন্যায়বোধ এবং নৈতিকতা ইত্যাদি সবগুলো মানবতার একেকটি গুণ। এই ধর্ম কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ধর্ম নয়। বুদ্ধের উপদেশ কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য উপদিষ্ট হয়নি। সমগ্র মানবজাতির হিতের জন্য, সুখের জন্য তিনি সত্যধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাঁর বিশ্বনন্দিত বাণী "সবের সত্তা সুখীতা হোক্ত"—জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক। শুধু মানুষ সুখী হোক তাই নয়। বিশ্বের বহুরকমের প্রাণী আছে। প্রত্যেক প্রাণী সুখী হোক, এটি বিশ্বমানবতার অমর বাণী। এই সেই ধর্ম যা মহামানবতার ধর্ম, মানবকে অতিক্রম করে জীবজগতের আনাচেকানাচে ছড়িয়ে পড়েছে এই ধর্ম। ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেবের মতে "মানুষের মর্যাদা সম্পর্কে বুদ্ধ ছিলেন সচেতন। তাই তিনি ছিলেন মানবকল্যাণে নিরেদিত। প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন মানবতাবাদী, এটাই আধুনিক মানুষের জন্য আবিদ্ধার।"

ব্যক্তি ও সমাজ একে অন্যের পরিপুরক। উভয়েই একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। তাই ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে কল্যাণময় সুসম্পর্ক স্থাপন উভয়ের জন্য সুখপ্রদ। এই সুসম্পর্কের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন মানবতার দৃষ্টিভঙ্গি। এই মানবতা ব্যক্তি ও সমাজজীবন থেকে হিংসা, দ্বেষ, হতকারিতা, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি দূর করে মানবের সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করে বুদ্ধ বলেছিলেন, ক্রোধকে জয় করবে অক্রোধের দারা, নিজের ক্রোধকে এবং অন্যের ক্রোধকে। তা না হলে মানুষ ব্যর্থ হবে, যেহেতু সে মানুষ পাশবতার সাহায্যে মানুষের সিদ্ধিলাভের দুরাশাকে যিনি নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন সেই মহাপুরুষ তথাগত সম্যকসমুদ্ধকে স্মরণ করে মনুষ্যত্তের জগদ্যাপী এই অপমানের যুগে বলবার দিন এসেছে "বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি"। তাই শরণ নেব যিনি আপনার মধ্যে মানুষকে প্রকাশ করেছেন, যিনি সেই মুক্তির কথা বলেছেন, যে মুক্তি কর্মত্যাগে নয়, সাধুকর্মের মধ্যে আত্মত্যাগে, সর্বজীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীসাধনায় যাকে বলা হয় শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বন্দরনায়েকে বলেন, "পৃথিবীতে যতদিন সূর্য ও চন্দ্র বিদ্যমান থাকবে, ততদিন বৌদ্ধধর্ম স্থায়ী হবে, কারণ এ ধর্ম হলো মানুষ তথা সমগ্র মানবজাতির ধর্ম।" বলা বাহুল্য আজ মানুষ মানুষের বিরুদ্ধ হয়ে উঠেছে। কেননা মানুষ আজ সত্যদ্রস্থী, তার মানবতা প্রচ্ছন্ন। তাই সমস্ত পৃথিবীজুড়ে মানুষের প্রতি মানুষের এত সন্দেহ, এত আতঙ্ক, এত আক্রোশ। বর্ণে বর্ণে জাতিতে জাতিতে নিষ্ঠুর মূঢ়তা ধর্মের নামে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও জাত্যাভিমান নিয়ে আজ রক্তে পদ্ধিল করে তুলেছে বিশ্বমানবতা।

বুদ্ধের মানবতার বাণী অতীতের চেয়ে বর্তমানে অধিকতর প্রয়োজনীয়। এটা উপলব্ধি করে পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুর একটি উক্তি মনে পড়ছে। তিনি বলেছিলেন, "বুদ্ধ সমস্ত মতবাদের উধের্ব এবং তাঁর শ্বাশ্বত বাণী যুগ যুগ ধরে মানুষের মধ্যে শিহরণ সৃষ্টি করেছে। সম্ভবত তাঁর শান্তির বাণী অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বর্তমান দুর্গত ও হতাশাগ্রস্ত মানুষের জন্য অধিকতর প্রয়োজনীয়।" বৌদ্ধধর্ম মানুষকে শিক্ষা দেয় ত্যাগ-তিতিক্ষা, শান্তি-সম্প্রীতি, মৈত্রী, করুণা, প্রেম ও অহিংসা। এ ধর্ম মানুষে মানুষে সদ্ভাব, সম্প্রীতি ও মধুর দ্রাতৃত্ববোধ স্থাপন করে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করতে অদিতীয়। প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবুল ফজল তাঁর 'মানবপুত্র বুদ্ধ' গ্রন্থে আরও লিখেছেন, "সম্ভবত বৌদ্ধর্মই একমাত্র ধর্ম যা মানুষের তৈরি আর সর্বতোভাবে মানুষের জন্যই এবং মানুষকে নিয়েই।" তাই আজ মহামানবকে এই বলে ডাকবার দিন এসেছে তুমি আপনার দ্বারা মানুষকে প্রকাশ করো। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বুদ্ধের ধর্মের মহিমা হ্রদয়ঙ্গম করে অত্যন্ত সহজ ভাষায় বলেছেন, "যদি কোনো ধর্ম আধুনিক বিশ্বের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম, তা হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম।" জয় হোক মহামানব বুদ্ধের, তাঁর অহিংসা মন্ত্রের, আর জীবনচেতনার। ■

সহায়ক গ্রন্থাবলি:

- ১. রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা।
- ২. **ত্রিপিটক সমগ্র**, ড. জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়, মহাবোধি বুক এজেন্সী।
- ৩. বৌদ্ধধর্মের মতবাদ ও ধর্মদর্শন, ড. দীজেন বড়ুয়া, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী।

^{*} লেখক পরিচিতি : ড. সুধীন কুমার চাকমা, সাবেক অধ্যক্ষ, খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সুদূরপ্রসারী ভাবনা ও ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ-এর কার্যক্রম পর্যালোচনা

অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বৌদ্ধ সমাজের এক অবিস্মরণীয় অচিন্তনীয় প্রাতঃস্মরণীয় নাম। একজন উচ্চমার্গের আধ্যাত্মিক সাধক হিসেবে তিনি যেমন জ্বলন্ত স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তেমনি একজন সৃক্ষদর্শী ও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হিসেবেও বর্তমান ও অনাগতকালের প্রজন্মের জন্য তাঁর চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয়। সুদুর আড়াই হাজার বছরেরও অধিককাল পূর্বে মহাকারুণিক গৌতম বুদ্ধ যে ধর্ম প্রচার করে গেছেন মানবমুক্তির জন্য, সেই ধর্ম তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্য ও পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত সংঘের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন সঙ্গীতির মাধ্যমে অটুটভাবে সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসারের জন্য মহান ভিক্ষুসংঘ ও রাজা-মহারাজাদের প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। তার ফলে সমগ্র এশিয়া ও ইউরোপে বুদ্ধবাণীর প্রচার ও প্রসার ঘটে। অনেক দেশে বুদ্ধবাণী ত্রিপিটক স্ব স্ব দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। আমাদের দেশেও বঙ্গাক্ষরে সীমিত আকারে ত্রিপিটক গ্রন্থ মুদ্রিত ও বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়ে আসছে।

কিন্তু বাংলা ভাষায় ত্রিপিটক গ্রন্থের অনুবাদ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে কোনো উদ্যোগ এ পর্যন্ত নেয়া হয়ন। তবুও ১৯৩০ সালের পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের কতিপয় শ্রদ্ধেয় প্রাক্ত ভিক্ষু তৎকালীন বার্মায় (বর্তমানে মায়ানমার) রেপুন বৌদ্ধ মিশন ও প্রেস প্রতিষ্ঠা করে ত্রিপিটকের বেশ কিছু গ্রন্থ প্রকাশ করতে সক্ষম হলেও বিশ্বযুদ্ধের সময় বৌদ্ধ মিশন প্রেস ধ্বংস হয়ে গেলে বাংলায় ত্রিপিটক গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগে ছেদ পড়ে। এ ছাড়াও অবিভক্ত বাংলায়ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় কিছু কিছু পিটকীয় গ্রন্থ অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে সত্যি, কিন্তু সবগুলো গ্রন্থ বাংলায় প্রকাশিত

হয়নি।

শ্রদ্ধেয় সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভত্তে) আধ্যাত্মিক নিবিড সাধনায় সমগ্র জীবন উৎসর্গের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবন অবসানের প্রায় দুই যুগ পূর্ব হতে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক গ্রন্থ অনুবাদ ও পালি কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা ব্যক্ত করেন। ধ্যান-সাধনার পাশাপাশি তাঁর ধর্মদেশনায় তিনি জনসমক্ষে সমগ্র ত্রিপিটকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ ও পালি কলেজ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব তুলে ধরেন। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে তিনি তাঁর অনুসারী অনুগত শিষ্যগণকে উদ্বন্ধ করেন এবং রাঙামাটি রাজবন বিহারে একটা প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এ সময় তিনি বাংলা ও পালি ভাষায় স্লাতকোত্তর ডিগ্রিধারী একজন অভিজ্ঞ ভিক্ষুও পেয়ে যান। তিনি হলেন ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথের। রাজবন বিহারে তাঁর কয়েক বৎসর অবস্থানকালে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের কতিপয় শিক্ষিত উৎসাহী ভিক্ষু উক্ত মহাথের থেকে পালি শিক্ষা করেন। তিনি নিজেও বহু পালি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। তাঁর অধীনে শিক্ষাপ্রাপ্ত ভিক্ষুগণ শ্রদ্ধেয় বনভন্তের উদ্যোগ বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেন এবং অননূদিত পালি গ্রন্থ ও অট্ঠকথাগুলোর অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, অতীতে অনূদিত কিছু কিছু দুম্প্রাপ্য গ্রন্থও উক্ত প্রেসে ছাপিয়ে প্রচার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। বলতে গেলে বর্তমানে ত্রিপিটকের সব মূল গ্রন্থের অনুবাদ শেষ হয়েছে এবং অবশিষ্ট অট্ঠকথাগুলোর অনুবাদের পরিকল্পনা চলছে।

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করতে হয় যে, শ্রন্ধেয় বনভন্তের শিষ্যসংঘ ছাড়াও কতিপয় অন্যান্য ভিক্ষু ও ব্যক্তির অবদানও রয়েছে। এ পর্যন্ত যেসব ত্রিপিটক গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে কিছু কিছু রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে, কিছু কিছু ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং কিছু কিছু শ্রদ্ধেয় বনভন্তের প্রতিষ্ঠিত প্রেস থেকে।

এক্ষেত্রে কয়েক বছর পূর্বে শ্রম্মের বনভন্তের শিষ্যসংঘ ও কতিপয় গৃহীসংঘের সম্মিলিত মহতী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ', যার লক্ষ্য হচ্ছে ত্রিপিটকের সমস্ত গ্রন্থ বাংলায় প্রকাশ করা। এ উদ্যোগ খুবই সময়োপযোগী ও সাধুবাদযোগ্য। এখানে বলা প্রয়োজন যে, পূর্বে ত্রিপিটকের যেসব গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হয়েছে সেসব গ্রন্থের অনুবাদকের পূর্বানুমতিসাপেক্ষে উক্ত সংস্থা থেকে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতীব আনন্দের সংবাদ এই যে, উক্ত সংস্থা থেকে ইতোমধ্যে মূল ত্রিপিটকের সবগুলো গ্রন্থকে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে ২৫ খণ্ডে কম্বাইন্ড করে প্রকাশের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে, দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর স্বতঃক্ষুর্তভাবে গঠিত সংস্থাটি দীর্ঘদিনের অভাবটা

পূর্ণ করল প্রথমবারের মতো। তজ্জন্য সংস্থাটির কর্মকর্তাদের প্রতি আন্তরিক অশেষ ধন্যবাদ জানাই। এটা প্রতীয়মান হয় যে, শ্রদ্ধেয় বনভন্তের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন সমগ্র ত্রিপিটকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ, 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ' সেই পরিকল্পনারই বাস্তব রূপায়ণ ঘটিয়েছে। ত্রিপিটকের সব গ্রন্থ বাংলায় প্রকাশিত হওয়ার ফলে আগ্রহী পাঠক-পাঠিকাগণ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। এর মধ্যে রয়েছেন ভিক্ষুসংঘ ও গৃহীসংঘ যাঁরা নির্ধারিত মূল্যে গ্রন্থগুলো সংগ্রহ করে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে জেনে উপকৃত হবেন। এগুলো অমূল্য সম্পদ। এগুলোর সদ্যবহার তথা পাঠ করে যেকোনো ব্যক্তি ইহলৌকিক ও পারত্রিক জীবনে উপকৃত হবেন। বৌদ্ধরা কর্মবাদী ও কর্মফলে বিশ্বাসী। আশা করি, ত্রিপিটক গ্রন্থ সংগ্রহ ও অধ্যয়ন করে যেকোনো ব্যক্তি নির্বাণমার্গের পাথেয় সংগ্রহ করে স্ব স্ব জীবনের সার্থকতা সম্পাদনে প্রয়াসী হবেন এবং ধর্মরসে জীবনকে সমৃদ্ধ করবেন।

* লেখক পরিচিতি: অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়য়া, পালি বিভাগ, চউগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

সদ্ধর্মের পুনর্জাগরণে পূজ্য বনভন্তের অবদান

সুনীতি বিকাশ চাকমা (সক্ক)

"দুল্লভো পরিসাজঞ্ঞো ন সো সব্বথ জাযতি, যথ সো জাযতি ধীরে তং কুলং সুখমেধতি।"

'মহাপুরুষের আবির্ভাব অতীব দুর্লভ। এইরূপ লোক সর্বত্র জনুগ্রহণ করেন না। যেখানে এই মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় সেই দেশ ও জাতি ধন্য হয়।'

পূজ্য বনভন্তের আবির্ভাবে ধন্য তাঁর জন্মকুল চাকমা জাতি। ধন্য তাঁর জন্মভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। তিনি বর্তমান যুগের বিশ্ব বৌদ্ধ সমাজের একটি প্রদীপ্ত ভাস্বর ও তাঁর ভক্তমণ্ডলীর পরম কল্যাণমিত্র। তাঁর জীবনেতিহাসের কথা শতমুখে বললেও ফুরাবে না। তা হবে বাহুল্য মাত্র। তিনি সংক্ষেপে যা বলেছেন এবং গোটা জীবনকাল যা উপদেশ দিয়েছেন তা তিনি এই গাথাযোগে প্রকাশ করেছেন।

> 'নহে দূরে, নহে কাছে খুঁজিলেই পায়; লোভ-দ্বেষ-মোহ তারে ঢাকিয়াছে গায়। আবরণ খুলে ফেল দেখিবে নির্বাণ; চিরশান্ত হবে তুমি রহিবে অম্লান।'

অনিচ্চা বত সংখার উপ্পাদ বয় ধিমনো, উপজিত্বা নিরুজ্বন্তি তেসং বৃপসমা সুখো... বিগত ৩০ জানুয়ারি পতন হলো বৌদ্ধ জগতের এই অনন্য উজ্জ্বল নক্ষত্রের। পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়ের হলো অবসান। তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের ফলে অপূরণীয় ক্ষতি হলো তাঁর জন্মকুল চাকমা জাতির পার্বত্যবাসী ও সমতলবাসী বৌদ্ধদের তথা বিশ্ব বৌদ্ধ সমাজের। বর্তমানে তাঁর পবিত্র দেহধাতু যথাযোগ্য মর্যাদায় সংরক্ষিত আছে রাজবন বিহারের তাঁর আবাসিক ভবনে। বর্তমানে তিনি পরিনির্বাপিত, চিরশান্ত ও চির অম্লান।

সদ্ধর্মের পুনর্জাগরণে পূজ্য বনভন্তের অবদান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিসরে বর্ণনা করা একটু দুষ্কর ব্যাপার। একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে তা বর্ণনা করাও ধৃষ্টতা মাত্র। তবুও আমাদের মতো সাধারণের দৃষ্টিতে যা মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন সে-বিষয়ে আমার এই লেখার প্রয়াস। ১৯৭২ সনে ফেব্রুয়ারি মাসে আমি সর্বপ্রথম তিনটিলা বনবিহারে পূজ্য ভন্তের দর্শনে গমন করি। সেই হতে বেশ বহুবার তথায় আসা-যাওয়া করেছি এবং তাঁর অমৃতময় উপদেশবাণী শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। পরবর্তীকালে তাঁর রাঙামাটিতে ভভাগমন, রাজবন বিহার প্রতিষ্ঠা, এর সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও পরিচালনার দায়িতে নিয়োজিত বিভিন্ন সময়ের গঠিত পরিচালনা কমিটির সাধারণ সদস্যপদ, কিছুকাল উহার সাধারণ সম্পাদক, তারপর দুই মেয়াদকাল সভাপতি পদে ছিলাম। এভাবে বিহার প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমার প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা থাকার সুযোগে স্বীয় লব্ধ উপলব্ধিবোধ থেকে এই প্রতিপাদ্য বিষয়ের ওপর আলোকপাত করছি। মানবসমাজে সাধারণ লোক পরস্পরের যোগে কোনো একটা বিশেষ জাতির বিশেষ দেশের বিশেষ শ্রেণির পরিচিতিতে আবদ্ধ। আবার ব্যক্তি মানুষ মাত্রেই স্বীয় বুদ্ধিমত্তা, মানবিক বোধশক্তি আশা-আকাজ্ফা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রত্যেকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে চলছে। এই বৈশিষ্ট্যগত প্রভেদের কারণে মানুষের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত, ভিন্ন রুচিবোধ ও এত বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। মোটামুটি বলতে গেলে নিজস্ব উপলব্ধিবোধ ও নিজস্ব বলয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে একজন ব্যক্তিমানুষের জীবনপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলছে। কিন্তু যুগে যুগে, দেশে-দেশে, জাতিতে জাতিতে মানবসমাজে এমন অনেক মনীষীর ও ইতিহাসখ্যাত ব্যক্তির জন্ম হয়েছে যাঁদের পরিচয় দেশ-কাল-জাতির গণ্ডীবদ্ধ পরিচিতিতে নয়—তাঁদের পরিচয় মানবেতিহাসের অসাধারণ মানুষ বা মহামনীষীরূপে। এই অসাধারণ মানুষেরা মানবেতিহাসের পাতায় অক্ষয় স্বাক্ষর রেখে গেছেন। যদিও মানবসমাজে তাঁদের উল্লেখযোগ্য অবদান ও বিশিষ্ট স্থান রয়েছে সত্যের খাতিরে বলতে হয় যে, নিখুঁত সত্যের বিচারে তাঁদের অনেকের মধ্যে শুধু সত্যের খণ্ড প্রকাশই পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে তাঁরা বড়ো মাপের অসাধারণ মানুষের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত বটে, তাঁদের অনেকেই প্রচ্ছন্নভাবে একটা সীমাবদ্ধ চৈতন্যের গণ্ডীতে আবদ্ধ। বলা যায়, পরিপূর্ণ সত্যের বিকাশ তাঁদের মধ্যে অপরিণত, যাঁর ফলশ্রুতিতে মানুষে-মানুষে, শ্রেণিতে শ্রেণিতে, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে ভেদ-বৈষম্যের নিষ্ঠুর মূঢ়তায় রঞ্জিত হয়েছে মাটির ধরণী, মনুষ্যত্ব হয়েছে অপমানিত ও লাঞ্ছিত। বিশ্বের ইতিহাসে তার ভুরি ভুরি প্রমাণের অভাব নেই।

বিশ্বের ইতিহাসে এমন লোকের জন্ম অতি বিরল যাঁরা দেশ-কাল-জাতি ও শ্রেণিভেদের উর্ধের্ব উঠে নিখাদ সত্যলাভীর প্রভাব নিয়ে আপন মহিমায় পূর্ণরূপে স্বতঃই প্রকাশমান। যিনি সকল মানুষকে এমনকি সর্বজীবকে আপনার মতো করে দেখে, আপনার মধ্যে প্রকৃত সত্যকে দর্শন করতে পেরেছেন, কেবল তাঁর মধ্যে পূর্ণ সত্য প্রকাশিত। তিনিই পরিপূর্ণ সত্যের দীপ্তিতে দীপ্তিমান যিনি চিরন্তন সত্যকে বুঝে, সত্যকে দর্শন করে, সবার মধ্যে আপনাকে ও আপনার মধ্যে সবাইকে দেখতে পেয়েছেন। তিনি আর কোনো সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারেন না। তিনি সর্বকালের, সর্বমানুষের জন্যে প্রকাশিত হন লোকোত্তর মহামানবরূপে। এমন সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষেরা অসাধারণ ব্যক্তি। তাঁরা নিজেদের জ্ঞান-গরিমার দ্বারা মোহগ্রস্ত জগদ্বাবাসীকে সত্যপথের সন্ধান দেন। তাঁদের মহান প্রভাব, উপদেশ ও অনুকম্পায় জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়।

বর্তমান যুগে পূজ্য বনভন্তে মহোদয়ও একজন লোকোত্তর মহামানব যাঁর মধ্যে পরিপূর্ণ সত্যের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ভাসিত। যিনি চিরন্তন সত্যকে (চারি আর্যসত্য) অধিগত করে পূর্ণভাবে প্রকাশমান। তিনি একজন অরণ্যচারী অনন্য সাধক। সুদীর্ঘ এক যুগাবিধি সাধনার ফলশ্রুতিতে বৌদ্ধ সাধনার চরম লক্ষ্যে সিদ্ধি লাভে ধন্য হয়ে তিনি আপনাকে প্রকাশিত করেছেন মানুষের মধ্যে। তিনি যেমন দেশ-জাতি ও শ্রেণিভেদের এবং কালের সীমাবদ্ধ পরিচয়ের অন্তরালে আবদ্ধ নন, তেমনি কোনো ক্ষুদ্র প্রয়োজন সিদ্ধির প্রলুব্ধতায় তাঁর আত্মপ্রকাশ নয়। তিনি স্বয়ং নিখাদ সত্যকে উপলব্ধির মাধ্যমে আপনার মধ্যে স্বাইকে বিরাট হৃদয়ে গ্রহণ করে প্রকাশমান হয়েছেন। তাঁর ন্যায় সত্যদ্রষ্টা আর্যপুক্রষ পৃথিবীতে ডজন ডজন জন্মান না। হাজার বছরে একজনও জন্মান

কি না সন্দেহ। তিনি একাই একশো নন, একাই লক্ষ কোটি। সত্যকে অধিগত করার লক্ষে খ্যাতিলোভহীন নিষ্কাম সাধনায় তাকে কঠোর ত্যাগ ও অসহনীয় দুঃখ স্বীকার করতে হয়েছে। তাঁর মতো এতো ত্যাগ, এতো দুষ্কর সাধনা স্মরণকালের ইতিহাসে কোনো মহাজীবন ব্যক্তি স্বীকার করেছেন কি না জানা নেই। তাঁর অরণ্যচারী সাধনা কোনো আবেগতাড়িত চমক কিংবা কোনো ধর্মীয় গোঁড়মীর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ছিলো না। তাঁর সাধনা ছিলো নিখাদ সত্যকে উপলব্ধি করার সাধনা। তিনি সেই সাধনায় বিফল হননি। তিনি ভগবান বুদ্ধের প্রদর্শিত সত্যপথের অনুসরণে সত্যোপলব্ধিতে সফল হয়ে ধন্য হয়েছেন এবং নিজকে উদাহরণরূপে উপস্থাপিত করে অপরের কল্যাণার্থে মানুষকে দেখিয়ে গেছেন সত্যপথের সন্ধান। এর জন্য তাঁকে পদে পদে নানা প্রতিকৃল অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়েছে। তিনি সেসব প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে সত্যধর্মের বাণী প্রচার ও সদ্ধর্মের আলো বিতরণের মহান উদ্দেশ্য সাধনে সফল হয়েছেন।

বস্তুতপক্ষে পূজ্য বনভন্তের সাধনা ও সাধনা শেষে তাঁর সাধারণ সমাজে বৌদ্ধধর্মের মর্মবাণী ও ধর্মের মূলতত্ত্র প্রচারের কেন্দ্রভূমি হচ্ছে মূলত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। অবশ্য মাঝেমধ্যে সমতল অঞ্চলেও যেতে হয়েছে তথাকার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সাদর আহ্বানে। উল্লেখ্য যে, পূজ্য ভন্তের সাধনাকালীন থেকে পার্বত্য চউগ্রাম অঞ্চলে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হতে থাকে। কাপ্তাই বাঁধের ফলে এখানকার জনজীবনে নেমে আসে তাণ্ডবলীলা। হাজার হাজার পরিবার বাস্তহারা হয়ে পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি হারিয়ে অজানা ভবিষ্যতের পথে নামতে বাধ্য হন। বাঁধের ফলে তাদের বাড়িঘর, বিদ্যালয় ও জায়গা জমি. উপাসনালয় অতল জলে তলিয়ে যায়। এভাবে এক সর্বনাশা অবস্থার মধ্যে দিশেহারা জনগণ যে নিদারুণ দুঃখ-দুর্দশনার নিপতিত **হয়েছিলে**ন বর্ণনাতীত। ক্রমে রক্তাক্ত মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও পরবর্তীকালে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সংকটের এক পর্যায়ে শুরু হয় সশস্ত্র সংগ্রাম। সারা পার্বত্যাঞ্চলজুড়ে চলে যুদ্ধ। দন্দ্ব-হানাহানি. হত্যা-গুম. বহিরাগতদের দ্বারা জমি বেদখল, নিপীড়ন, নারী

নির্যাতন ইত্যাদি নারকীয় বর্বরতা। সুদীর্ঘ চার দশকব্যাপী এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখে এখানকার বৌদ্ধ জনসাধারণকে যে কী অমানবিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে তা ভাষায় বর্ণনাতীত। তৎকালীন এহেন প্রতিকূলতার পাশাপাশি তৎকালীন ধর্মীয় অবস্থা ছিলো নাজুক। যুগ যুগ ধরে প্রচলিত কতকগুলো ধর্মীয় আচার-আচরণ ব্যতীত বৌদ্ধ জনসাধারণের ধর্মের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে অজানা ছিলো এবং আচারসর্বম্ব ধর্মীয় কর্মকাণ্ড আচরণে সদ্ধর্মের ম্বরূপ জানা, উহার আম্বাদ লাভ করা থেকে দূরে ছিলো। অধিকন্তু ধর্মের নামে নানা কুসংস্কার প্রবিষ্ট হওয়ায় প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের স্বরূপটি জানা কঠিন হয়ে পডেছিল।

তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল অধিবাসী বৌদ্ধ জনসাধারণের উপরে বর্ণিত দুঃসহ অবস্থার প্রেক্ষাপটে পূজ্য বনভন্তের সম্মুখে সাধারণ জনসমাজে ধর্মের আলো বিতরণ করার মতো অনুকূল অবস্থা ছিলো না বলা যায়। তাঁর করুণা ও উদ্যমশীলতার কারণে তিনি এতদঞ্চলে সদ্ধর্মের আলোকশিখা প্রজ্জালন হয়েছিলেন। তিনি নিরলস প্রচেষ্টার ফলে ধর্মের গতানুগতিক ভাবধারা থেকে বৌদ্ধ জনসাধারণের ধ্যান ধারণাকে প্রকৃত বৌদ্ধধর্মীয় ভাবধারায় নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। বলা যায়, তিনি বৌদ্ধ জনমানসে সত্যধর্মের নব প্রাণপ্রবাহের সঞ্চার করেছেন। মোহগ্রস্ত মানুষের চেতনার নতুন উদ্যমের ধারণা বইয়ে দিয়েছেন। তিনি সিংহনাদে বুদ্ধের অমৃতময় মহাবাণী ও তথাগত বুদ্ধের সত্য ও জ্ঞানালোকের কথা প্রচার করে অসংখ্য নরনারীর মনে জ্ঞান চেতনার বীজ পুঁতে দিয়েছেন বললে অত্যুক্তি হয় না। তিনি ধর্মপিপাসুদের উদাত্ত কণ্ঠে শুনিয়ে গেছেন সত্য ও জ্ঞানচেতনার মুক্তধারার মর্মবাণী। মোহগ্রস্ত মানুষের মনোরাজ্যে সদা আঘাত হেনে আহ্বান জানিয়েছেন সকলকে পরম সুখ নির্বাণের পথে ধাবিত হওয়ার জন্যে সত্যাশ্রয়ী ও জ্ঞানাশ্রয়ী হতে। তিনি বরাবর 'আত্মোৎকর্ষ সাধনাই হচ্ছে ধর্মসাধনার চরম লক্ষ্য।' আত্মোৎকর্ষ মানে আপন উন্নতি আপন শ্রেষ্ঠতা লাভের সাধনা। কাজেই প্রত্যেকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জ্ঞানশক্তি অর্জনে যত্নবান হওয়ার জন্য যাতে ক্রমে সর্বোচ্চ স্তরে পৌছে গিয়ে বিবেকের পরিপূর্ণতা সাধনে অগ্ৰণী হতে।

বর্তমান চাকমা বৌদ্ধ সমাজে পূজ্য বনভন্তের অমূল্য

অবদান অপরিসীম। চাকমা জাতি যুগ যুগ ধরে বৌদ্ধধর্মের অনুসারী বটে কালের বিবর্তনে জাতীয় জীবনের উত্থান-পতনের ফলে ধর্মীয় ক্ষেত্রে শিথিলতা দেখা দেওয়ার এক পর্যায়ে চাকমা সমাজে ধর্মের নামে অনেক অন্ধ কুসংস্কার প্রবিষ্ট হয়েছিল এবং তাদের সমাজ জীবন ধর্মান্ধতার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছিল। যদিও চাকমারা বৌদ্ধধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হননি, তথাপি পারিবারিক ও সমষ্টিগত মঙ্গল কামনায় দেব-দেবীর উদ্দেশে নানা পূজা-অনুষ্ঠান, এমনকি পশুবলি দানের মতো বহু অন্ধ কুসংস্কারের প্রচলন হয়েছিল। নিকট অতীতে এসব পূজানুষ্ঠানের মতো পূজা-অর্চনা প্রচলনের সংকটাপন্ন সময়ে পূজ্য বনভন্তে স্বীয় লব্ধ জ্ঞান, মহানুভবতার গুণে চাকমা সমাজের বৌদ্ধ ধর্মীয় আদর্শ অনুশীলনে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বর্তমান সময়ে চাকমা সমাজের ওইসব লালিত অন্ধ কুসংস্কার ও কল্পিত দেব-দেবী পূজার প্রায় নেই বললে চলে। চাকমা সমাজে ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কারের বেলায় পূজ্য বনভন্তের মহৎ অবদানের কথা বলে শেষ করা যাবে না।

পূজ্য বনভন্তের আবির্ভাবে শুধু চাকমা সমাজে নয় বাংলাদেশের বৌদ্ধ সমাজে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তিনি সদা উপদেশ দিয়ে বলেছেন, ইহকাল-পরকাল সুখ লাভের জন্যে ধর্মসাধনা। সুখ ও মঙ্গলকামী হয়ে যাতে আপন পরিহানি না হয় তজ্জন্য সত্যাম্বেষী হওয়া। তিনি বলতেন সত্য-মিথ্যা পরীক্ষা কর। যা সত্য গ্রহণ করো, মিথ্যা হলে পরিত্যাগ করো। সুপথ-কুপথ চিনে লও, ভালো-মন্দ যাচাই কর। পরস্পর বলাবলি কর য়ে, আমরা বুদ্ধের শাসন গভীরভাবে বিশ্বাস করবো ও একাগ্রভাবে মেনে চলবো। আমার এসব উপদেশ মতো চলতে পারলে জীবনে মঙ্গল, উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হবে। কিছুতেই পরিহানি হবে না। আমাকে উপলক্ষ করে যেসব পুণ্যকাজ করছো সেগুলো বৃথা যাবে না। আমি ফাঁকি দেব না।

পূজ্য বনভন্তের দর্শন লাভ ও তাঁর উপদেশে জ্ঞানহারা ও সদ্ধর্মহারা নর-নারী পেয়েছেন জ্ঞান ও সত্ত্যের সন্ধান। অসাধু হয়েছেন সাধু, কৃপণ হয়েছেন দাতা, মূর্য হয়েছেন পণ্ডিত, দীনহীন হয়েছেন সামর্য্যবান, রোগী হয়েছেন সুস্থ, স্বল্পায়ু হয়েছেন দীর্ঘায়ু, কত শতনর-নারীর আপন অভীষ্ট সিদ্ধি হয়েছে তা তারা নিজেরাই জানেন। পূজ্য ভত্তে দশবল বুদ্ধের শাসন

রক্ষা, এর স্থিতি, বিস্তার ও শ্রীবৃদ্ধির জন্যে যা যা করণীয় সে-বিষয়ে সদা সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর উপদেশ শ্রবণ ও তাঁর মহান প্রভাবে শত শত যুবক, প্রৌঢ়, এমনকি বয়স্ক ব্যক্তি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ধর্ম সাধনায় রত হয়েছেন। ইতোমধ্যে পার্বত্যাঞ্চলের প্রতিটি এলাকায় সুরম্য বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে শত শত ভিক্ষু শ্রমণ স্বীয় ধর্মসাধনার পাশাপাশি জনসমাজে ধর্মীয় নীতি-আদর্শ প্রচারে নিরত রয়েছেন। বলা বাহুল্য যে, পার্বত্যাঞ্চলে তথা বাংলাদেশের বাইরেও পূজ্য ভন্তেকে উপলক্ষ করে অনেক বিহার প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পবিত্র ত্রিপিটক গ্রন্থ হচ্ছে বৌদ্ধধর্মের মূল আধার, ত্রিপিটক সংগ্রহ, অনুবাদ ও প্রচারের জন্য পূজ্য ভন্তে খুবই গুরুত্ব দিতেন। ইতোমধ্যে অত্র রাজবন বিহারে ত্রিপিটক গ্রন্থ সংগৃহীত হয়েছে। এর বেশ কিছু খণ্ডও অনুবাদ করে প্রকাশ করা হয়েছে। রাজবন বিহারে অফসেট প্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বই ছাপানো কাজ অনেক সহজ হয়েছে।

পূজ্য বনভন্তের অবদানে পার্বত্যাঞ্চলে তথা সারা বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় জীবনে নতুন প্রাণপ্রবাহের সঞ্চার হওয়ার পাশাপাশি সত্যধর্ম জানার আগ্রহ দিন দিন বেড়ে চলেছে এবং নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে বহু গুণী-জ্ঞানী, কূটনীতিক, রাজনীতিবিদ এবং স্বনামধন্য অনেক বিদেশি ভিক্ষু তাঁর দর্শনার্থী হয়ে এখানে শুভাগমন করেছেন। তাঁরা এদেশের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কর্মকাণ্ড স্বচক্ষে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। এটি আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ নীতির বহিঃপ্রকাশের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, পূর্বে এই পার্বত্যাঞ্চলের কোনো জায়গায় কোনো আর্যপুরুষের পদার্পণ হয়েছে বলে জানা নেই। অধুনা সেই জায়গায় পরম পূজ্য মহান আর্যপুরুষের জন্ম ও পদচারণা, তাঁর সেবা-পূজা ও হিতোপদেশ লাভ করা ও ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে অনুসরণ ও অনুশীলনের প্রবল জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এক কথায় এখানে বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণের শুভ লক্ষণ সূচিত হয়েছে। পূজ্য ভন্তে 'সুদৃষ্টি' ও 'সুত্ত-নিপাত' নামক দুটি ধর্মীয় পুস্তক স্বয়ং প্রণয়ন করেছেন। উক্ত দুটি পুস্তক প্রকাশ হওয়ায় জনসমাজে ধর্মীয় প্রকাশনা কাজে উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে অনেক ভিক্ষু শ্রমণ ও ধর্মপিপাসু অনেক ব্যক্তি ধর্মীয় প্রকাশনা কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। মোটামুটি বলতে গেলে পুজ্য বনভন্তের আবির্ভাবে ধর্মীয় জাগরণের ফলশ্রুতিতে জনসমাজে নৈতিক উন্নতির যে ধারা সৃষ্টি হয়েছে তা ভাবীকালেও অব্যাহত থাকবে বলে সবার প্রত্যাশা। পূজ্য বনভন্তের আবির্ভাবে ধর্মে উন্নতি ও ভিক্ষুসংঘের সম্মানসৎকার যে বৃদ্ধি পেয়েছে তা অনস্বীকার্য। তাই পার্বত্যাঞ্চলের সর্বত্র পূজনীয় সংঘের দিক-নির্দেশনায় এখানকার বৌদ্ধ সমাজে ধর্মীয় আলো অধিকতর বিস্তার লাভ হবে, এটিই কাম্য।

পার্বত্যাঞ্চলের চাকমা জাতি তথা বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গৌরবরবি পূজ্য বনভন্তের প্রদর্শিত ধর্মীয় আদর্শে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হোক। ■

> 'জয়তু বুদ্ধসাসনম্!' 'জয়তু বনভন্তে!'

* লেখক পরিচিতি : সুনীতি বিকাশ চাকমা (সক্ক), প্রাক্তন সভাপতি, রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটি, রাঙামাটি।

আমাদের সমাজ এবং ধর্ম

প্রিয় কুমার চাকমা

সমাজ

সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় 'সমাজ' বলতে একটি জনগোষ্ঠীকে বোঝায়, যারা একাধিক পরিবারের জনবসতি নির্দিষ্ট ভূ-আয়তন বা সীমানায় সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করে, সকল জনগোষ্ঠী একই রীতিনীতি এবং ক্রিয়াকলাপ দ্বারা পরিচালিত হয়, তাদের পরস্পর পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, ভাবের আদানপ্রদান অক্ষুন্ন থাকে. একটি পরিবারের সঙ্গে অপরাপর সকল পরিবারের মধ্যে নিবিড় বন্ধন রচিত হয়. তাকেই বলা হয়ে থাকে সমাজ। এক একটি সমাজ এক একটি সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর আবাসস্থলকে পাড়া, মহল্লা, গ্রাম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। এভাবে পাশাপাশি প্রতিবেশী পাড়া বা গ্রামে বসবাসকারী পরিবারগুলোর সঙ্গে একই ভাবধারা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি বিদ্যমান থাকে, পারস্পরিক যোগাযোগ এবং ভাবের অমলিন সেতুবন্ধন রচিত হয় তাকে বলা হয় বৃহত্তর জনসমাজ। বৃহত্তর জনসমাজই পরিণত হয় জাতিতে, যে জাতির ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, উপলব্ধি, অনুভূতি সকল মানসিক চেতনাই এক এবং অভিন্ন হয়ে থাকে।

সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজের বিভিন্ন সংজ্ঞা, বিভিন্ন উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। আর. এম. ম্যাক্যাইভারের মতে, "সমাজ হলো সামাজিক সম্পর্কাদির সমষ্টি যেগুলোর ভেতরে এবং যেগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা জীবন যাপন করি।" আরেক সমাজবিজ্ঞানী জি. ওসিপভ-এর মতে, "সমাজ হলো আইন, প্রথা, ঐতিহ্য ইত্যাদির দ্বারা সমর্থিত বৃহৎ জনদলগুলোর সামাজিক সংযোগ এবং সামাজিক সম্পর্কাদির একটি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ব্যবস্থা যা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় বিকশিত, নির্দিষ্ট উৎপাদন-ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং মানুষের প্রগতিশীল বিকাশের একটি স্তর হিসেবে মূর্ত্ত।" সুনির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমারেখা দ্বারা চিহ্নিত না হলে একটি জনগোষ্ঠীকে একটি সমাজ

হিসেবে চিহ্নিত করা কঠিন। (সূত্র : সমাজবিজ্ঞানের প্রত্যয়, হাসানুজ্জামান চৌধুরী, সমাজকাঠামো, ষষ্ঠ অধ্যায়)। আমরা কোন ধরনের সমাজ কামনা করি এ প্রশ্নের সহজ জবাব হলো, আমরা একটি সুন্দর সমাজকাঠামো চাই। সুন্দর সমাজের স্বরূপ কেমন হয়? তার জবাবেও বলতে হয় সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধশালী, স্লেহ-মমতাপূর্ণ, আন্তরিকতা, ভালোবাসায় ভরা, একের দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত ব্যবস্থার কাঠামোর কামনাই হচ্ছে কল্যাণকামী সমাজ।

ধর্ম

ধর্ম বলতে যা বোঝায় তা হলো, একটি জনগোষ্ঠী একই ভাবধারায় পরিচালিত হয়ে একই মত. একই দর্শন অন্তরে ধারণ করে তার লালনপালন এবং আচরণীয় কর্তব্যরূপে নিয়ত প্রতিপালন করে সেটিই ধর্ম। এ অর্থে সেটি বৌদ্ধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম, ইসলাম ধর্ম, সনাতন ধর্ম বা অন্য যেকোনো মতাদর্শের ধর্ম হতে পারে। সাধারণভাবে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর সমভাবে আচরিত ও নিয়ত কর্মই হচ্ছে ধর্ম। আমরা সাধারণভাবে পুণ্য বা কুশল কর্মকেই ধর্ম বলে গণ্য করে থাকি। আসলে তা সঠিক নয়, গণমানুষের সামগ্রিক এবং প্রাত্যহিক আচরিত কর্মই ধর্ম। যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায়. একজন শিক্ষার্থী তার স্কুল. কলেজ. বিশ্ববিদ্যালয় যেকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের জন্য সুদীর্ঘকাল যাবৎ শিক্ষা গ্রহণের জন্য একনাগাড়ে একটি শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োজিত থাকে। এ সময় সে বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যয়ন করতে কঠোর ত্যাগ, কঠোর অধ্যবসায় করতে হয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে এক ধরনের ধ্যান-সাধনা-ব্রতময় জীবন অতিবাহিত করতে হয়। এ সময়ে যেহেতু সে এক বা একাধিক বিষয়েই অধ্যবসায়ে নিয়োজিত থাকে তখন সেটিই হয় তার আচরিত ধর্ম। ওই শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করতে তার জীবনের প্রায়

এক-তৃতীয়াংশ সময়ই পেরিয়ে যায়। একজন মানুষের স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল আমরা পঁচাত্তর বছরও যদি হিসাব করে থাকি সেক্ষেত্রে ন্যুনতম পঁচিশ বছর বয়সের কিছু আগে বা পরে শিক্ষা জীবন শেষ করে। এ বিগত জীবনে কোনো ছাত্র শিক্ষাদর্শনে নিয়োজিত থাকাকালীন যতই নিজেকে নিবিষ্ট মনে ধরে রাখতে সমর্থ হয় ততই তার শিক্ষালব্ধ জ্ঞান সমৃদ্ধি লাভ করে যা পরবর্তী জীবনে সে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজের, পরিবারের এবং প্রজন্মের জন্য উন্নয়নের আলোকচ্ছটা ছড়াতে সমাজ, জাতি এবং দেশের জন্য মঙ্গল, কল্যাণ তথা সমৃদ্ধি বয়ে এনে দিতে পারে। আর যে শিক্ষার্থী তার দর্শনশিক্ষা গ্রহণকালে কঠোর অধ্যবসায় ব্যতিরেকে শুধু শুধু সময় ব্যয় করে সুদীর্ঘদিন ধরে একটি বিষয়ের পেছনে মহামূল্যবান সময় অযথা ক্ষেপণ করেও কোনো সুফল লাভ করতে পারে না, এতে তার জীবনের মূল্যবান সময়গুলো অযথা নষ্ট হয়ে যায়। পরিণামে তার কোনো কিছুই আয়ত্তে আনা সম্ভব হয় না এবং তার জীবনে মূল্যবান সময়গুলো নষ্ট করেছে তা একেবারে মাটিতে মিশে যায়। এভাবে একটি সমাজের, জাতির সর্বোপরি দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভের জন্য সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাদের জীবনকে নিয়োজিত রাখে। তাদের নিয়োজিত জীবন স্বাচ্ছন্দ্য, বাঁধাহীন করতে তার পেছনে লেগে মাতা, ভাইবোন এবং নিকট থাকেন পিতা, আত্মীয়স্বজন। একজন শিক্ষার্থী তার অভীষ্ট লক্ষ্যে না পৌছা পর্যন্ত কঠোর সাধনা বা ব্রতপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করতে থাকে। সে যতক্ষণ তার সাধনায় মগ্ন থাকে তখন সেটিই হলো তার আচরিত ধর্ম।

আমাদের সমাজ

যে কথার মূলে আসতে গিয়ে ভিন্নতর উপমা দেয়া হলো, সে উপমার প্রসঙ্গ ধরে লেখার প্রাসঙ্গিকতা। প্রথমে আসা যাক সমাজ সম্পর্কে, আমাদের সামাজিক কাঠামো এবং সমাজব্যবস্থা আজ কোন অবস্থায়? তার সহজ উত্তরেও বলা যায়, বর্তমান সামাজিক কাঠামো বা সমাজব্যবস্থা মোটেও সুখকর নয়। সমাজে চলছে বর্তমানে বড়ই আকাল। সমাজের প্রতিটি স্তরে স্তরে যে সকল বিন্যাস থাকে, সেগুলো বর্তমানে একেবারেই অনুপস্থিত। আজকাল সমাজ, সামাজিক ক্রিয়াকলাপগুলো চলছে যেন সম্পূর্ণ প্রাণহীন। কোনো রকমেই দায়সারা গোছের। সামাজিক কর্মগুলো

সাধারণের মন অন্তরকে মোটেও ছুঁতে পারছে না। সর্বত্র যেন কৃত্রিমতার ছাপগুলো সুস্পষ্ট, যেকোনো রকমের দায়সারা গোছের চলছে। আজকাল মানুষের সমাজের প্রতি আস্থাহীনতার কারণে সমাজ নির্ভরশীলতার স্তম্ভগুলো ক্রমে ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভেঙে পড়ছে, যা আমাদের জন্য মোটেও শুভ নয়। এমনতর অবস্থা হতে সমাজ যেমন শক্ত ভিত রচনা করতে পারে না, তেমনি প্রজন্ম, জাতিও শক্তিশালী কোনো অবস্থান গ্রহণ করতে পারে না। আগের তুলনায় সমাজে অসহিষ্ণুতা, পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষগুলো বেশ দৃশ্যমান এখন।

গত এক দুই দশক আগের সমাজব্যবস্থা এবং সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে বর্তমানের বিস্তর অমিল। সমাজের প্রতিটি মানুষ কেবল আত্মকেন্দ্রিক হয়ে সম্পূর্ণ ব্যক্তিক হয়েই আছেন। একতাই বল, একতাই শক্তি— এ শ্লোগান শুধু শ্লোগান হয়েই আছে। সামাজিক নেতৃত্ব, সামাজিক কর্তৃত্ব বা সামাজিক প্রভাব বলয় কোথায় যেন হারাতে বসেছে। একসময়ের সামাজিক ক্রিয়াকর্ম কী সুন্দর উৎসাহ-উদ্দীপনায় চালিত হতো। ছেলে, বুড়ো, যুবক, যুবতী হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার, করার যে সুন্দর প্রবণতা সেসব আজকাল আর লক্ষ করা যায় না। এসব বিষয় সাধারণ মানুষ ভাবছেন না তা কিন্তু নয়, সকলেই এ সম্পর্কে যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা করছেন, কিন্তু কোনো কুলকিনারা করতে পারছেন না। কেউ সেসবের সমাধানের উপায়ও খুঁজে পাচ্ছেন না। ফলে মানুষের মনে হতাশা, ভীতি আর অনিশ্চিত জীবন ভাবনায় অধীর করে তুলেছে। সবাই অনুভব করছেন এর থেকে উত্তরণ ঘটানো জরুরি, কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?

বর্তমানে সমাজের প্রতিটি মানুষ এমনকি একজন শিশুও উপলব্ধি করতে সমর্থ হচ্ছে আজকাল জীবন কেমন চলছে, এ জীবন কারো কাম্য কি না? নিঃসন্দেহে বলা যায়, কোনোক্রমেই কাম্য নয় এ জীবন। তাহলে আমরা কোন ধরনের সমাজ চাই? কেমন সমাজ জীবন আমরা কামনা করি? তারও এক কথায় জবাব হবে, আমরা সুন্দর সমাজ, সুন্দর সমাজজীবন দেখতে চাই, পেতে চাই। এ প্রত্যাশা শুধু কারো একার নয়, এ প্রত্যাশাটুকু আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে সবারই। কিন্তু তার পরেও আমরা পারি না কেন সুন্দর সমাজ গঠন করতে, কোথায় তার গলদ? এ প্রসঙ্গে

উল্লেখ করতে হয়, বর্তমান সমাজব্যবস্থা মারাত্মক কুঁকিপূর্ণ অবস্থায় চলছে। বিভিন্ন নেতিবাচক অনুষঙ্গগুলো আমাদের সমাজের চতুষ্পার্শে ঘূর্ণায়মান থাকায় সামাজিক মূল ভিত্তিগুলো দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে হতে নুয়ে পড়ার অবস্থায় পৌঁছেছে, যা সবার জন্য অশনি সংকেতও বলা চলে।

সমাজে বর্তমানে অসহিষ্ণুতা, অস্থিরতা প্রচণ্ডভাবে বিরাজিত থাকায় ক্ষমা মৈত্রীগুলো স্থান নিতে পারছে না। স্বার্থপরতা, হিংসা, বিদ্বেষভাবগুলো আমাদের অনেক সাফল্যকে অনিশ্চিত করে তুলছে। একটি আদর্শ সমাজব্যবস্থা পরিচালনার জন্য যেসব ক্ষেত্রগুলো অত্যাবশ্যক, সেসব বর্তমানে অনুপস্থিত বা লক্ষণীয় নয়। একটি আদর্শ সমাজব্যবস্থা পরিপূর্ণভাবে চালু করতে একটি বলিষ্ঠ ও আপোষহীন নেতৃত্ব থাকা চাই, যে নেতৃত্বে রয়েছে সততা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, আর সবার প্রতি নির্মল ভালোবাসা, যে নেতৃত্বে চেইন অব কমাভ থাকা চাই। ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত এবং নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত একই সূত্রে পরিচালনাকেই তো আমরা চেইন অব কমাভ বলি।

সভ্যতা যতই এগিয়ে যাচ্ছে, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি যতই নিত্য নতুন আবিষ্কার করছে, আমাদের সমাজ ততই পিছিয়ে যাচ্ছে এবং মানুষের সমাজ নির্ভরশীলতা হ্রাস পাচছে। বর্তমান সমাজ কাঠামো কেন দুর্বল বা কোন কোন অবস্থায় দুর্বল সেসব দুর্বল দিকগুলো কারোর অজানা থাকার কথা নয়। প্রথমত আমরা কেন সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করি? এ প্রশ্নের উত্তর সহজ ভাষায় দিতে গেলে বলতে হয় আমাদের পরস্পর পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান, স্নেহ-ভালোবাসার ভাব বিনিময়, একের সুখে-দুঃখে অপরে পাশে থাকার, একের আপদে-বিপদে অপরাপর সকলকে পাশে পাবার মনের আকুলতাই কিন্তু সমাজ। সমাজ সকল মানুষের কুশল, সুখ, কল্যাণ, উন্নতি সর্বোপরি নিরাপত্তা সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করে থাকে।

সচরাচর মানুষের সুখের মুহূর্তে সমাজ কিন্তু তেমন ভূমিকা পালন করে না, মানুষের দুঃসময়েই সমাজ তার ভূমিকা পালনের জন্য তৎপরতা চালায়। যেমন উদাহরণস্বরূপ সমাজভুক্ত একটি পরিবারে নিকট আত্মীয়ের বিয়োগান্তক ঘটনা ঘটেছে, অথবা কেউ দুর্ঘটনা কবলিত হয়েছে, অথবা কেউ কঠিন রোগাক্রান্ত হয়েছে, অথবা অন্যভাবে বিপদগ্রস্ত হয়েছে, এ অবস্থায় সমাজের সকলে কোনো বাছ-বিচার না করে সদলবলে হাজির হয় দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারের গৃহে। অপরদিকে সমাজের কোনো পরিবারের সুখের মুহূর্তে যেমন জন্ম অনুষ্ঠান, বিবাহ অনুষ্ঠান বা পারিবারিক কোনো উৎসব, পার্বণে আয়োজক পরিবার থেকে সমাজের যাদের বা যাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় সে বা তারাই যায়। বিনা আমন্ত্রণে সে-সময় ওই পরিবারে যাওয়াটা হয় একেবারেই কদাচিৎ।

এ সময়ে সমাজের কোন ব্যক্তি, পরিবার বা পারিবারিক সদস্যমণ্ডলী আমন্ত্রণলাভী না হলেও তেমন কিছুই মনে করে না। বরং এ ভেবে অন্যান্যরাও মনে প্রীতি বোধ করে যে, সমাজের একটি পরিবার আজ সুখের আলম্বন উপভোগ করছে। তবে সেখানে একটি শর্ত থাকে, যে পরিবার আনন্দ, উৎসব করছে সে পরিবারের উৎসব আনন্দের বদৌলতে যেন সমাজের মান-সম্মান বা ইজ্জত বিনষ্ট না হয়। একটি পরিবারের আনন্দঘন পরিবেশের বিপরীতে যদি সমাজের মান-ইজ্জতের কুপ্রভাব পড়ে তাহলে সে পরিবারকে সমাজের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। এ হলো আদর্শ সমাজের মৌলিক কাঠামোর স্বরূপ। বর্তমান সমাজ কাঠামোর সঙ্গে অতীতের সামাজিক কাঠামোর রয়েছে বিস্তর ফারাক। পনেরো বা বিশ বছরের পরের সমাজ আরও অধিক সুসংহত, আরও অধিক গতিশীল হওয়ার কথা, অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয় আামাদের সমাজ সে কাঞ্চ্চিত লক্ষ্যে পৌছাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে একটি কথা বিনয়ের সঙ্গে স্বীকার করবো যে সমাজ বা সামাজিক কাঠামোর উন্নতি বা অবনতির সূচক পরিমাপের জন্য আমার কিন্তু প্রমাণিত কোনো বাহন বা মাধ্যম নেই। সম্পূর্ণ বায়বীয় এবং অনুমানভিত্তিক মুক্তচেতনায় ধারণকৃত অভিজ্ঞতার প্রতিফলন মাত্র। আমার মতো যারা এসব বিষয় নিয়ে ভাবেন, চিন্তা করেন তারাও এ যুক্তির সঙ্গে সুর মেলাবেন অবশ্যই, অপরদিকে তাদের পক্ষেও সম্ভব হবে না এসবের সূচক নির্ণয় করে একটি সম্পূর্ণ প্রমাণিত সত্য উপস্থাপন করা।

এক কথায় বলা যেতে পারে অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসায় পড়ে থাকা একজন রোগীকে আমরা যেমন তার বাঁচা মরা নির্ধারণ করি তার শ্বাস-প্রশ্বাস দেখে, কিন্তু কী রোগ বা তার রোগের মাত্রা কতটুকু তা নিরূপণ করা যেমন সম্ভব হয় না তেমনি সমাজের কাঠামো বিন্যাসের অবস্থান নিরূপণ করাও খোলা চোখে একেবারেই অসম্ভব।

সমাজকাঠামো শক্তভাবে গঠনের দ্বারা একটি সমাজের মঙ্গল, উন্নতি, কল্যাণ এবং শ্রীবৃদ্ধি যেমন হয়, তেমনিভাবে দুর্বল সমাজকাঠামোর কারণে বিপরীত ফল লাভ হয়। একসময় সমাজে একক বা দৈত নেতৃত্ব দারা সামাজিক ক্রিয়কলাপ পরিচালিত হতো। সমাজের প্রতিটি সদস্য-সদস্যা নেতৃত্বের ভরসায় ও নেতৃত্বের অনুশাসনে চালিত হতো। সমাজের সকল ক্ষেত্রে সবার দায়িত্ব-কর্তব্য প্রতিপালনের নিয়ম প্রচলিত থাকতো। সামাজিক রীতিনীতি অনুসরণে সমাজব্যবস্থাগুলো সুন্দর, সুচারুভাবে চালিত হতো। সমাজে বিশৃঙ্খলা, অন্যায় কর্ম বা অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ তেমন মাথাচাডা দিয়ে উঠতে পারতো না। এরপরও অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ চালিত হতো না তা কিন্তু নয়, তবে যা হতো তা খুবই সীমিত পর্যায়ে, যা অতি সহজেই মেটানো যেতো। সে-সময়ে মানুষের চাহিদা ছিল অত্যন্ত সীমিত আর সাদামাটা, অল্পতেই তুষ্ট থাকতো সবাই। সবার অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্তিশালী না হলেও আধুনিক ও বিলাসী জীবনযাপনকারী যুগের মতো মানুষ অসুখী ছিল না এবং তাদের মনে লোভ-হিংসা ছিল না, ছিল না কোনো রাগ, দ্বেষ, মোহ। সবার মন ছিল সাদা ও পবিত্রতায় ভরপুর।

বর্তমান যুগে সময়ের ব্যবধানে সমাজেও এসেছে আমূল পরিবর্তন, লাগামহীন চাহিদা আর ভোগবিলাসীতার দাপটে কৃচ্ছুতার নীতি বা সংস্কৃতি সম্পূর্ণ উধাও হয়েছে। সমাজের মানুষের শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতি, মন-মানসিকতা বদলেছে। সময়ের তাগিদে কৃষ্টি, সংস্কৃতি বদলেছে, সেই সঙ্গে বদলেছে রুচিবোধের আর চাহিদার। আধুনিক যুগের সামাজিক মানুষের ধ্যানধারণা এবং প্রেক্ষাপট সবকিছুই এখন ভিন্ন। একেই বলে সামাজ-বিবর্তন, যে বিবর্তনে এক একটি প্রজন্মের নানা কৃষ্টি, সংস্কৃতির নতুন নতুন রূপ লাভ করে।

ধর্মীয় অনুশাসন এবং প্রভাব

এ তো গেল সমাজ, আলোকপাত করি ধর্ম নিয়ে, ধর্ম কী এবং ধর্মের স্বরূপ কেমন ধরনের? সচরাচর আমরা 'ধর্ম' বলতে কুশল কর্মে নিয়োজিত থাকার কর্মকেই ধর্ম বলে জানি বা মনেপ্রাণে ধারণ করি। আমি আগেই বলেছি 'ধর্ম' বলতে মানুষের ব্যক্তিগত বা সংঘবদ্ধভাবে আচরিত কর্মকেই 'ধর্ম' বলা হয়ে থাকে। ধর্ম সাধারণত যেকোনো দর্শনকে আঁকড়ে ধরে তাকে নিবিষ্ট মনে ধারণ, লালন এবং প্রতিপালন করার ক্রিয়াকর্মগুলোকেই অভিহিত করে থাকি। এ ক্ষেত্রে মানবজাতির বা মানবসমাজের যে গোষ্ঠী যে মত বা দর্শনকে বিশ্বাস করে এবং আচরণ, লালন, অনুসরণ, অনুশীলন করে সেটিই হচ্ছে তার বা তাদের ধর্ম।

এর উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, হযরত মুহম্মদ (সাঃ) প্রচারিত এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইসলাম ধর্ম, যীশু খ্রিষ্ট প্রবর্তিত খ্রিষ্টান ধর্ম, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রবর্তিত সনাতন ধর্ম এবং তথাগত সম্যুকসমুদ্ধ প্রচারিত ও প্রবর্তিত ধর্ম বা বৌদ্ধধর্ম। আরও একভাবে ব্যাখ্যা করে বলা যেতে পারে ইসলাম দর্শন, খ্রিষ্টান দর্শন বা অন্যুদর্শনগুলোর প্রতি মানুষ যে দর্শনে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, সে দর্শনই তাদের প্রভাবিত করে এবং প্রভাবিত দর্শনই সেসব মানব সমাজ বা গোষ্ঠীর জন্য অন্যতম ধর্ম হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এভাবে সারা বিশ্বময় এসব ধর্মের প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষিত হয়।

একটি দর্শনকে সংঘবদ্ধভাবে যাদের দ্বারা লালিত, প্রতিপালিত হয় তারই প্রভাব সমাজে বিস্তৃতি ঘটে। যে দর্শনের প্রতি যত মানুষ আকর্ষিত হয় সে দর্শনের প্রভাব আরও অধিক বৃদ্ধি পায় এবং তা ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে একটি নির্দিষ্ট স্থান হতে ক্রমান্বয়ে আরও অন্য স্থানে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের মধ্যে নীতিগত অনেক তফাৎ এবং তার ফলাফলও বিপরীত হয়। একটি দর্শন কোনো কাজকে নীতিগতভাবে নিষিদ্ধ বা বারণ করে থাকে অপরদিকে অন্য ধর্মে বারণের পরিবর্তে সেসব কাজে নিবেদিত হতে উৎসাহ এবং প্রেরণা যোগায়। এ ক্ষেত্রে কোন দর্শনটি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং কোন দর্শনটি গুরুত্বহীন সেটি বিবেচ্য নয়. এক বা একাধিক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাছে অগ্রহণযোগ্য হলেও অধিকাংশ জনগণের মনকে আকর্ষণ করতে পারে এমন নীতিবোধের স্থান করে নিতে পারে সেটিই দর্শন এবং সেটিই ধর্ম। যে দর্শন বা ধর্ম যতই মানুষের মন-অন্তরকে কাছে টানতে পারে, মানুষের মনে স্থায়ীভাবে আসন প্রতিষ্ঠিত করতে পারে সেটিই ক্রমাগত বিকশিত হতে পারে।

কাজেই দর্শনের প্রভাব বিস্তারের পেছনে থাকে তার প্রচার, প্রসার এবং নীতি, আদর্শ, সর্বোপরি তার যৌক্তিক ও প্রমাণিত ভিত্তি। প্রতিটি দর্শন বা ধর্ম কতগুলো মূল নীতি ও স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, যে নীতি এবং স্তম্ভগুলোকে ভর করে মানবসমাজের মানসিকতাগুলোকে চালিত করে। শুধু ভাব এবং অনুমান দ্বারা কোনো দর্শন নীতিগতভাবে টিকে থাকে না বা থাকতে পারে না। দর্শনের মূল ভিত্তিগুলো হলো যুক্তি, প্রমাণ এবং তার আচরণ, অনুশীলনের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং একইভাবে যাদের দারা ধারণ, বাহন এবং পরিচালনার কাজ চালিত হয় তাদের দ্বারাই সে দর্শনটির ভিত অধিকহারে গভীর হতে গভীরতর স্থানে প্রোথিত হয়। একটি মতবাদ বা দর্শনকে যতই নিবিষ্টভাবে, নৈতিকভাবে, আদর্শগতভাবে লালন-প্রতিপালন করা সম্ভব হবে ততই তার বিকাশ উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হতে থাকবে। অনেক ক্ষেত্রে সুন্দর আদর্শ এবং সর্বোচ্চ যৌক্তিক প্রমাণিত বা একমাত্র সত্য বলে নন্দিত হলেও উপযুক্তভাবে লালন এবং ধারণের অভাবে সেগুলোর অস্তিত্ব রক্ষা বা বিকশিত হয় না বা স্থান সুদৃঢ় করতে সমর্থ হয় না। এজন্য সুদক্ষ নেতৃত্ব, যৌক্তিক আলোচনা, নির্ভুল ব্যাখ্যা এবং মানুষের মনের গভীর থেকে গভীর স্থানে প্রতিস্থাপন করতে পারাটাই তার সার্থকতার সন্ধান লাভ করে।

পার্বত্যাঞ্চলের বৌদ্ধধর্ম এবং তার অতীত বর্তমান

আমরা পার্বত্যাঞ্চলে বসবাসকারী মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেক সংখ্যক বৌদ্ধদর্শন মতাদর্শী বা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। যদিও বা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী কিন্তু একসময় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ছিল না বললেই চলে। ষাটের দশকে পরম শ্রদ্ধেয় রাজগুরু শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাস্থবির সুদূর মায়ানমার (বার্মা) থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তিনি রাঙামাটি রাজ বিহারে বিহার অধ্যক্ষ হিসেবে আসীন হন। তিনি পার্বত্য এলাকার বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে নতুন উদ্যমে অনুপ্রাণিত করতে থাকেন। তাঁর পার্বত্য এলাকায় সদয় উপস্থিতি এবং ধর্মীয় জ্ঞানসমৃদ্ধ প্রচারণা কাজে সম্পুক্ততার পর পার্বত্য এলাকার বৌদ্ধদর্শন বা বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ঘটতে থাকে। তাঁর সান্নিধ্যে বৌদ্ধধর্ম বিকশিত অবস্থায় সত্তর দশকে পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তের আবির্ভাব পার্বত্য এলাকার বৌদ্ধ আকাশ হঠাৎ আরও অধিক উজ্জল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সুদীর্ঘদিন তিনি বৌদ্ধধর্মের ধ্বজা ধরে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার বিশেষ করে রাঙামাটি এবং খাগড়াছড়িতে নব দিগন্তের সূচনা

করেন। মানুষের মনের আমূল পরিবর্তন ঘটতে লাগলো। এ সময়ের বৌদ্ধ ধর্ম যেন সম্পূর্ণ এক নতুনভাবে পরিচিতি লাভ করলো। বৌদ্ধদর্শন এবং বৌদ্ধধর্মের অনুসারী সকলেই আকৃষ্ট হলেন এ মহামানবের ধর্মীয় চেতনায় এবং ভাবধারায়।

রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি জেলা ছাড়িয়ে সারা দেশময় এমনকি ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম, অরুণাচল, কোলকাতাসহ যেখানে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রয়েছেন তাদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে পরম পূজ্য বনভন্তের প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে প্রচারিত বৌদ্ধর্ম। এ ছাড়া এদেশের নাগরিক বৌদ্ধদর্শন বা বৌদ্ধধর্মের অনুসারী যারা বিশ্বের নানা দেশে অবস্থান বা বসবাস করছেন তাদের মধ্যেও পরম পুজ্য বনভন্তের প্রভাবিত এবং প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। এর ফলে পূজ্য বনভন্তের প্রভাব বলয় সৃষ্টি হয় বিশ্বের নানা দেশে। এর পেছনে যে কারণটি ছিল তা হলো পূজ্য বনভন্তে পার্বত্যাঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার এবং প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি গড়ে তোলেন এক বিশাল শিষ্যমণ্ডলী. সেই সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে নির্মিত হয় শাখা বনবিহার যার বর্তমান সংখ্যা শতাধিক। এসব শিষ্যমণ্ডলী বিভিন্ন সময় দেশে-বিদেশে বিশেষ করে ভারত, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনামে এর প্রভাব বিস্তৃত করেছে যা আজ অবধি বহাল আছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোতে পূজ্য বনভত্তে প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম কেমন প্রভাব বিস্তার লাভ করেছে সেটি বড কথা নয়, সবচেয়ে বড় কথা হলো বাংলাদেশের সমগ্র বৌদ্ধজাতিকুলে সমানভাবে প্রভাব বিস্তার লাভ করেছে, সে-কথা নতুন করে উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

তিনি বৌদ্ধর্মকে নতুনভাবে পরিচিতি এনে দিতে সক্ষম হন। বুদ্ধের শিক্ষা, বুদ্ধের উপদেশবাণী, নীতি, আদর্শ, গুণাবলি সকলের মনে, অন্তরে ধারণ এবং লালনে নানাভাবে ও নানা উপায়ে গৃহশিক্ষকের ন্যায় শিক্ষা দেন। সকলের মনে আত্মমুক্তির পথ, উপায়গুলো গভীরভাবে ধারণে সমর্থ হন। পরম পূজ্য বনভন্তে সমগ্র বৌদ্ধ সমাজকে একই কাতারে আনার পাশাপাশি ভিন্ন ধর্ম, সামাজিক পরিমগুলের মানুষের মনেও গভীরভাবে স্থান লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। এজন্য জাতি-ধর্মনির্বিশেষে তিনি সকল ধর্মের মানুষের হৃদয়ে পরম শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে নিজের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ফলে মানবের কল্যাণে, আত্মহিতে, পরহিতে তিনি হয়ে ওঠেন সবার জন্য অত্যাবশ্যকীয় এক আলোকবর্তিকা ও

মহামানবরূপে। তিনি সকল শ্রেণির মানুষের কাছে হয়ে ওঠেন যেন একমাত্র নিরাপদ ভরসাস্থল। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ বিশেষ করে নানা দিগ্ভান্ত মানুষের দিক নির্ণয়ে, নিজেদের সুপথে পরিচালিত করতে যে পথের সন্ধান দিতেন এবং সে পথ ধরে সুখের সন্ধানলাভী দিগ্দ্রান্তরা পূজ্য ভন্তের প্রতি আজীবন কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ থেকেছেন। পরম পূজ্য বনভত্তে জীবনভর শুধু মানুষের হিতসুখে নিজেকে আত্মোৎসর্গ করেছেন। বিশেষ করে তাঁর স্বজাতির প্রতি অমলিন চিন্তাচেতনায় ছিলেন সদা নিমগ্ন। অনুসারী দায়ক-দায়িকাদের বিভিন্ন ভূল-ভ্রান্তিগুলো দেখিয়ে দিতেন, খুব সুস্পষ্টভাবে বিভিন্ন বৌদ্ধ ও অবৌদ্ধসুলভ আচরণীয় বিষয় সম্পর্কে অবহিত করতেন। সত্য এবং আসলকে চিনিয়ে দিয়ে সেসব মনে ধারণ-গ্রহণে উৎসাহ যোগাতেন, আর মিথ্যা এবং অবৌদ্ধসুলভ বিষয়গুলোকে বর্জনের পরামর্শ দান করতেন সদা সর্বদা।

একই সমাজবদ্ধ মানুষ এবং একই ধর্মীয় ভাবধারার আর একই জাতিসন্তার মানুষ হয়ে সামান্য সামান্য মতভিন্নতা এবং সম্পর্কহীনতার বশবর্তী হয়ে নিজেদের মধ্যে হিংসা হানাহানি, মারামারির ঘটনায় তিনি ছিলেন খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, বিরক্ত ও অতিশয় ক্ষুব্ধ। যারা সেসব অন্তর্ঘাতমূলক কাজে লিপ্ত, তাদের সে কাজ হতে বিরত থাকার উপদেশ, পরামর্শ অনবরত দান করেও জড়িতদের সংঘাত-কর্ম থেকে নিবৃত্ত করতে সক্ষম হননি।

একসময় আক্ষেপ করে তিনি বলতেন, আমার ব্যবস্থা আমার হয়েছে, তোমাদের ব্যবস্থা তোমরাই করো, আমার কিছুই করার নেই। অবশেষে তিনি সাধারণ এবং নিরীহদের যারা তাঁর উপদেশ পালন করেন বলে ধারণা পোষণ করতেন তিনি তাদের অন্তর্ঘাতমূলক কাজ থেকে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে দূরে থাকার উপদেশ দেন। তিনি সদ্ধর্মপ্রাণ দায়কদায়িকাদের আপন সন্তানের মতো অবিরাম সুপরামর্শ দান করতেন। শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞা দ্বারা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজকে চালিত হতে প্রেরণা দিতেন, উৎসাহিত করতেন। তাঁর জীবদ্দশায় ধর্মের উন্নতিতে সর্বদা নানাভাবে প্রয়াস চালাতে থাকেন। তিনি ধর্মের মাধ্যমে আদর্শ মৈত্রীময়, শীলময়, ভাবনাময় সমাজ গঠন দ্বারা একটি সুন্দর আদর্শ বৌদ্ধ জাতি গড়ে তোলার সুমহান স্বপ্ন বাস্তবায়নে নানা কুশলকর্মের উদ্যোগ গ্রহণ

করেন। তাঁর শিষ্যমণ্ডলীকে বৌদ্ধধর্মীয় ভাবধারায় বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণের প্রেরণা দিতেন। তিনি লক্ষ করেছেন পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধরা বৌদ্ধর্মাবলম্বী হলেও এখনো বৌদ্ধধর্মের চর্চা এবং বৌদ্ধধর্মকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে অক্ষম। বৌদ্ধরা যদি বৌদ্ধধর্মের স্বরূপ একান্তভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ না হন তাহলে আত্মমুক্তির পথ সন্ধান লাভ করা যাবে না। ধর্মীয় চর্চা মানুষের মনে গভীরভাবে স্থান পাবে না। এর মূল কারণ হলো বৌদ্ধধর্মীয় সকল গ্রন্থগুলো পালি. সংস্কৃত, বর্মী এবং ইংরেজি ভাষায় লিখিত। বাংলায় ধর্মীয় গ্রন্থ পরিমাণে না থাকায় সদ্ধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়িকারা সহজে তা রপ্ত করার অভাববোধের কারণে স্বজাতির বৌদ্ধরা ধর্মকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারছে না। তাই তিনি গভীরভাবে মর্ম উপলব্ধি করে তাঁর কাছে থাকা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত সমগ্র ত্রিপিটককে বাংলায় প্রকাশনার উদ্যোগ নিতে পরামর্শ দান করেন। এরপর বৌদ্ধধর্মের গৌরবময় নানা কীর্তিগাথাগুলোর প্রচারণা ও স্মৃতি নিদর্শনে স্থায়ী অবকাঠামো বিশ্বে বৌদ্ধ রাষ্ট্রগুলোতে বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত প্যাগোডা তৈরির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তিনি সে কাজটিও শিষ্যমণ্ডলীকে বাস্তবায়নের পরামর্শ দান করেন। এ ছাড়া পালি সাহিত্য শিক্ষা এবং ভিক্ষুসংঘের স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার্থে চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের প্রতিও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় পরম পূজ্য বনভত্তে জীবদ্দশায় তাঁর লালিত স্বপ্নগুলোর মধ্যে কতগুলো কঠিন এবং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি, দেখে যেতে পারেননি তাঁর স্বপ্ন পূরণের অভিযাত্রাগুলোকে।

তবে সুখের বিষয় এই যে, পরম পূজ্য বনভন্তের স্বপ্ন পূরণে কয়েকটি ধাপের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম অনেক দূর এগিয়েছে। শিষ্যমণ্ডলী পালি শাস্ত্রাদি পাঠোভ্যাস এবং ভাষা আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছেন অনেকেই এবং সে কাজটি এখনো চলমান রয়েছে। বৃহৎ আকারের ও আন্তর্জাতিক মানের একটি প্যাগোডা নির্মাণ কাজও চলছে। পূজ্য ভন্তের অকৃত্রিম ও সেহপরায়ণ শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে পরম শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রগুপ্ত মহাস্থবির ভন্তের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্বে তাঁর সঙ্গে আরও কতিপয় সুশিক্ষিত এবং সুদক্ষ শিষ্য শ্রদ্ধেয় বিধুর ভন্তে এবং শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তেসহ কতিপয় সদ্ধর্মপ্রণাণ দায়ক-দায়িকার সমন্বয়ে চলছে সমগ্র ত্রিপিটক

গ্রন্থভোর বাংলায় প্রকাশনার মহান কর্মযজ্ঞ, যার ফলে সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্রগুলোকে বাংলায় প্রকাশনার উদ্যোগ সফলতার দোরগোড়ায় পৌছেছে। এখন সগৌরবে তা প্রকাশ করা যায়। ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলো ইতোপূর্বে কখনো বাংলায় রূপান্তরিত বা প্রকাশিত হয়নি এ কথা वला ठिक रत ना। वर वष्ट्रत भूवं थिएक वाल्लाग्र ত্রিপিটকের বহু বহু গ্রন্থাবলি প্রকাশিত হয়েছে, ভবিষ্যতেও আরও অনেক অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হবে। কিন্তু শুরু থেকে থেকে শেষ অবধি ত্রিপিটকের সবগুলো গ্রন্থ প্রকাশনা বাংলাদেশ আজ অবধি হয়নি, যে ঐতিহাসিক সাফল্যের কৃতিত্ব বর্তমান উদ্যোক্তাগণই माविमात वला याटा भारत निःभरम्मरः। इय्राटा वा ভবিষ্যতে আরও অনেক উদ্যেক্তারা ত্রিপিটকের সবগুলো গ্রন্থ প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। যারা সে উদ্যোগ আগামীতে গ্রহণ করবেন তারাও সাধুবাদ এবং ধন্যবাদ লাভ করবেন অবশ্যই।

পরম পূজ্য বনভন্তের বাকি অন্যান্য সকল পরিকল্পনাগুলোও ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়িত হবে তাতে কোনো দ্বিধা বা সন্দেহের অবকাশ নেই। আজ পরম পূজ্য বনভন্তে আমাদের লৌকিক জগতে নেই। তিনি নেই, কিন্তু টিকে আছে তাঁর আদর্শ, টিকে আছেন তাঁর শিষ্যমণ্ডলী পরম শ্রদ্ধেয় ভিক্ষুসংঘ। তাদের সুদক্ষ নেতৃত্বে বৌদ্ধধর্ম পার্বত্য আকাশে যেমন সমুজ্বল থাকবে তেমনি উন্নতি ঘটবে ধর্মের।

ধর্ম এবং সমাজ একে অপরের পরিপুরক

আমরা ধর্মকে লালন, ধারণ, গ্রহণ বা প্রতিপালন করি একটি অবস্থান থেকে, সেটি হচ্ছে সামাজিক অবস্থান থেকেই। সামাজিক পরিমণ্ডলের সাধারণ মানুষ যতই ধর্মকে মনেপ্রাণে লালন এবং ধারণ করেন ততই

ধর্মের প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করে। ধর্মকে যারা পরিচালনা করেন এবং নেতৃত্ব দেন সেই ধর্মীয় গুরু, ধর্মীয় নেতৃত্ব যথাযথ হলেই, আর সামাজিক মানুষের ধর্মীয় চেতনা এবং ধর্মীয় ভাবধারার সঙ্গে পারস্পরিক সমন্বয় ঘটলেই তার আদর্শ রূপ প্রকাশিত হয়। এককভাবে সমাজবদ্ধ মানুষের যেমন সম্ভব নয় তেমনিভাবে ধর্মীয় গুরুদের পক্ষেও বিচ্ছিন্নভাবে কোনো ভালো বা আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা একেবারেই অসম্ভব। পরিনির্বাপিত পরম পূজ্য বনভন্তে তাঁর জীবদ্দশায় দেশনাচ্ছলে বলতেন কৃষক, ক্ষেত্র এবং বীজ সবই যদি উত্তম হয় কৃষক তার কৃষিকাজে সাফল্য লাভ করতে পারে। অপরদিকে ক্ষেত্র যথেষ্ট উর্বর কিন্তু বীজ তত ভালো নয় এবং কৃষক উত্তম নয় সে ক্ষেত্রে কৃষক তার কাঞ্জ্মিত সাফল্যে পৌঁছাতে কোনোভাবেই সক্ষম হয় না। তাই কৃষকের ফলন যেমন নির্ভর করে ত্রিধারায় (বীজ, ক্ষেত্র ও কৃষক) উত্তম ব্যবস্থা তেমনি আদর্শপূর্ণ, মৈত্রীপূর্ণ, সুখময়, শান্তিময় পরিপূর্ণ সুন্দর সমাজ গঠনে প্রয়োজন ধর্মের নীতি, আদর্শগুলো অনুসরণ, অনুশীলন এবং লালন. প্রতিপালন। অপরদিকে ধর্মীয় গুরুজন, ধর্মীয় নেতৃত্বও যদি প্রকৃত ধর্মীয় নীতিস্কমণ্ডলোর ওপর ভর করে সঠিক পথের সন্ধান দিতে, সম্মুখের আলোকউজ্জল পথে এগিয়ে নিতে সক্ষম হন তবেই আমরা পরিগণিত হবো আদর্শ বৌদ্ধ জাতি। বৌদ্ধর্মই প্রকৃত ও খাঁটি একটি মানবকল্যাণধর্মী ধর্ম। অন্যথায় নীতিকথাগুলো শুধু কথার কথা, আর গ্রন্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে।

> "সব্বে সন্তা সুখীতা ভবম্ভ, সব্বে সন্তা সব্বা দুক্খা পমুচ্চম্ভ'তি।"

* **লেখক পরিচিতি :** প্রিয় কুমার চাকমা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি।

gmail : priyakhdc@gmail.com Face Book : priyakhdc@gmail.com

চাকমাদের বৌদ্ধ ধর্মচর্চা : বৌদ্ধ রঞ্জিকা হতে ত্রিপিটক

সুসময় চাকমা

বৌদ্ধ তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্যগণ 'চর্যাপদ' রচনা করেছিলেন বাংলা ভাষায়। বাংলা ভাষায় রচিত প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন হিসেবে চর্যাপদের নাম উল্লেখযোগ্য। চর্যাপদের রচনাকাল হতে দীর্ঘ হাজার বছরের ব্যবধানে বাংলার বিশাল সাহিত্যের ভাগুরে বৌদ্ধদর্শন অবলম্বনে অন্য কোনো রচনার সন্ধান পাওয়া যায়নি। বাংলা ভাষায় বিপুল সংখ্যক পুঁথি রচিত হলেও সেই তালিকায় বৌদ্ধদর্শন বিষয়ে কোনো বাংলা পুঁথির নাম পাওয়া যায় না। তাই প্রয়াত অশোক কুমার দেওয়ান বলেছিলেন, বৌদ্ধ রঞ্জিকা পুঁথিকে বাংলা ভাষায় রচিত প্রাচীনতম পুঁথি হিসেবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্থান দেওয়া উচিত।

চাকমা রাজ মহীয়সী রানি কালিন্দী (১৮৪৪-১৮৭৩) স্বজাতিদের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করার জন্য আরাকান সীমান্ত হতে বৌদ্ধধর্মের অন্যতম বৌদ্ধ পণ্ডিত মহাস্থবির সারমেধ ও তাঁর দলীয় ভিক্ষুসংঘকে রাজানগরে ফাং (আমন্ত্রণ) করে এনেছিলেন এবং তাঁর নিকট থেকে ধর্মদেশনা শ্রবণ করে বৌদ্ধধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল হন। ফলে রানি চাকমাদের একসময়ে লুরীদের দারা প্রবর্তিত ধর্মকে সংস্কারের জন্য ব্রাম্মী ভাষায় রচিত 'থাদুতোয়াং' নামক বৌদ্ধধর্মীয় গ্রন্থটি জনৈক ফুলচন্দ্র লোখককে দিয়ে বাংলায় অনুবাদ করে 'বৌদ্ধ রঞ্জিকা' নামে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু 'বৌদ্ধ রঞ্জিকা' গ্রন্থটি কখন, কোথায়, কীভাবে প্রকাশিত হয়েছিল তা একটা সময় পর্যন্ত চাকমাদের অজানাই ছিল। প্রয়াত অশোক কুমার দেওয়ান 'বৌদ্ধ রঞ্জিকা' বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত গিরিনির্ঝর ১ম সংখ্যায় 'বৌদ্ধ রঞ্জিকা ও প্রাসঙ্গিক কথা' শিরোনামে লিখেছিলেন। তাঁর প্রবন্ধে একটি যুক্তিযুক্ত কারণ হলো যে, রাঙ্গামাটি উপজাতীয়

সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট কর্তৃক সংগৃহীত 'বৌদ্ধ রঞ্জিকা' গ্রন্থটি ছিল হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি।

সম্প্রতি আমার কাছে বাংলা ছাপার অক্ষরে 'বৌদ্ধ রঞ্জিকা'র একটি গ্রন্থ হস্তগত হয়েছে। এটি খাগড়াছড়ি কলেজিয়েট হাই স্কুলের শিক্ষক বাবু আর্যমিত্র চাকমা খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটে সংরক্ষণের জন্য আমাদের নিকট জমা দিয়েছেন। বইয়ের আকৃতি ৩ ইঞ্চি বাই পাঁচ ইঞ্চি এবং বইয়ের ১ম পৃষ্ঠা হতে ৮ম পৃষ্ঠা পর্যন্ত নেই। তাই সঠিক করে বলা যাছে না যে বইটি মোট কত পৃষ্ঠা সম্বলিত। বইটির মালিক ছিলেন জনৈক সুমনালন্ধার নামে এক বৌদ্ধ ভিক্ষু। বইয়ের ভিতরের একটি পাতায় বাংলা অক্ষরে লেখা তথ্যমতে, তিনি বইটি ১২৯৮ মঘীতে কোনো এক কঠিন চীবর দানোৎসবে দান হিসেবে পেয়েছিলেন। সে হিসেবে বইটির বর্তমান আনুমানিক বয়স কমপক্ষে ৮০/৯০ বছর হয়। বর্তমানে বইটি জাতীয় আর্কাইভ অ্যান্ড লাইব্রেরিতে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক বিপ্রদাশ বড়ুয়ার সম্পাদনায় সম্প্রতি 'বৌদ্ধ রঞ্জিকা' প্রকাশিত হয়েছে যার নাম 'বৌদ্ধ রঞ্জিকা অর্থাৎ বৌদ্ধদিগের মূল ধর্ম'। সেখানে প্রথম প্রকাশের সন উল্লেখ আছে ১৮৯০ সন। গ্রন্থের ভূমিকায় আবুল হামিদ মাস্টার লিখেছিলেন, "কলিকাতায় মুদ্রণের জন্য প্রেরণ করা হলে পাণ্ডুলিপিটি পুনরায় চউ্টগ্রামে ফিরে আসে। তাই তিনি অতি দ্রুত সময়ে চউ্টগ্রামস্থ চন্দ্রশেখর যন্ত্রে শ্রীজগচন্দ্র দাস প্রিন্টার্স কর্তৃক মুদ্রণ কাজ সমাপ্ত করেছিলেন"। তিনি সেখানে এও উল্লেখ করেছেন যে, গ্রন্থটি ছিল ১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড পরবর্তীকালে প্রকাশের প্রত্যাশাও রেখেছেন। কিন্তু সেটি খুব সম্ভবত রানির মৃত্যুর কারণে আর হয়ে ওঠেনি। ২য় খণ্ডটি প্রকাশিত হলে আমরা অনুবাদক সম্বন্ধে যৎকিঞ্জিৎ জানতে

পারতাম। উল্লেখ্য যে, জনাব বিপ্রদাশ বড়ুয়া উক্ত বইয়ের মূল পাণ্ডুলিপি লন্ডন মিউজিয়াম হতে সংগ্রহ করা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন।

আমরা সর্বপ্রথম 'বৌদ্ধ রঞ্জিকা'র নাম পাই সতীশচন্দ্র ঘোষের লেখা চাকমা জাতি গ্রন্থে। রাজ মহীয়সী রানি কালিন্দী 'বৌদ্ধ রঞ্জিকা' বাংলা ভাষায় ছাপার অক্ষরে প্রকাশ ও প্রচারের উদ্যোগ নিলেও জীবদ্দশায় বইটি ছাপার অক্ষরে দেখে যেতে পারেননি। ১৮৭৩ সালের পর হতে বৌদ্ধ রঞ্জিকাটি কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও চাকমাদের কারও দেখার বা পড়ার আকাঞ্চ্কা পূর্ণ হয়নি বলে মনে হয়। এ যাবৎকালের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর তালিকায় এই গ্রন্থটি স্থান পারান। বিষয়টি আমাদের ভাবিয়ে তোলে।

হওয়ার পরও তা কেন চাকমা রাজদরবারে এসে পৌছায়নি তা গবেষণার বিষয়। সে হিসাবে আমার হাতে আসা এই বইটি প্রথম মুদ্রিত কপি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। অনুমান করা যেতে পারে, বইয়ের মুদ্রণের দায়িত্বে যিনি ছিলেন তিনি মুদ্রণের পর যথাসময়ে চাকমা রাজদরবারে পৌছাতে পারেননি। চাকমা রাজদরবার তো বটেই, সংখ্যাগরিষ্ঠ চাকমা প্রজাদের নিকটও কেন এটির একটি কপিও পৌছল না তা আশ্চর্যের বিষয়। রানির ইচ্ছা যদি সঠিক সময়ে বাস্তবায়িত হতো তাহলে আজকের চাকমা বৌদ্ধগণ অনেক দূর এগিয়ে আসত নিঃসন্দেহে। তাই আমাদের স্বজাতীয় ধর্মের উত্তরোত্তর সফলতার জন্য আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

জনৈক ফুলচন্দ্র লোখককে দিয়ে বাংলায় অনুবাদ করে 'বৌদ্ধ রঞ্জিকা' নামে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু 'বৌদ্ধ রঞ্জিকা' গ্রন্থটি কখন, কোথায়, কীভাবে প্রকাশিত হয়েছিল তা একটা সময় পর্যন্ত চাকমাদের অজানাই ছিল।

'চাকমা জাতি' গ্রন্থের লেখক সতীশ ঘোষও 'বৌদ্ধ রঞ্জিকা' প্রকাশাকারে দেখতে পাননি বলে উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি এটি রাঙ্গামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের তৎকালীন শিক্ষক আব্দুল হাকিম সম্পাদনা করেছিলেন বলে জেনেছিলেন। জানা যায়, সেই সময়ে চাকমারা বইটি বাংলা হস্তাক্ষরে অনুলিখন করে চর্চা অব্যাহত রেখেছিল। যার প্রমাণ পাওয়া যায় রাঙ্গামাটি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট কর্তৃক সংগৃহীত বাংলা হস্তাক্ষরে লেখা বৌদ্ধ রঞ্জিকার পাণ্ডলিপিতে।

১৮৯০ সাল থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১৮/১৯ বছর বইটি অপ্রকাশিত অবস্থায় কেন ছিল বা আদৌ ছিল কি না তা অনুসন্ধান বা অনুমান করা কঠিন। কেননা রানি কালিন্দী বইয়ের মুদ্রণের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করেছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে বইটি প্রকাশিত

আশার কথা যে, অনুসন্ধিৎসু গবেষকদের জন্যে খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট হতে উক্ত 'বৌদ্ধ রঞ্জিকা' গ্রন্থটি সাধারণের নিকট পৌছানোর জন্য বর্তমানে পুনর্মুদ্রণের কাজ চলছে।

চাকমাগণ আদি হতে বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিলেন। তাই বলা যায় চাকমাগণ প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের চর্চা রানি কালিন্দীর আমল হতে শুরু করে থাকলেও প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের আচরণ থেকে তারা (চাকমা বৌদ্ধগণ) অনেক পিছিয়ে ছিলেন। ষাটের দশকের পর রাজগুরু শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাথের স্বীয় ধর্মপ্রচারের পাশাপাশি প্রতিটি গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠেছিল বৌদ্ধ বিহার। পরবর্তী সময়ে পরম পূজ্য বনভন্তের আবির্ভাব প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের নবজাগরণ সূচিত হয়। তিনি সত্যিকার বৌদ্ধধর্মের লোকোত্তর জ্ঞান বিষয়ে ধর্মপিপাসুদের আগ্রহী করে

তোলেন এবং সব সময় অনুভব করতেন বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে হলে ত্রিপিটকের বিকল্প নেই। তাই তিনি তাঁর জীবদ্দশায় রাঙামাটি রাজবন বিহারে মূল পিটকীয় বইসহ অন্যান্য ধর্মীয় বইয়ের বিশাল সংগ্রহ গড়ে তোলেন। তিনি ভিক্ষু-গৃহী সবাইকে বুদ্ধের পবিত্র বাণীর ধারক ও বাহক ত্রিপিটক গ্রন্থ হাজার হাজার কপি ছাপানোর কথা বারংবার বলতেন। তিনি ত্রিপিটক গ্রন্থগুলো পালি থেকে বাংলায় অনুবাদ করার ও ছাপানোর পরামর্শ ও উপদেশ দিতেন। তিনি জীবদ্দশায় বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক ছাপানো অবস্থায় দেখে যেতে না পারলেও তাঁর পরিনির্বাণ-পরবর্তী (পরম পূজ্য বনভন্তের অভিপ্রায় অনুযায়ী) মূল পালি ত্রিপিটক বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও ছাপানোর জন্য পূজ্য বনভন্তের যোগ্য শিষ্যসংঘ এবং (তিন পার্বত্য জেলাসহ বাংলাদেশের) উপাসক-উপাসিকাদের খাগড়াছড়িতে জন্ম লাভ করে ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ নামে একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক বৌদ্ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা। এই সোসাইটির আর্থিক উৎস শ্রদ্ধাবান উপাসক-উপাসিকাগণের প্রদত্ত মাসিক

শ্রদ্ধাদান। তাদের প্রদত্ত শ্রদ্ধাদান দিয়ে পূজনীয় বনভন্তের শিষ্যসংঘের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সম্পাদনায় এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক ছাপানো সম্ভব হয়েছে। আমি যতটুকু জানি, ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত ভত্তে ও ভদন্ত করুণাবংশ ভত্তে প্রমুখসহ বিশিষ্ট ভন্তেগণ দিবারাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম করে সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজ সুসম্পন্ন করেছেন। পূজ্য বনভন্তের অভিপ্রায় অনুযায়ী এই পিটকীয় বইগুলো পার্বত্য জনপদসহ সমগ্র বাংলাদেশের বৌদ্ধদের ঘরে ঘরে পৌছানোর পর প্রকৃত বৌদ্ধর্মকে জানা, গবেষণা করা, উপলব্ধি করা ও চর্চা করা যেদিন থেকে শুরু হবে সেদিন থেকেই পরম পূজ্য বনভন্তের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হবে। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের শ্রীবৃদ্ধি যেমন ঘটবে তেমনি দিন দিন বৌদ্ধধর্ম দীর্ঘস্থায়ী ও উজ্জ্বলতর হবে। এই প্রথমবারের মতো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটককে (২৫ খণ্ড) অনুবাদ ও প্রকাশ করার মহান উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটিকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সাধুবাদ ও অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

* **লেখক পরিচিতি :** সুসময় চাকমা, পরিচালক, খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি। email: chakmasusamoy@yahoo.com

বুদ্ধের শিক্ষাদর্শনে মানবতাবাদ : একটি পর্যেষণা

অধ্যাপক ড. বিমান চন্দ্ৰ বড়ুয়া

ল্যাটিন 'Humanism' -এর প্রতিশব্দ হলো মানবতাবাদ। বর্তমান বিশ্বে বহুল আলোচিত, নন্দিত, প্রশংসিত শব্দের অর্থবোধক নাম এটি। মানবের কল্যাণবোধ, শুভ কামনা, মঙ্গল কামনা অনুসন্ধান বা অন্বেষণই মানবতাবাদের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। Literae Humaniorse শব্দটি দুটি থেকে মানবতাবাদ শব্দটির উৎপত্তির কালে প্রাচীন প্যাগান সাহিত্য-সংস্কৃতিসহ নানারকম অধ্যয়ন, গবেষণা, মূল্যায়ন ও অনুশীলনকে বোঝানো হতো। যোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপীয় রেনেসাঁর সময় মানবতাবাদ শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়। সে সময় প্রাচীন গ্রিক, ল্যাটিন জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য ইত্যাদি অনুশীলন ও চর্চাকারীদের মানবতাবাদী বলা হতো। ১৯৩৩ খ্রি. হিউম্যানিস্ট ম্যানিফেস্টো স্বাক্ষরিত হয়। এটা স্বাক্ষরিত হবার ফলে মানবতাবাদ বলতে এমন এক ধর্নের জীবনদর্শনকে বুঝায় যা ধর্মীয় বাণী বর্জন করে ও ধর্মীয় সাহিত্যের অতিপ্রাকৃত উপাদানকে বর্জন করে। বিভিন্ন গ্রন্থের মানবতাবাদ সম্পর্কিত কয়েকটি মন্তব্য তুলে ধরা হলো। যেমন: 'Webster's New International Dictionary of English Language' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে উক্ত <u> হয়েছে</u> : `Contemporary cult or belief calling itself religious but substituting faith in man for faith in god. তা ছাড়া `Illustrated Oxford Dictionary নামক গ্রন্থে দেখা যায় : `a system of thought that regards their intelligence to live their lives, rather than relying on religious belief'. আরও উক্ত হয়েছে : a system and philosophy based on ethical but not religious standards.

মানবতাবাদ একটি দর্শনের বিষয় যা নৈতিকার ওপর নির্ভরশীল। আত্মপীড়িত, নির্যাতিত, অবহেলিত, অচ্ছুত, অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীর সেবা করা, অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং কাল্পনিক চিন্তা-চেতনা পরিহার করে মানবিক

উদ্বদ্ধ হয়ে মানবসেবা মানবতাবাদের প্রধান ও অন্যতম লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। বর্তমান সময়ে মানবতাবাদ বলতে মানবকেন্দ্রিক বা মানবিক কল্যাণবোধকে বোঝায়। এক কথা বলা যায়. মানবতাবাদ শব্দটির মর্মকথা হচ্ছে: 'মানুষই সবকিছুরই মানবতাবাদীরা অতিপ্রকৃত কোনোরূপ বিশ্বাস স্থাপন করে না। বিধাতার আদেশ না মানলে তিরস্কারও যেমন বিশ্বাস করে না তেমনি আদেশ किश्वा निर्फिंग भानल श्रुतकात्र आगा करत ना। মানবতাবাদীরা মনেপ্রাণে একান্তই বিশ্বাস করে যে. মানুষের নানাবিধ সমস্যা সমাধানে বিধাতার কোনো রকম হাত নেই। কিন্তু পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা, মৈত্রী-মুদিতা-করুণার দ্বারা ব্যক্তির সমস্যা, পারিবারিক সমস্যা, গ্রামীণ সমস্যা, রাষ্ট্রীয় সমস্যা সর্বোপরি এমনকি বিশ্বসমস্যাও সমাধান করা সম্ভব। মানবতাবাদের মূল বক্তব্য হলো মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য সকলের ন্যায় সমান অধিকার ও সমান সুযোগ থাকা চাই। মহামতি গৌতম বুদ্ধ নবদিগন্তের দ্বার উন্মোচন ও মানবতার বিকাশ সাধনে একই ধরনের অঙ্গীকারের কথা বলেছিলেন।

পৃথিবীতে যে কজন মহামনীষী রয়েছেন তনাধ্যে মহামতি গৌতম বুদ্ধ অন্যতম। তিনি প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। কোনো রকম ইন্দ্রিয়জনিত কামন-বাসনা তাঁকে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারেনি। বাল্যকাল থেকেই তিনি সকলের মঙ্গল, কল্যাণ, পরোপকার কামনায় মনোনিবেশ করতেন। ধর্মপ্রচারের শুক্রর দিকে তিনি তাঁর মহান ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করে বললেন, 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা নবধর্ম প্রচারের জন্য বের হও। বহুজনের হিত কিংবা মঙ্গলের জন্য, বহুজনের কল্যাণের জন্য জগতের আর্তদের প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ হয়ে দেবমনুষ্যের সুখ-সাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য দিকে দিকে বিচরণ করো'। এখানে বুদ্ধ

ভিক্ষুসংঘকে মানবজাতির কল্যাণ সাধন করার কথা বলেছেন। এ উপদেশে উদ্পুদ্ধ হয়ে তাঁর চিরঅম্লান ও চিরশ্বাশত অমোঘ বাণীকে অন্তরের গভীরে ধারণ করে বুদ্ধশিষ্য, রাজা, শ্রেষ্ঠীসহ আরও অনেকে আর্ত-পীড়িত মানবতার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। মানবতার ইতিহাসে এটি অনন্য সাধারণ উদাহরণ।

বুদ্ধের আবির্ভাবের সময়ে বর্ণবৈষম্য ছিল। বুদ্ধ সেই জাতিভেদপ্রথাকে প্রত্যাখ্যান করে সকলের সমানাধিকারের কথা বলেছিলেন। সুতরাং সঙ্গত কারণে বুদ্ধপ্রদর্শিত নতুন ধর্ম মতবাদ সকলের নিকট আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। তিনি একসময় ভিক্ষুসংঘকে উপলক্ষ করে বলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, গঙ্গা, যমুনা, অচিরাবতী, সরভূ,

কথাও বলেছেন।

বুদ্ধ সংঘে সকলের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে মানবতার অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সংঘে জাতিভেদ বা জাতির অভিমান না থাকার জন্য রাজপুত্রদের সঙ্গে প্রব্রজ্যা নিতে গেলে উপালিকেই বুদ্ধ প্রথমে প্রব্রজ্যা প্রদান করেন। তা ছাড়া সুনীতি-এর কথা ধরা যাক। সুনীতি ছিল অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান। প্রত্যহ রাস্তার ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করাই হলো তার কাজ। সে কখনো ধনী পরিবারের লোকজনের সান্নিধ্যে আসতে পারেনি। তিনি খুবই সহজ সরল স্বভাবের ছিল। তার হৃদয় ছিল পবিত্র বিশুদ্ধ। একসময় বুদ্ধের সঙ্গে সুনীতি-এর সাক্ষাৎ লাভ হয়।

সমাজব্যবস্থায় মানুষ তার নিজ নিজ কর্মের মধ্যে দিয়ে পরিচিতি লাভ করে। বুদ্ধ কর্মকে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিয়েছেন। কর্মের দারা মানুষ ছোটো হয়। কর্মের দারা মানুষ বড়ো হয়। কর্মের দারাই মানুষ 'মহতো মহীয়ান' হতে পারে। জন্মের মাধ্যমে কখনো ব্যক্তির পরিচয় হয় না।

মহী প্রভৃতি মহানদীগুলো মহাসমুদ্রে এসে নিজেদের পূর্বের নাম-গোত্র পরিত্যাগ করে মহাসমুদ্রে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, এবং শূদ্র এ চারি গোত্রীয় লোক বুদ্ধের শাসনে এসে পূর্বের নাম, গোত্র এবং বংশ ত্যাগ করে শাক্যপুত্র নামে পরিচিতি লাভ করে। বুদ্ধ যজ্ঞ-কণ্টকিত ব্রাহ্মণ্যধর্মকে অস্বীকার করেন এবং নৈতিক অনুশাসনকে সর্বোচ্চ স্থান প্রদান করেন। তিনি জাতিভেদ, চতুরাশ্রম অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করেন। তিনি তাঁর ধর্মকে সমাজের নিমুস্তর পর্যন্ত প্রসার চেয়েছিলেন। তিনি বলেন, নিত্যপরাক্রমশালী ব্যক্তি ক্ষত্রিয়, ব্রাক্ষণ, বৈশ্য, শুদু, চণ্ডাল আর পুষ্প নিক্ষেপক ঝাড়দার যে-ই ব্যক্তি হোক না কেন সে-ব্যক্তিই পরম বিশুদ্ধিতা লাভ করতে পারে। তিনি ঘূণাভরে বিরোধিতা করেছেন সকল প্রকার বর্ণবৈষম্যের। শুধু তাই নয়, তিনি নারীদের মর্যাদার

বুদ্ধের নিকট ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করে খুব অল্পদিনের মধ্যে অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। তা ছাড়া চণ্ডাল পুত্র নামে পরিচিত সোপাক ও বুদ্ধের সান্নিধ্যে এসে নবজীবন লাভ করেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি সাধনার মাধ্যমে চরম শিখরে আরোহণ করে অর্হত্তুফল লাভ করেন। বুদ্ধের নিকট সকলের সমানাধিকার ছিল। তিনি সবাইকে এক এবং অভিন্ন মনে করতেন। সমদৃষ্টিতে দেখতেন। তাঁর সান্নিধ্যে এসে সবাই জাত্যাভিমান থেকে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হন। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ বলেন, 'কাষ্ঠ থেকে একান্তই অগ্নি উৎপন্ন হয় নীচু কুলে কিংবা অচ্ছুত কুলে জন্মজাত ব্যক্তিও ধৃতিমান পাপনিবারী জ্ঞানসম্পন্ন মুনি হয়'।

সমাজব্যবস্থায় মানুষ তার নিজ নিজ কর্মের মধ্যে দিয়ে পরিচিতি লাভ করে। বুদ্ধ কর্মকে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিয়েছেন। কর্মের দ্বারা মানুষ ছোটো হয়। কর্মের দ্বারা মানুষ বড়ো হয়। কর্মের দারাই মানুষ 'মহতো মহীয়ান' হতে পারে। জন্মের মাধ্যমে কখনো ব্যক্তির পরিচয় হয় না। বুদ্ধ বসল সত্রে বলেন:

ন জচ্চা বসলো হোতি ন জচ্চা হোতি ব্ৰাহ্মণো কম্মুনা বসলো হোতি কম্মুনা হোতি ব্ৰাহ্মনো।

অর্থাৎ, জন্মের কারণে কেউ বৃষল বা অচ্ছুত হয় না, জন্মে কারণে কেউ ব্রাহ্মণ হয় না। কর্মের দ্বারাই বৃষল বা অচ্ছুত হয়, আবার ব্রাহ্মণও কর্মের দ্বারাই হয়।

সূত্রপিটকের অন্তর্গত 'দীর্ঘনিকায়' গ্রন্থের 'অম্বট্ঠ সূত্র'-এর মূল আলোচ্য বিষয় হলো জাতিভেদ। জাতিগর্বে গর্বিত অম্বট্ঠ বুদ্ধকে যথোচিত সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে অস্বীকৃত জানায়। বুদ্ধ তাকে প্রমাণ করে দিলেন যে, তার পূর্বপুরুষ শাক্যদের দাসীপুত্র ছিল। কিন্তু তিনি সাধনার মাধ্যমে মহাঋদ্ধিধর হয়েছিলেন। তাঁর হীনজাতি তাঁকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হওয়ার পথে বাধা দিতে পারেনি। এখানে বলেন. বদ্ধ বিদ্যাচরণসম্পন্ন তিনি যে জাতিতেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন তিনি দেবমানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধ প্রবর্তিত ভিক্ষুসংঘে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, নাপিত, ঝাড়দার, চণ্ডাল ও অঙ্গুলিমাল। আবার ভিক্ষুণীসংঘে ছিলেন নর্তকী ও বারবণিতা, বৈশালীর আমপালি, উজ্জয়িনীর সভা নর্তকী পদুমবতী, রাজগহের শালবতী গণিকা ইত্যাদি। উভয় সংঘে প্রবেশকারীরা তাঁদের মানবীয় মর্যাদার অধিকারের স্বীকৃতি নিয়েই বুদ্ধের দীক্ষা নিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে I B Horner বলেন, In the pre-Buddhist days the status of women in India was on the whole low and without honour. During the Buddhist period, there was a change. Women came to enjoy more equality and greater respect and authority than even hitherto accorded to them. ৷ 'The Essences of Buddhism' নামক থান্থে উক্ত আছে: Men and women were placed by the Buddha on the same footing of equality.

এ বিষয় আরও উল্লেখ রয়েছে : বুদ্ধের সময়ে ভারতে স্ত্রীলোকের অনেক বিষয় স্বাধীনতা ছিল। সেই সময় অবরোধপ্রথা ছিল না। স্ত্রীশিক্ষা সমাজের সর্বস্তরে বহুল প্রচলিত ছিল। এমনকি বারবণিতারাও শিক্ষিত ছিলেন। আমুপালির কবিত্ব শক্তি, পাণ্ডিত্য ও বিবেচনাশক্তি প্রশংসনীয়। B. R Ambedkhar বুদ্ধের চিরশ্বাশত, সর্বজনীন ও সর্বকালীন বক্তব্যটির প্রতি জোড়ালো সমর্থন জানান এভাবে : no caste, no

inequality, no superiority; all ar equal. That is what Buddha stood for. এখানে বুদ্ধ মনে করতেন সমগ্র মানুষ এক অভিন্ন, অভিন্ন মানবসত্তার অবিচ্ছেদ্য আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ।

মানবতার উৎকর্ষ সাধনে বুদ্ধ প্রদর্শিত এ ধরনের অনুশীলনের জন্যই বুদ্ধ ও বৌদ্ধর্মকে আজও পৃথিবীর অগণিত মানুষ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে, সম্মান প্রদর্শন করে, ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করে।

বুদ্ধের ধর্ম এসে দেখে বিবেচনা করার ধর্ম। তাঁর ধর্মে কোনো রকম জটিলতা যেমন নেই তেমনি নেই অলৌকিকতা। তাঁর দৃষ্টিতে মহান ও সৎ মানুষ সুন্দর জীবনযাপনের মাধ্যমে মানবতার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব করতে পারে। মানুষ জন্মগতভাবে মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয়। মনুষ্যত্ববাধ দিয়ে মানবতা অর্জন করতে হয়। মানবতার পঠন-পাঠনের অন্যতম শর্ত হচ্ছে মানুষকে জানা এবং মানুষকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করা। সূত্রপিটকের দীর্ঘনিকায়ের তেবিজ্জ সূত্রটিতে বুদ্ধের মানবতাবাদের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখা যায়।

বুদ্ধ মানবতার সাধনায় ব্রহ্মবিহারের কথা বলেছেন। এখানে শাস্ত, সমাহিত, স্থিত তথা সাত্ত্বিক চিত্ত বৈশিষ্ট্যেও অধিকারী হয়ে বসবাস করাকে ব্রহ্মবিহার বলে। অন্যভাবে বলা যায় অপরিমিত মানসিক চেতনাকে প্রেম-প্রীতির মাধ্যমে বিশ্বলোকে ভাবিত করে তোলার নামই হলো ব্রহ্মাবিহার। ব্রহ্মাবিহারের চারটি আচরণিক দিক রয়েছে। যেমন:

- ক. মৈত্রী: সকল প্রকার প্রাণীর প্রতি মমতাময় চিত্ত জাগ্রত রাখাই হলো মৈত্রী। এর মাধ্যমে মানুষের চিত্তে অপ্রমেয় প্রেমবোধ জাগে।
- খ. করুণা : অপরের দুঃখ-দুর্দশা দেখে বিগলিত হওয়া এবং তা বিদূরিত করার চেষ্টা করা। এই করুণার দুটি দিক। একটি হলো আন্তরিকতাবোধ এবং অপরটি হলো আর্তপীড়িতের দুঃখ-দুর্দশা মোচনের ব্যবস্থা করা।
- গ. মুদিতা : ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতা ত্যাগ করে অপরের সুখের মধ্যেই নিজের আনন্দ ও সুখ লাভ করাই হলো মুদিতা।
- **ঘ. উপেক্ষা :** লোভ-দ্বেষ-মোহ ও রাগ-ভয় পক্ষপাতমুক্ত হয়ে সবকিছুকে নিরাসক্তভাবে সমদৃষ্টিতে দেখাই হলো উপেক্ষা।

বুদ্ধের ব্রহ্মাবিহারে মানবতার বিকাশের যে বিধি-

বিধান রয়েছে তা অন্যতম উৎকৃষ্ট পন্থা বলে বিবেচনা করা হয়। সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাব প্রদর্শন করাই হলো বুদ্ধের শিক্ষা। তিনি স্বাইকে আপন মনে করতেন। করণীয় মৈত্রী সূত্রে তিনি বলেন, মা যেমন তাঁর একমাত্র পুত্রকে নিজের প্রাণের বিনিময়ে রক্ষা করেন তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি প্রেম-প্রীতি ভালোবাসা উৎপন্ন করবে।

মানবতার অগ্রযাত্রায়, মহোপকার, কল্যাণসাধন তথা মানসিক উৎকর্ষ সাধনে বুদ্ধপ্রদর্শিত পঞ্চশীল এক অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এগুলো কতগুলো আচার-আচরণ যা মানুষের মানবিক বোধকে জাগিয়ে তোলে। এগুলো হলো : ক. প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকা; খ. চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন থেকে বিরত থাকা; গ্র মিথ্যা কামাচার কিংবা যৌনসম্ভোগ থেকে বিরত থাকা; ঘ. মিথ্যাবাক্য বলা থেকে বিরত থাকা; এবং ৬. সুরা ও মাদক জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা। উপরি-উক্ত পঞ্চশীল পরিপালনে মানুষের মনের পরিবর্তন সাধিত হয়। সমাজে কিংবা রাষ্ট্রে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, অপহরণ, হত্যা, ধর্ষণ, ব্যভিচার ইত্যাদি থাকবে না। বুদ্ধের এ ধরনের মূল্যবান বাণীর আবেদন সর্বজনীন এবং সর্বকালীন। ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকলের নিকট এটি গ্রহণযোগ্য। যদি পৃথিবীর মানুষ এ নীতিগুলো পালন করে তবে মানবতার মেলবন্ধন সূচিত হবে। সর্বোপরি মানবতার জয় হবে।

বর্তমান বিশ্ব হিংসামুখর। বলা যায়, হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী আজ অশান্ত। এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, আর আমেরিকা কোথাও কি শান্তি আছে, সুখ আছে? সর্বত্র যেন যুদ্ধ যুদ্ধভাব। চলছে পারমাণবিক ও রাসায়নিক অস্ত্র প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা। এমতাবস্থায় সবাই আতঙ্কিত, ভীত ও শঙ্কিত। এগুলোর কোনোটাই কিন্তু পৃথিবীতে শান্তি বয়ে নিয়ে আসতে পারবে না। বুদ্ধ অহিংসবাদী। বর্তমান সময়ে অনেক বড় বড় বিশ্বনেতৃবৃন্দ শান্তির কথা বললেও প্রকৃতপক্ষে শান্তি বাস্তবায়ন করতে পারেননি। কিন্তু বুদ্ধই প্রথম আজ থেকে ২৫৫৭ বছর পূর্বে শান্তি স্থাপনের পক্ষে সমরাস্ত্র তৈরি ও বিক্রি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছিলেন। এখানে তিনি পঞ্চ বাণিজ্য নিষিদ্ধের কথা বলেছেন। কেননা, এগুলো সমাজ ও জাতির জন্য খুবই ক্ষতিকর। এ পঞ্চবিধ বাণিজ্যগুলো হলো : ক. প্রাণিব্যবসা, খ. মাদক জাতীয় ব্যবসা, গ, বিষ ব্যবসা, ঘ, অস্ত্র ব্যবসা এবং ঙ,

মাংস ব্যবসা। বুদ্ধ বলেন, জীবন সকলের প্রিয় সুতরাং নিজের সঙ্গে তুলনা করে কাউকে হত্যা বা আঘাত করবে না। মানুষের মধ্যে এ ধরনের সত্যোপলব্ধি উদয় হলে মানুষ কখনো একে অপরকে হত্যা করতে পারে না। মারামারি করতে পারে না। যুদ্ধংদেহী মনোভাব পোষণ করতে পারে না। যুদ্ধের মাধ্যমে যে বীর হয় বুদ্ধ তাকে সমর্থন করেননি। এখানে বুদ্ধ অস্ত্রের মাধ্যমে কিংবা বাহুশক্তির মাধ্যমে অর্জিত জয় অপেক্ষা আত্মজয়কে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, সংগ্রামে হাজার হাজার মানুষ জয় করার তুলনায় যিনি কেবল নিজেকে জয় করেছেন তিনিই সর্বোত্তম বিজয়ী। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবে যে. জয় কখনো কোনো অবস্থাতেই শান্তি আনতে পারে না। বরঞ্চ আরও শত্রুতা বৃদ্ধি পায়। ফলে, মানবতার বিপর্যয় হয়। সুতরাং যুদ্ধ জয় করতে হলে প্রয়োজন নিজের আত্মসংযম ও অপরিমেয় প্রেম যার মাধ্যমে পারস্পরিক আদান-প্রদান, সম্প্রীতি-সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায়। এ সত্য মহামতি বুদ্ধ অনেক আগেই হৃদয়োপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি বলেন, জগতে শত্রুতার দ্বারা কখনোই শত্রুতার উপশম হয় না। মিত্রতার দারাই শক্রতার উপশম করা যায়। এটিই সনাতন নীতি। এখানে লক্ষণীয় যে, নৈতিক জীবন অনুশীলনের ফলে মানবতার যে বিকাশ সাধন হয় তা সকলের মঙ্গল ও কল্যাণ করতে পারে। শাান্তির আবাসস্থল কখনো অশান্তিতে মেতে উঠবে না।

বুদ্ধ নিজে মানবতাবাদী ছিলেন এবং সবাইকে মানবতার বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। মানুষের কল্যাণ ও মানবমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। তিনি সকলের প্রতি উদান্ত আহ্বান জানান এভাবে:

সব্ব পাপস্স অকরণং কুসলস্স উপসম্পদা সচিত্ত পরিযোদপনং এতং বুদ্ধানুসাসনং।

অর্থাৎ, সকল প্রকার পাপকাজ থেকে বিরতি থাকা এবং কুশলকর্ম সম্পাদন করা এবং আপন চিত্ত বিশুদ্ধ বা পবিত্র রাখাই হলো বুদ্ধের অনুশাসন।

বুদ্ধ পাপকাজ কিংবা মন্দকাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার কথা বলেছেন। কুশল কাজ বা ভালো কাজের মধ্য দিয়ে সর্বজনের আদরণীয় ও প্রশংসা লাভ করার কথা বলেছেন। কর্মের মধ্যে দিয়েই কেউ ভিখারী হয়, কেউ রাজা হয়, কেউ চোর হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। মানুষের অন্তরে লুকিয়ে আছে সুপ্তজ্ঞান যা অসাধারণ

বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়

অনন্ত শক্তির অধিকারী। প্রত্যেকের মধ্যেই এটি লুকিয়ে রয়েছে যাকে জাগিয়ে তুলতে হয় আপন আপন কতকর্মের মধ্য দিয়ে।

বুদ্ধ মানবকল্যাণে সুন্দর, পূত-পবিত্র-বিশুদ্ধ কুশল কর্ম নিজে সম্পাদন করে অপরকেও সম্পাদন করার কথা বলেছেন। অহিংস বুদ্ধ শুধু মানবতার কথা বলে ক্ষান্ত হননি তিনি এ আচরণ অপরাপরকে আচরণ করতেও শিখিয়েছিলেন। মানুষের কল্যাণ-মুক্তির জন্য তিনি আজীবন সাধনা করেছেন। তাই তো এ মহান পুরুষোত্তমকে মানবতাবাদে প্রবক্তা বললে ভুল হয় না। G. C Dev এ মহান ব্যক্তিকে অভিহিত করেছেন এভাবে: I found him (Buddha) out as a humanist whose prime concern is human welfare. ■

সহায়ক গ্রন্থাবলি:

গিরিশ চন্দ্র বড়য়া, ধম্মপদ, (ঢাকা : ১৯৬৬)

ড. আবদুল ওয়াহাব, ফোকলোর : মানবতাবাদ ও বঙ্গবন্ধু (ঢাকা : ২০১০)

জোতিপাল ভিক্ষু, উদানং (রেঙ্গুন: ১৩৩৭)

ধর্মদীপ্তি মহাস্থবির, বুদ্ধের জীবন ও বাণী (চউগ্রাম : ১৩৯৯ বাংলা)

প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, মহাবর্গ (কলকাতা : ১৯৩৭)

শ্রী ধর্মজ্যোতি স্থবির, খুদ্দকপাঠো (কলিকাতা : ১৯৫৫)

শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, সংযুক্তনিকায়, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা : \$800)

সাধনানন্দ মহাস্থবির, সুত্তনিপাত (রাঙামাটি: ২০০৭)

সুমন কান্তি বড়য়া, বৌদ্ধদর্শনে পারমীতত্ত্ব (ঢাকা : ২০০৮)

প্রজ্ঞালোক স্থবির, থেরগাথা (তাইওয়ান)

ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, দীঘনিকায়, প্রথম খণ্ড (রেঙ্গুন : ১৯৬২)

প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, বুদ্ধের অভিযান (কলিকাতা : ১৩৯৭ বাংলা)

B. R. Ambedkhar, The Buddha and His Dhamma (Bombay: 1974)

G. C Dev, Buddha, the Humanist (Dacca: 1969)

William Allan Nelson, Webster's New International Dictionary of English Language (London: 1959)

W.T Cunningham,, The nelson Contemporary English Dictionary, 1984

The Illustrated Oxford Dictionary, 2011

* **লেখক পরিচিতি :** চেয়ারম্যান, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সাবেক সিনেট ও একাডেমিক কাউন্সিলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কার্যকরী সদস্য. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। Joint Sectery, World Conference Religion for Peace, Bangladesh Chapter; Member, Asian Buddhist Conference for peace, Bangladesh Chapter.

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ও বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনা

কৃষ্ণ চন্দ্ৰ চাকমা

পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা সমগ্র বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের পুনর্জাগরণে বিশেষ করে থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্মের প্রচলিত ধারার সংস্কার সাধনে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে শ্রীমৎ সাধনানদ্দ (বনভন্তে) মহাস্থবিরের নাম পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে হয়। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় তেমন শিক্ষিত না হলেও স্বশিক্ষিত হিসেবে যেভাবে বৌদ্ধধর্মকে ধারণ করে, লালন করে দেখিয়ে গেছেন, তজ্জন্য এতদঞ্চলের বৌদ্ধদের কাছে তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আগে ভিক্ষুসংঘের মধ্যে অনেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। বিভিন্ন উপাধিপ্রাপ্ত বৌদ্ধ ভিক্ষুও ছিলেন এ দেশে। তাঁদের কেউই প্রচলিত ধর্মীয় রীতির সংস্কার সাধনে দৃশ্যমান তেমন কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করেননি, কিংবা করলেও সফল হতে পারেননি। কিন্তু শ্রদ্ধেয় সাধনানন্দ মহাস্থবিব বনভন্তে ছিলেন ব্যতিক্রম।

তিনি ১৯৪৯ সালে শুভ ফাল্পনী পূর্ণিমা তিথিতে চউগ্রামের নন্দন কানন বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ দীপংকর শ্রীজ্ঞান মহাস্থবিরের নিকট ২৯ বছর বয়সে প্রবজ্জ্যা গ্রহণ করেন। শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর সেখানে কিছদিন অবস্থান করেন এবং সেখানকার পরিবেশ অনুকূল না হওয়ায় তিনি একসময় (চিৎমরম) বৌদ্ধ বিহারে চলে যান। সেখানেও তিনি বেশি দিন অবস্থান করেননি, কেননা জাগতিক ভোগবিলাস প্রচলিত ধর্মীয় জীবনব্যবস্থার মধ্যে জীবনের মুক্তি তিনি খুঁজে পাননি। অবশেষে চিংম্রং বৌদ্ধ বিহারের শ্রদ্ধেয় বড ভত্তের পরামর্শে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে ফিরে আসেন এবং জন্মস্থান ধনপাতাসহ পরবর্তীকালে দীঘিনালা, লংগতুর বিভিন্ন জায়গায় ধ্যানসাধনা করেন। রাঙামাটি রাজ বনবিহারে তিনি দীর্ঘ বছর যাবৎ স্থায়ীভাবে অবস্থান করেন। প্রায় ৬২ বছর যাবৎ বৌদ্ধধর্ম চর্চা, ধারণ, প্রতিপালন এবং প্রচার করে ২০১২ সালের

৩০ জানুয়ারি তারিখে তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হয়।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের জীবিত সন্তা আজ আমাদের মাঝে নেই। তাঁর নশ্বর দেহ এখনো রাজবন বিহারে সংরক্ষিত আছে। এখনো প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থী এবং দর্শক তাঁর দেহকে সম্মান জানাতে আসে এবং তাঁর বাণীবদ্ধ দেশনা শ্রবণ করে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। সেদিক বিবেচনায় বলা যেতে পারে সজীব বনভন্তের চাইতে নির্জীব বনভন্তের গুরুত্ব কোনো অংশে কম নয়। তাঁর দেশিত ধর্ম এখনো সদ্ধর্মানুরাগী বৌদ্ধ নরনারী এবং তাঁর গড়ে তোলা শিষ্যসংঘের মাধ্যমে পরিচালিত বিভিন্ন বিহারে প্রত্যহ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর জীবদ্দশায় সমগ্র ত্রিপিটক (পালি, বার্মীজ এবং ইংরেজি) সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। তাঁর অন্তিম ইচ্ছে ছিল, বিশ্বশান্তি প্যাণোডা নির্মাণ এবং সমগ্র ত্রিপিটক বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা। এ তুটির কোনোটিই তাঁর জীবদ্দশায় সম্পন্ন হয়ন। তবে তাঁর অনুপস্থিতে এ তুটি কাজ এগিয়ে যাচ্ছে তুর্বার গতিতে। ত্রিপিটক প্রকাশনা এবং বিশ্বশান্তি প্যাণোডা নির্মাণের ব্যয়ভারের অর্থ শ্রদ্ধেয় বনভন্তের জীবৎকালে সংগ্রহও হয়নি। কিন্তু অর্থের অভাবে কাজ থেমে থাকেনি। সদ্ধর্মপ্রাণ এবং সদ্ধর্মানুরাগী দায়ক-দায়িকাবৃন্দ এবং তাঁর শিষ্যমণ্ডলীদের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থে এ মহান ২টি কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে। ত্রিপিটক প্রকাশনার জন্য ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১২ খ্রিস্টাব্দে গঠন করা হয়েছে "ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ" নামে একটি ধর্মীয়ে প্রকাশনা সংস্থা।

- এ সোসাইটির সদস্য-সদস্যাদের নিয়ে গঠন করা হয়েছে ৪টি পরিষদ। এগুলো হচ্ছে:
- (ক) **উপদেষ্টা পরিষদ** : এই পরিষদে শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির মহোদয়কে আহ্বায়ক এবং সদস্য যথাক্রমে শ্রীমৎ ভৃগু মহাস্থবির, শ্রীমৎ সৌরজগৎ

মহাস্থবির এবং শ্রীমৎ শাসন রক্ষিত মহাস্থবির মহোদয়ের সমন্বয়ে গঠিত।

- (খ) **সাধারণ পরিষদ :** সমিতির সকল সদস্য-সদস্যাই এ পরিষদভুক্ত।
- (গ) সম্পাদনা পরিষদ: শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত মহাস্থবির মহোদয়কে আহ্বায়ক করে সদস্য যথাক্রমে শ্রীমৎ বিধুর মহাস্থবির, করুণাবংশ স্থবির, সম্বোধি স্থবির, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু এবং সীবক ভিক্ষুর সমন্বয়ে গঠিত।
- ্ঘ) কার্যনির্বাহী পরিষদ: বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বাবু মধু মঙ্গল চাকমাকে সভাপতি, বাবু অরুণ বিকাশ তালুকদারকে সাধারণ সম্পাদক এবং বাবু ধনবীর চাকমাকে অর্থসম্পাদক করে ২৭ সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটি গঠিত।

পরবর্তীকালে গঠনতন্ত্র সংশোধন করে রাঙামাটিতে অবস্থানরত সদস্যগণের নিয়ে ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, প্রতিনিধি পরিষদ, রাঙামাটি নামে ২১ সদস্যবিশিষ্ট এক কমিটি গঠন করা হয় এবং ১৪ আগস্ট ২০১৫ ও ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে সাধনানন্দ (বনভন্তে) কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি রাঙামাটি রাজবন বিহারে সোসাইটির সম্পাদনা পরিষদ, প্রতিনিধি পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সমন্বয়ে ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে সভায় শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত মহাস্থবিরকে আহ্বায়ক এবং বাবু প্রিয় কুমার চাকমাকে সদস্য সচিব করে ৯ সদস্যবিশিষ্ট "বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনা কমিটি" গঠিত হয়।

বিগত ২০১৬ সালের ৩০ জানুয়ারি রাঙামাটি রাজবন বিহারের অফসেট প্রেসে আনুষ্ঠানিকভাবে ত্রিপিটক ছাপানোর কাজ শুরু হয়। এ মহতী কাজের শুভ উদ্বোধন করেন রাজবন বিহারের আবাসিক প্রধান ও বনভন্তের শিষ্যসংঘের প্রধান শ্রন্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির মহোদয় ও চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়।

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ত্রিপিটক পাবলিশিং

সোসাইটির সদস্য সংখ্যা ৯৭৬জন। সোসাইটির প্রত্যেক সদস্যের মাসিক প্রদেয় অর্থ এবং সদ্ধর্মানুরাগী দায়ক-দায়িকা, উপাসক-উপাসিকা এবং শ্রদ্ধেয় ভিক্ষুসংঘের এককালীন প্রদন্ত অর্থে সমগ্র ত্রিপিটক বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভবপর হচ্ছে। সদ্ধর্মানুরাগী দায়ক-দায়িকা, উপাসক-উপাসিকা, ভিক্ষুসংঘ এবং শুভানুধ্যায়ীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল হচ্ছে শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবিরের (বনভন্তের) স্বপ্লের সফল বাস্তবায়ন—বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনা।

এ ত্রিপিটক প্রকাশনা শুধু বৌদ্ধদের গৌরবের বিষয় নয় এ গৌরব বাংলা ভাষারও। একসময় বাংলার সূর্য সন্তান অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান তিব্বতে আলোকশিখা জ্বালিয়ে ছিলেন। তাঁর জন্মভূমি বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রভাষা বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ নিঃসন্দেহে গৌরবের। এতে বাংলা ভাষা ঋদ্ধ হয়েছে, সমৃদ্ধ হয়েছে। মহামতি বুদ্ধের পরিনির্বাণের ২৫৬০ বছর পর স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এবং অভিনন্দনযোগ্য।

২০১৯ সালের ৮ জানুয়ারি শ্রদ্ধেয় বনভন্তের শততম জন্মদিন উদ্যাপন উপলক্ষে ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটির উদ্যোপে সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশের পরিকল্পনা ছিল। ত্রিপিটকের মোট ৫৯টি বইকে ২৫ খণ্ডে ভাগ করে "পবিত্র ত্রিপিটক" নামে রয়েল সেট আকারে প্রকাশের জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু "শুভস্য শীঘ্রম্"—এ কথাটি বিবেচনায় রেখে পূর্বনির্ধারিত তারিখের প্রায় দেড় বছর আগে এটি প্রকাশ করতে যাচ্ছে। আমি প্রকাশনার কাজে সংশ্লিষ্ট সকলকে সাধুবাদ জানাচ্ছি এবং বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনার এ উদ্যোগের সফলতা কামনা করছি।

পাশাপাশি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী অন্যান্য ভাষাভাষীদের মাতৃভাষায় (যেমন- চাকমা ও অন্যান্য ভাষায়) প্রকাশের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাই। সব্বে সন্তা সুখিতা হোন্ত । চিরং তিট্ঠতু বুদ্ধসাসনং। ■

* **লেখক পরিচিতি** : কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (উপসচিব), ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্ত্র নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি।

ত্রিপিটক সংকলন প্রকাশের তাৎপর্য

আনন্দ বিকাশ চাকমা

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বৌদ্ধধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রাঙামাটি রাজবন বিহার থেকে বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ মূল ত্রিপিটকের বাংলায় অনূদিত খণ্ডগুলোর একটি বৃহৎ সংকলন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। খ্রিষ্টীয় একুশ শতকের বাংলাদেশি বৌদ্ধদের জন্য এটি একটি গৌরবময় অর্জন। বৌদ্ধমাত্রেই অবগত আছেন যে বুদ্ধের ধর্মোপদেশ, ধর্মতত্ত্ব যা সূত্র, বিনয় ও অভিধর্মাকারে বিন্যস্ত. তাই 'ত্রিপিটক' নামে পরিচিত। ৮৪ হাজার ধর্মস্কন্ধ খ্যাত ত্রিপিটকের মধ্যে ২১ হাজার ধর্মস্কন্ধ সূত্রে. ২১ হাজার বিনয়ে ও অবশিষ্ট ৪২ হাজার অভিধর্মপিটকে ধারণ করা আছে। এ তিনটি বৃহৎ পিটক আবার অসংখ্য খণ্ডে ও উপখণ্ডে বিভক্ত। এর মধ্যে বেশ কিছু খণ্ডের বঙ্গানুবাদ বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। কোনো কোনো খণ্ড পালিতেই গ্রন্থিত আকারে আছে। সুতরাং পূর্বে প্রখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিতবর্গের বাংলায় অনূদিত খণ্ডণ্ডলোসহ নতুন অনূদিত খণ্ডণ্ডলোকে সংগ্ৰহ ও সম্পাদনা করে একটি বৃহৎ সংকলন তথা পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক প্রকাশ করা কোনো সহজসাধ্য কাজ নয়। এজন্য দরকার অদম্য উদ্যম, নিরন্তর কর্মস্পহা, মহাপরিকল্পনা, সর্বোপরি বিপুল আকারের অর্থসংস্থান। শুধু তাই নয় অনুবাদকর্মের সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ যুক্ত ব্যক্তিমাত্রই জানেন অনুবাদকর্মটিই একটি প্রচণ্ড কষ্টসাধ্য, ক্লেশকর কাজ। অনুবাদকের ভাষাগত সাবলীলতা, দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের কথা তো বাদই দিলাম। অপরিমেয় ধৈর্য ও ধর্মের মর্যাদা রক্ষা ও প্রচারের প্রতি সামাজিক দায়বদ্ধতা ছাডা অনুবাদে প্রবৃত্ত হওয়া যায় না। নিবেদিত ও দক্ষ অনুবাদকের অভাব পুরণ হলেও সম্পাদনা, গ্রন্থা, প্রকাশনা ও পর্যাপ্ত অর্থসংস্থানের জন্য অতীব দরকার একদল ত্যাগী. কর্মযোগী সম্পাদক ও সমন্বয়কারীর যাঁদের অক্লান্ত শ্রম, সাধনা ও কর্মদক্ষতার গুণে সুসম্পন্ন হতে পারে বৃহৎ আকারে সংকলন প্রকাশের মতো মহাযজ্ঞ।

আজ এসব কিছুর সম্মিলন ঘটানো সম্ভব হয়েছে পরিনির্বাণপ্রাপ্ত বনভন্তের স্বপ্নের অফুরন্ত অনুপ্রেরণায় ও পুণ্যময় আশীর্বাদে। বনভন্তের স্বপ্ন ছিল একদিন রাজবন বিহার থেকে সমগ্র ত্রিপিটক পালি থেকে বাংলায় অনুবাদ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হবে। আজ তাঁর সেই মহৎ ও সুদূরপ্রসারী স্বপ্লের বাস্তবায়ন ঘটতে চলেছে দেখে ধরাধামে প্রীতিসুখের জোয়ার বইছে। বলা নিষ্প্রয়োজন তাঁর সুদক্ষ শিষ্যমণ্ডলী তথা রাজবন বিহরের ভিক্ষুসংঘের সুস্পষ্ট পরিকল্পনায় এবং দায়ক-দায়িকাসহ সকল স্তরের বৌদ্ধ নরনারীদের সার্বিক সহযোগিতার ফলেই এই মহাযজ্ঞটি সম্পাদন সম্ভবপর হয়েছে। বনভত্তের সাতজন শিষ্যবর্গ শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত মহাস্থবিরের আহ্বায়কতে ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে আজ অবধি ত্রিপিটক সংকলন সম্পাদনার সঙ্গে বিগত পাঁচটি বছর ওতপ্রোতভাবে সম্পুক্ত থেকে কাজটি সুসম্পন্ন করেছেন। জ্ঞান ও প্রজ্ঞাসম্প্রযুক্ত তাঁদের এই কীর্তি অতীব প্রশংসনীয় এবং কালোত্তীর্ণ। পাশাপাশি তাঁদের এই কর্মটি গুরুভক্তির একটি বিরলতম দৃষ্টান্ত। বৌদ্ধধর্মের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এটি একটি নবতর অধ্যায়ের সংযোজন বললেও অত্যুক্তি হয় না।

২০১২ সালে পবিত্র ত্রিপিটকের সমগ্র খণ্ডণ্ডলো বাংলায় অনুবাদ করে সংকলন প্রকাশের জন্য গঠিত হয় 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি'। সেই থেকে যাত্রা শুরু । অতঃপর প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয়ে ২৫ খণ্ডের ত্রিপিটক সংকলন প্রকাশের মধ্য দিয়ে সেই যাত্রার সফল সমাপ্তির মাহেন্দ্রক্ষণ আজ উপস্থিত । এই দীর্ঘ পদযাত্রায় যেসব ধর্মপ্রাণ ও আর্থিকভাবে স্বচ্ছল দায়ক-দায়িকাগণ পরম পূজনীয় ভিক্ষুসংঘের ধর্মাশ্রয়ী ও কল্যাণকর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন, সানন্দে এগিয়ে এসেছেন তাঁদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা থাকবে সর্বস্তরের বৌদ্ধ নরনারীর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে। বৌদ্ধধর্মের এই নতুন ইতিহাস সৃষ্টিতে

তাঁদের অবদানও বৌদ্ধ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে অনাগতকাল ধরে।

এখন আসি এই ত্রিপিটক সংকলনের তাৎপর্য অর্থাৎ এটি কেন দরকার, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বৌদ্ধদের জন্য এটি কী উপকার বয়ে আনতে পারে সে প্রসঙ্গে। প্রথমে বলবো ত্রিপিটকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো এতদিন এটি বিক্ষিপ্ত ও বিস্মৃত অবস্থায় ছিল। এই সংকলন প্রকাশনার মধ্য দিয়ে বহু বছর পর ত্রিপিটক শাস্ত্রটি একটি পরিপূর্ণ অবয়ব লাভ করলো। গ্রন্থাকারে এই সমগ্রতা লাভ ত্রিপিটকের সৌকর্যকে বহুমাত্রায় বাড়িয়ে দিল। নতুন আঙ্গিকে, নতুন মলাটে বাঁধানো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পালি ও বডিস্ট স্টাডিজ এবং তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা এই সংকলনটি পাঠে সরাসরি উপকৃত হবে, যেমনটি উপকৃত হবেন তাঁদের শিক্ষকমণ্ডলী। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম তথা বিনয়, সূত্র ও অভিধর্মকে সম্যকভাবে অধ্যয়নের জন্য এই গ্রন্থসমাহার হবে অমূল্য অবলম্বন। শিক্ষার্থীদের লক্ষ্যে পৌঁছার বড় সহায়ক। সারা বাংলাদেশে যে হাজার তিনেক বৌদ্ধ বিহার ও অনাথ আশ্রম আছে সেসব বিহারগুলোতে বসবাসকারী ভিক্ষুসংঘকে গতানুগতিকভাবে বৌদ্ধধর্মীয় গুরু ছাড়াও পালি টোলকেন্দ্রিক ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠদান কাজে নিযুক্ত

বনভন্তের স্বপ্ন ছিল একদিন রাজবন বিহার থেকে সমগ্র ত্রিপিটক পালি থেকে বাংলায় অনুবাদ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হবে। আজ তাঁর সেই মহৎ ও সুদূরপ্রসারী স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটতে চলেছে দেখে ধরাধামে প্রীতিসুখের জোয়ার বইছে।

ধবধবে সাদা কাগজে মুদ্রিত গ্রন্থগুলোর পূর্ণাবয়বটি পাঠকবর্গের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ফলে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী পাঠক, গবেষক এখন এই সংকলনটি থেকে সবকিছু হাতের নাগালে পেয়ে যাবেন। একজন কৌতূহলী পাঠকের এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর হয় না। এ প্রাপ্তি বড় সুখকর ও প্রীতিদায়ক। বৌদ্ধধর্ম শুধু একটি ধর্মবিশ্বাস নয়। এটি জগতে বিদ্যমান জ্ঞানকাণ্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা বা শাস্ত্রও। বৌদ্ধদর্শন দার্শনিক জ্ঞান জগতেও বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। সুতরাং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে শুধু নয় জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বয়ানের (ডিসকোর্স) দৃষ্টিকোণ থেকেও সংকলনটির প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। কারণ বাংলাদেশ ও পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষাভাষী বহুসংখ্যক লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বৌদ্ধধর্ম চর্চা, অধ্যয়ন ও গবেষণায় নিয়োজিত আছেন। তাদের জন্য এই সংকলনটি একটি আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে। বাংলাদেশের কলেজ

থাকতে হয়। তাঁদের নিজস্ব জ্ঞান, দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য বৃদ্ধির সহায়ক হিসেবে অর্থাৎ শিক্ষকের শিক্ষক-সহায়িকা হিসেবে ভূমিকা পালন করবে বাংলায় প্রকাশিত এই ত্রিপিটক সংকলন।

এই তো গেল পাঠ-সহায়ক রেফারেন্স বই হিসেবে এই সংকলনগুলোর প্রয়োজনীয়তা। সাধারণভাবে বৌদ্ধধর্মের বিস্তারে এর গুরুত্ব বা তাৎপর্য কী হতে পারে? একজন সাধারণ গৃহী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হিসেবে এবং আমার শৈশব-কৈশর এবং ছাত্রজীবনে দেখা অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি এই ত্রিপিটক সংকলন বৌদ্ধসমাজে একটি বিরাট পুস্তকীয় শূন্যতা পূরণ করবে। আমি বা আমরা যারা গ্রাম পর্যায়ে জন্মেছি, বড় হয়েছি এবং পড়ালেখা করেছি তারা বৌদ্ধর্ম সম্পর্কে কী জেনেছি। জেনেছি পাঠ্যবইগুলোতে লেখা কয়েকটি বন্দনা, গাথা বা থের-থেরীর জীবনী। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম শুধু কয়েকটি বন্দনা ও গাথা জানার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটির মহাসমুদ্রতুল্য বিশালতার অতল তলের গভীরে

গিয়ে মুক্তা আহরণের সুযোগ আমাদের সামনে ছিল না। এমনকি বাসাবাড়িতেও কোনো ধর্মীয় বই থাকতো না। বৌদ্ধ বিহারে গেলে ভন্তেরা পঞ্চশীল আবৃত্তি করাতেন (এখনো করান), উৎসর্গ মন্ত্র পাঠ করেন এবং করান, তারপর একটি সূত্রপাঠ করেন আর শ্রোতারা বা পুণ্যার্থীরা শ্রবণ করেন। এইটুকুই বৌদ্ধধর্ম। ওই সূত্র দারা বুদ্ধ বা ভন্তে কী বলেছেন, কী বুঝাতে বা কোন প্রেক্ষাপটে, কাকে উদ্দেশ করে দেশনা করেছেন, ওই সূত্রের অন্তর্নিহিত শিক্ষা কী, কেউ কোনোদিন জানেনি, ভয়ে বা লজ্জায় বা পাপ হবে মনে করে কেউ ভন্তেদের জিজ্ঞেসও করেনি। এভাবেই ছিল বাসাবাড়িতে পরিত্রাণ পাঠ করে শোনানো। এগুলোর কী তাৎপর্য সেটিও কোনোদিন বুঝার সুযোগ হয়নি। সাদামাটা কথা বুদ্ধের অমৃত বাণী শ্রবণে পুণ্য লাভ হয় এটুকুই। পালি ভাষা কেউ বোঝে না। ব্যাখ্যা ও তর্জমা করতে পারে না। গ্রামীণ সমাজজীবনে এ নিয়ে কোনো আলোচনা বা গল্প-গুজবও শুনিনি। সমালোচনা হতো ভন্তেদের দোষগুণ নিয়ে। ধর্মের মাহাত্ম্য বা তাৎপর্য উদ্ধারের চেষ্টা কখনো গোচরীভূত হয়নি। পারিবারিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ পাঠের অভ্যাস তো নেইই। অবশ্য পুস্তক না থাকলে পড়ার অভ্যাসই গড়ে উঠবে কী করে! তারপরও বিংশ শতকের শেষ চতুর্থাংশে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি বৌদ্ধসমাজে ধর্মের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ক্রমাগত বেড়েছে. তবে সেটা বনভন্তের চমকপ্রদ ধর্মব্যাখ্যা ও বাস্তবানুগ উপমাসমৃদ্ধ দেশনার মাধুর্যতায় ও উঁনার নির্মল. পরিশুদ্ধ ভিক্ষু জীবনাচরণের জনপ্রিয়তার কারণে। এখন শ্রদ্ধেয় বনভন্তে আমাদের মাঝে নেই। তাঁর শূন্যতা অপূরণীয়। সহজপাঠ্য ধর্মীয় গ্রন্থের অভাব তো দীর্ঘদিনের। যাই হোক এবার মনে হচ্ছে এই পরিস্থিতির কিছুটা অবসান হবে। প্রতিটি গ্রামে বা পাড়ায় বৌদ্ধ বিহার আছে। প্রতি বিহারে বিহারে এই সমুদয় সংকলনটি সংগ্রহে থাকবে। সেই সুবাদে ভিক্ষুসংঘ সেগুলো অধ্যয়ন করে সাধারণ মানুষকে পালি থেকে বাংলা ও বাংলা থেকে চাকমা, মারমা, তঞ্চস্যা ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন। গৃহীরা গৃহীদের জন্য প্রযোজ্য খণ্ডণ্ডলো বিশেষ করে সূত্রপিটকে প্রদত্ত বুদ্ধের

অমিয় উপদেশগুলো সংগ্রহ করে নিজ দায়িত্বে পড়ে নিতে পারবেন। এতে ধর্মের সারবস্তু লাভ করা সহজতর হবে। ১৯৭৪-২০১২ সাল পর্যন্ত ৩৮ বছর ধরে শ্রন্ধের বনভন্তে কী বলতে চেয়েছিলেন তার মর্মার্থ উদ্ধার সহজতর হবে। মানুষ বৌদ্ধর্মের শিকড় থেকে অশ্বত্থ বৃক্ষের মতো বিস্তৃত ডালপালা শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে জানতে পারবে। একটি জ্ঞানযুক্ত, মিথ্যাদৃষ্টিবর্জিত, ধর্ম-বিনয়াবনত বৌদ্ধসমাজ গড়ে উঠবে। বৌদ্ধর্মীয় জ্ঞান বিস্তারেও এ গ্রন্থগুলোর গুরুত্ব অসীম। এ গ্রন্থগুলাকে বৌদ্ধর্মীয় জ্ঞানের রিজার্ভ ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ যেমন যেকোনো সময় যেকোনো প্রয়োজনে সংগ্রহ করা যায়। তেমনি এই সংকলনটি হাতের কাছে থাকলে বৌদ্ধর্মর্মর পরমার্থ জ্ঞান আহরণ করে সত্যধর্মকে সাক্ষাৎ করে জীবনকে সুখী-সমৃদ্ধ করা যাবে।

আমার এখনো সৌভাগ্য হয়নি গ্রন্থগুলোর অনুবাদ নিবিড়ভাবে পাঠ করার। সুতরাং অনুবাদকর্মের গুণগত উৎকর্ষতা নিয়ে এখানে আলোচনার অবকাশ একেবারে নেই। রাজবন অফসেট প্রেস থেকে ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটির উদ্যোগে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলো আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে মানসম্মত হয়েছে বলবো। এবারের অনুবাদকর্মে যারা যুক্ত ছিলেন সেই সব অনুবাদকগণ প্রত্যেকেই লেখক হিসেবে ইতিমধ্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুতরাং সুলিখিত, সুখপাঠ্য, প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য অনুবাদকর্মটিই তারা পাঠকদের হাতে তুলে দেবেন এ প্রত্যাশা সকলের। গ্রন্থে সন্নিবেশিত বানান ও অক্ষর বিন্যাস এবং মুদুণ ও বাঁধাই কর্মটিও গভীর মনোযোগ দাবি করে। এ ব্যাপারে সংযত ও সজাগ দৃষ্টি সংকলনগুলোর আঙ্গিক দিকটিও আকর্ষণীয় করে তুলবে এ কামনা থাকলো।

পরিশেষে আমাকে প্রকাশিতব্য ত্রিপিটক সংকলন সম্পর্কে কিছু অগোছালো এলোমেলো মন্তব্য প্রকাশের সুযোগ দিয়ে মহাপুণ্যের অংশীদার করার জন্য শ্রদ্ধেয় বিধুর ভন্তের প্রতি রইল সহস্র বন্দনা ও কৃতজ্ঞতা। ■

"সকল প্ৰাণী সুখী হোক!"

^{*} লেখক পরিচিতি: আনন্দ বিকাশ চাকমা, সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, চউগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চউগ্রাম।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পটভূমি ও সোসাইটির সামগ্রিক কার্যক্রমের প্রতিবেদন

অরুণ বিকাশ তালুকদার

ভদন্ত/সুধীবৃন্দ,

বন্দনা, অভিনন্দন ও মৈত্রীময় শুভেচ্ছা। আজ বাংলাদেশে পার্বত্যাঞ্চলে বৌদ্ধ জাতির অবিস্মরণীয় একটি ঐতিহাসিক দিন বৌদ্ধ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হতে যাচ্ছে। দিনটি কোনো মহাপুরুষের জন্ম কিংবা বৈজ্ঞানিকের কোনো নতুন আবিদ্ধার নয়। এ অঞ্চলে বৌদ্ধ জাতির বংশপরম্পরা এক অমূল্য জাতীয় সম্পদ অর্জনের শুভ ও পুণ্যময় দিন, যা এদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসে কালের স্মৃতি হয়ে থাকবে অনন্তকাল।

জন্মগতভাবে আমরা বৌদ্ধর্মাবলম্বী। মহামতি গৌতম বুদ্ধের প্রবর্তিত ও প্রচারিত এ ধর্ম আড়াই হাজার বছর কালাধিক যাবং বৌদ্ধ প্রতিরূপ দেশসহ বিশ্বের নানা দেশে প্রতিপালিত হয়ে আসছে। এ কর্মবাদী ও আচরণীয় ধর্মের নীতি-শিক্ষা ত্রিদ্বারে আচরণ করে অনেকেই মানব জীবনকে ধন্য ও সার্থক করেছেন, যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পার্বত্যাঞ্চলের বৌদ্ধ জাতির নন্দিত ও বন্দিত মহাপুরুষ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে। যিনি ধ্যানে-জ্ঞানে, বুদ্ধভাষিত নীতি-শিক্ষায় এ অঞ্চলে নিম্প্রভ বৌদ্ধর্মকে উজ্জ্বল করে বৌদ্ধজনমনে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে আজও দীপ্তিমান।

সুদীর্ঘ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) বছরব্যাপী মহাকারুণিক তথাগত বুদ্ধ যে ধর্মবাণী প্রচার করেছিলেন তারই সমন্বিত রূপ হলো 'ত্রিপিটক'। এ ত্রিপিটক শিক্ষা ছাড়া পরিপূর্ণ ধর্মজ্ঞান অর্জন করা যে কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। ত্রিপিটক নানা দেশে নানা ভাষায় রচিত হলেও এ দেশের এ অঞ্চলে সহজবোধ্য ভাষা বাংলায় পূর্ণাঙ্গ ও সমগ্র ত্রিপিটক এর আগে প্রকাশিত হয়ন। পালি ও ইংরেজি ভাষায় রচিত ত্রিপিটক পাঠ করে বুদ্ধভাষিত নীতিশিক্ষা জানা লোক এ অঞ্চলে নেই বললেই চলে। তাই, পুজ্য বনভন্তে তাঁর জীবদ্দশায় বৌদ্ধজনগণের এ

বাস্তব অবস্থা সদ্ধর্ম জ্ঞানে অনুধাবন করে সমগ্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। অত্যন্ত শোকাহত হৃদয়ে কিন্তু শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হচ্ছে যে, বিগত ৩০ জানুয়ারি ২০১২ খ্রি. তিনি জগতের অমোঘ রীতির কাছে হার মেনে পরিনির্বাপিত হলে তাঁর সেই স্বপ্ন স্বপুই রয়ে যায়।

পূজ্য বনভন্তের এ মহান মানবকল্যাণকর স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানের লক্ষ্যে এবং এ অঞ্চলে বুদ্ধশাসন ও বনভন্তের অনুশাসন সুরক্ষা ও দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে তাঁর সুযোগ্য ও আদর্শিক শিষ্যমণ্ডলী ভিক্ষুসংঘ এবং গুণমুগ্ধ সদ্ধর্মপ্রাণ ভক্ত-অনুরাগী দায়ক-দায়িকাদের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি'। এটি পার্বত্যাঞ্চল তথা বাংলাদেশের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর ধর্মজ্ঞান চর্চার একটি পবিত্র প্রকাশনা সংস্থা।

এ সংস্থা প্রতিষ্ঠায় যাদের গৌরবোজ্বল ভূমিকা ও মহতী উদ্যোগ ছিল আমি তাঁদের সকলকে বন্দনা, প্রাণোচ্ছল অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মৈত্রীময় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। তন্মধ্যে সর্বাগ্রে শ্রদ্ধাবনতচিত্তে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনার স্বপ্নদ্রষ্টা, অকৃতদার জ্ঞানতাপস ও সদ্ধর্মের পথিকৃৎ পরিনির্বাপিত পরম পূজ্য বনভন্তেকে। যিনি পার্বত্যভূমিতে বৌদ্ধকুলে জন্মগ্রহণ না করলে এমন পুণ্যকর্ম করার সুযোগ সৃষ্টি হতো কি না যথেষ্ট সন্দেহ। তিনি আমাদের পরমারাধ্য, পরম কল্যাণমিত্র ও বর্তমান কালের ক্ষণজন্যা মহামানব।

এরপর উপদেষ্টা পরিষদের পূজনীয় ভিক্ষুসংঘ যারা সোসাইটির জন্মলগ্ন থেকে সময়-সুযোগে সোসাইটির সাংগঠনিক কর্মকৌশল ও আর্থিক ব্যবস্থাপনাসহ প্রকাশনা কাজে সাফল্য লাভে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার হিতোপদেশ ও আশীর্বাদ প্রদান করে উৎসাহ যুগিয়েছেন আমি তাঁদের সকলকে পরম ভক্তিসহকারে অভিবাদন ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তন্মধ্যে উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য ও পানছড়ি শান্তিপুর অরণ্য কুটিরের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ শাসন রক্ষিত মহাস্থবির ভন্তের হিতোপদেশ একান্তভাবে স্মরণীয়। তিনি বলতেন. সংগঠনের জন্য তহবিল গড়ে তোলা হয় এবং সংগঠনের স্বার্থে এ অর্থ খরচ হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে হিসাব-নিকাশ নির্ভুলভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে যাতে পরস্পরের মধ্যে সন্দেহ-অবিশ্বাসের জন্ম না নেয়। এমনকি পরিণামে সংগঠনের ভাবমূর্তি বিনষ্ট ও ভাঙন সৃষ্টি না হয়। সর্বোপরি সংগঠন দীর্ঘস্থায়ী করার স্বার্থে ব্যক্তিগত অহংকার, রাগ ও হিংসা মন থেকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে নেতৃত্বের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রেখে ঐক্যবদ্ধভাবে কার্জ করলে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব হয়। শ্রদ্ধেয় ভত্তের এ হিতোপদেশ সদস্যগণকে খুবই অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছে যার দরুন আজও তাঁর প্রতিটি উপদেশ লালন ও পালনে সবাই সচেষ্ট ও আন্তরিক।

এ ছাড়াও সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় যার ও যাদের প্রথম ও প্রধান উদ্যোগ ছিল এবং যার সান্নিধ্যে ও সাহচর্যে ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি প্রতিষ্ঠার গোড়াপত্তন সূচিত হয়েছিল তিনি হলেন পূজ্য বনভন্তের আদর্শিক শিষ্য ও সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ করুণাবংশ স্থবির ভত্তে। এখানে স্মর্তব্য যে, ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে শ্রদ্ধেয় ভত্তে বর্ষাবাস পালনের উদ্দেশ্যে রাঙামাটি রাজবন বিহার হতে খাগডাছডি সদরস্থ রাঙ্গাপানিছড়া শান্তিগিরি বনভাবনা কুটিরে যান। তথায় তিনি ধর্মীয় চেতনায় বিশ্বাসী ও সামর্থ্যবান উৎসাহী লোক পাওয়া গেলে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনার যে স্বপ্নসাধ ছিল পূজ্য বনভন্তের, তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে উদ্যোগ নেওয়ার সদিচ্ছা ব্যক্ত করেন তৎকালীন কুটির অধ্যক্ষ শ্রন্ধেয় আর্যদীপ ভন্তের সমীপে। 'বন্ধন সংঘ' খাগড়াছড়ি তথা ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটির বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদের আমরা কতিপয় সদস্য শ্রদ্ধেয় ভত্তের ব্যক্ত করা সদিচ্ছা বিস্তারিত জানার জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করি। সাক্ষাতে তিনি শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রগুপ্ত ভন্তেসহ পূজ্য বনভন্তের শিষ্যমণ্ডলী ভিক্ষসংঘের সমন্বয়ে সংস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রকাশনা কাজে উদ্যোগ গ্রহণের অভিপ্রায় জানান এবং ত্রিপিটক

প্রকাশনার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, সাংগঠনিক বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা ও অর্থের উৎসসহ যাবতীয় বিষয়ে যৌক্তিক ধারণা উপস্থাপন করেন। তাঁর যুক্তিভিত্তিক আলোচনা ও মনের দৃঢ়তায় আশ্বস্ত হয়ে নিঃসন্দেহে এটি একটি মহাপুণ্যের কাজ ভেবে আমরা শ্রদ্ধেয় ভন্তেকে কিছুদিন পর আমাদের আগ্রহ ও সক্রিয় সহযোগিতার পূর্ণ আশ্বাস দিই। তখন হতে শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রগুপ্ত ভন্তে, শ্রদ্ধেয় বিধুর ভন্তে ও শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনায় মহৎ ও সং উদ্দেশ্য নিয়ে ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রম শুরু করা হয়।

সোসাইটির সম্পাদনা পরিষদ তথা প্রকাশনা কমিটির আহ্বায়ক শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রগুপ্ত ভন্তের সুদক্ষ পরিচালনায় এবং তৎসংশ্লিষ্ট ভিক্ষুসংঘের কর্মের স্পৃহা, নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা ও সোসাইটির কার্যনির্বাহী পরিষদের নিবেদিতপ্রাণ সদস্যগণের অদম্য উৎসাহ ও ত্যাগের বিনিময়ে ধীরে ধীরে সোসাইটির সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটে। সদস্যগণের মাসিক শ্রদ্ধাদান ও দাতাগণের এককালীন শ্রদ্ধাদানের অর্থে ব্যাংক একাউন্ট খোলার মাধ্যমে তহবিল গড়ে ওঠে। সোসাইটিতে সদস্যভুক্ত হওয়ার জন্য ধর্মাচারীদের উৎসাহ লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। দিনে দিনে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তহবিলে অর্থ বাড়তে থাকে এবং প্রকাশনায় হাত দেওয়া সম্ভব হয়। পূজ্য বনভন্তের জীবদ্দশায় লালিত মানবহিতকর স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁর সুযোগ্য শিষ্যসংঘের এটি একটি যুগোপযোগী সাহসী পদক্ষেপ ও মহৎ পুণ্যচেতনার কর্মপ্রয়াস বললে অত্যুক্তি হবে না। তাঁদের অনবদ্য মহান এ কৃতিত্ব ও অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে যুগে যুগে। আমি শ্রদ্ধেয় ভিক্ষুসংঘের ব্রহ্মচর্যজীবনের সার্বিক সফলতা ও নিরোগ দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

এরপর সোসাইটির সদস্যপদ লাভ করে যারা এ
যাবৎ অকাতরে মাসিক শ্রদ্ধাদান দিয়ে এসেছেন, যারা এ
মহান পুণ্যকর্মে ভাগীদার হতে দাতা হিসেবে এককালীন
অর্থ দিয়েছেন, যারা বাংলায় প্রকাশিত ত্রিপিটক সেট
সংগ্রহের জন্য অগ্রিম মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে গ্রাহক
নিবন্ধন করেছেন এবং যারা গুভাকাক্ষী হিসেবে
প্রকাশনার আগু সাফল্য কামনা করেছেন আমি তাদের
সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচিছ।
একতা, সততা ও আদর্শ নিয়ে মহৎ উদ্দেশ্যে কাজ
করলে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে কোনো ষড়যন্ত্র বা

অপশক্তিই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, এ বাস্তব সত্য আজকের ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি কর্তৃক বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনার সাফল্য তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পর এ যাবৎ আমাদের যে ১২জন সহসাথী সদস্য/সদস্যা পৃথিবীর সকল মায়া-বন্ধন ছিন্ন করে লোকান্তরিত হয়েছেন, সোসাইটির অগ্রগতিতে তাদের সকলের অবদান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। এ মহান পুণ্যানুষ্ঠানের শুভদিনে, শুভক্ষণে সমবেত সকলের পুণ্যের প্রভাবে তাদের প্রত্যেকের পারলৌকিক শান্তি ও মঙ্গল কামনা করছি এবং শোকাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচিছ। সকলের জ্ঞাতার্থে নিম্নে তাদের পরিচিতি তুলে ধরছি।

ক্র. নং	নাম ও ঠিকানা	পেশা ও পদবী	মৃত্যুর তারিখ
٥٥	প্রয়াত মি. প্রদ্যুৎ কান্তি চাকমা	চাকুরি, ভি. এফ. এ.	১৫-০২-২০১৩ খ্রি.
	পানখাইয়াপাড়া, খাগড়াছড়ি সদর,	মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি	
	খাগড়াছড়ি		
૦ર	প্রয়াত মি. পূর্ণধর চাকমা	সুপার, জেলা হিসাব রক্ষণ	২৮-০৬-২০১৩ খ্রি.
	মধুপুর, খাগড়াছড়ি সদর, খাগড়াছড়ি	কার্যালয়, খাগড়াছড়ি	
೦೦	প্রয়াত মিসেস মিনতি চাকমা	অফিস সহকারী, জেলা	১২-০১-২০১৪ খ্রি.
	মিলনপুর, খাগড়াছড়ি সদর, খাগড়াছড়ি	প্রশাসকের কার্যালয়, খাগড়াছড়ি	
08	প্রয়াত মিসেস অরুণা দেবী চাকমা	ইউনিয়ন সমাজকর্মী, মহালছড়ি,	১১-০৫-২০১৪ খ্রি.
	উপালী পাড়া, খাগড়াছড়ি সদর,	খাগড়াছড়ি	
	খাগড়াছড়ি		
90	প্রয়াত মিসেস নমিতা দেওয়ান	গৃহিণী	০৫-১০-২০১৫ খ্রি.
	কলেজ গেইট, রাঙ্গামাটি		
০৬	প্রয়াত মি. সরোজ কুমার চাকমা	চাকুরী (অবসরপ্রাপ্ত)	২০১৫ খ্রি.
	রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি		
०१	প্রয়াত মি. রবিচন্দ্র চাকমা	উপসহকারী প্রকৌশলী	০৪-০৮-২০১৬ খ্রি.
	দ. কালিন্দীপুর, রাঙ্গামাটি	(অবসরপ্রাপ্ত) এলজিইডি	
ob	প্রয়াত মি. মহেন্দ্র নারায়ণ চাকমা	চাকুরী (অবসরপ্রাপ্ত)	২০-১১-২০১৬ খ্রি.
	উত্তর খবং পড়িয়া, খাগড়াছড়ি সদর,		
	খাগড়াছড়ি		
୦ର	প্রয়াত মি. অন্তর্যামী চাকমা	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্ৰক	১৫-০১-২০১৭ খ্রি.
	মিলনপুর, খাগড়াছড়ি সদর, খাগড়াছড়ি	(অবসরপ্রাপ্ত)	
20	প্রয়াত আদিত্য কিশোর চাকমা	চাকুরী	০৪-০৩-২০১৭ খ্রি.
	নোয়াপাড়া, খাগড়াছড়ি সদর,		
	খাগড়াছড়ি		
77	প্রয়াত মিসেস অমিতা চাকমা	গৃহিণী	১৫-০৬-২০১৭ খ্রি.
	দ. কলিন্দীপুর, রাঙ্গামাটি		
25	প্রয়াত মিসেস বীণা চাকমা	চাকুরী	১৭-০৩-২০১৭ খ্রি.
	টিএভটি টিলা, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি		

অতঃপর সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবলোকনের জন্য সোসাইটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ যাবৎকালে সোসাইটির কার্যাক্রমের ওপর ধারাবাহিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করছি।

সোসাইটির কার্যক্রম সুষ্ঠু পরিচালনার লক্ষ্যে প্রণীত নীতিমালা ও গঠনতন্ত্রের আলোকে সাংগঠনিক কাঠামোতে চারটি পরিষদ রয়েছে। এ পরিষদগুলোর সহায়ক হিসেবে আরও দুটি পরিষদ/কমিটি গঠিত হয়। পরিষদগুলোর নাম নিম্নে বর্ণিত হলো।

- ০১. উপদেষ্টা পরিষদ
- ০২ সাধারণ পরিষদ
- ০৩, সম্পাদনা পরিষদ
- 08. কার্যনির্বাহী পরিষদ
- ০৫, প্রতিনিধি পরিষদ, রাঙ্গামাটি
- ০৬. বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনা কমিটি

এ পরিষদগুলোর সদস্যগণ পারস্পরিক যোগাযোগ ও সমন্বয়ে তাদের অর্পিত দায়িত্ব পালনে খুবই সচেতন ও আন্তরিক ছিলেন। নেতৃত্বের প্রতি, সোসাইটির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বান্তবায়নে কারোর কোনো প্রকার সন্দেহ ও অবিশ্বাস ছিল না। সকলের নিঃস্বার্থ ও ঐক্যবদ্ধ ধর্মীয় চেতনা সোসাইটির অগ্রগতি ও সাফল্যের মূল শক্তি। আমি পরিষদের সকল সদস্যগণের এ মানসিক শুভ চিন্তাধারা আগামী দিনেও যেন অব্যাহত থাকে, এ আশাবাদ জানিয়ে সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এক. সোসাইটির নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল : ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১২ খ্রি. রোজ শুক্রবার বৌদ্ধর্মীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত 'বন্ধন সংঘ' খাগড়াছড়ি এর ২৬ (ছাব্বিশ) জন সদস্যের মতৈক্যের ভিত্তিতে অত্যন্ত ঘরোয়া পরিবেশে খাগড়াছড়ি সদরের মধুপুরস্থ মি. অনুতোষ চাকমার বাসগৃহে "এডহক কার্যনির্বাহী কমিটি" গঠনের মাধ্যমে ত্রিপিটিক পাবলিশিং সোসাইটি নামে বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

দুই. কার্যক্রম শুরু: সদস্য ভর্তি ফিস ২০/- (বিশ) টাকা ও মাসিক শ্রদ্ধাদান ১০০/- (একশত) টাকা নির্ধারণ করে অক্টোবর, ২০১২ খ্রি. হতে সদস্য ভর্তির মাধ্যমে সোসাইটির প্রাথমিক পর্যায়ের সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু করা হয়।

তিন. আনুষ্ঠানিকভাবে সোসাইটির আত্মপ্রকাশ : ১৮ জানুয়ারি ২০১৩ খ্রি. রোজ শুক্রবার সোসাইটির সহ-সভাপতি (বর্তমানে প্রয়াত) মি. অন্তর্যামী চাকমার বাসভবন প্রাঙ্গণ, মিলনপুর, খাগড়াছড়ি সদরে সম্পাদনা পরিষদের পূজনীয় ভিক্ষুসংঘের সদয় উপস্থিতিতে ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে সোসাইটি আত্মপ্রকাশ ঘটে।

চার. সোসাইটির নীতিমালা ও গঠনতন্ত্র প্রণয়ন : সোসাইটির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ নীতিমালা ও গঠনতন্ত্র প্রয়োজন-হেতু সোসাইটির সদ্ধর্মপ্রাণ সদস্য মি. প্রিয় কুমার চাকমা কর্তৃক গঠনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়নের মাধ্যমে সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজনপূর্বক ২৬/০৭/২০১৩ খ্রি. এডহক কার্যনির্বাহী পরিষদ সভায় প্রণীত গঠনতন্ত্র চূড়ান্তভাবে অনুমোদন দেওয়া হয়।

পাঁচ. পূর্ণাঙ্গ কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন : গঠনতন্ত্র চূড়ান্ত অনুমোদনের পর গঠনতন্ত্রের নীতিমালা অনুসারে ১৫ আগস্ট, ২০১৩ খ্রি. সোসাইটির কার্যনির্বাহী পরিষদের মাসিক সভায় এডহক কমিটি বিলুপ্ত করে ২১ (একুশ) সদস্যবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা হয়।

ছয়. সাংগঠনিক কার্যক্রম : ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও বিশ্বাসী এমন ধর্মপরায়ণ আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী বৌদ্ধ নর-নারীগণকে ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিশদ ধারণা প্রদান এবং সামাজিক পরিবেশ পরিস্থিতি অনুকূলসাপেক্ষে ব্যক্তিবিশেষে আলোচনা ও প্রচারপত্র বিলি-বিতরণের মাধ্যমে সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। সোসাইটির উদ্দেশ্য সৎ ও মহৎ বিধায় তিন পার্বত্য জেলাসহ দেশের অন্যান্য জেলা হতে সদস্য ভর্তি ক্রমাগত বাড়তে থাকে। ফলে সোসাইটির সাংগঠনিক শক্তি যেভাবে প্রসার ঘটে তেমনি আর্থিক ভিত্তিও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এ ছাড়া সোসাইটি সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪ খ্রি. রাঙামাটি শহরে অবস্থানরত সদস্যগণের সঙ্গে রাজবন বিহার রাঙামাটিতে মতবিনিময় সভা করা হয়। অনুষ্ঠানে সম্পাদনা পরিষদের সদস্য শ্রন্ধেয় বিধুর ভত্তে ও শ্রন্ধেয় করুণাবংশ ভত্তের সদয় উপস্থিতিতে সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে রাঙামাটিতে একটি প্রতিনিধি পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বলতে দ্বিধা নেই যে, উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ খ্রি. ২১ (একুশ)

সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধি পরিষদ, রাঙামাটি গঠন করে সোসাইটির সাংগঠনিক ভিত্তি আরও গতিশীল ও সুদৃঢ় করা হয়।

সাত. সোসাইটি কার্যালয় প্রতিষ্ঠা : খাগড়াছড়ি সদরের প্রাণকেন্দ্র আর্য বনবিহার, ধর্মপুর যেখানে পূজ্য বনভন্তে তাঁর জীবদ্দশায় ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে বর্ষাবাস পালন করে উক্ত এলাকায় সদ্ধর্মের বীজ বপন করে গেছেন। তাঁকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে এবং তাঁর অনুশাসন রক্ষার্থে খাগড়াছড়ি জেলা সদরে স্থায়ীভাবে কার্যালয় প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত তাৎক্ষণিকভাবে শান্তিগিরি বনভাবনা কুটির রাঙাপানিছড়া, খাগড়াছড়ি সদরে অস্থায়ী কার্যালয় মনোনীত করে অদ্যাবধি সেখানে সোসাইটির কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, খাগড়াছড়ি শাখা, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, খাগড়াছড়ি শাখা ও ট্রাস্ট ব্যাংক, রাঙামাটি শাখায় সঞ্চয়ী হিসাব খোলা হয়েছে। যার হিসাব নং যথাক্রমে ৩৪০১-০৩১০১১২৮৩, ১০০১৭১৪৫ ও ০০৪৮০৩১০০১৮৯৪৫।

দশ. সোসাইটি নিবন্ধন : সোসাইটি প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে নিবন্ধন কাজের উদ্যোগ নেওয়া হলেও সরকারিভাবে নিবন্ধন কার্যক্রম বন্ধ থাকায় তা যথাসময়ে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে পরবর্তীকালে উপ-পরিচালক জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, মি. অমল বিকাশ চাকমা ও ফিল্ড সুপারভাইজার, উপজেলা সমাজ সেবা কার্যালয়, খাগড়াছড়ি মি. চম্পক কান্তি চাকমার আন্তরিক সহযোগিতায় ০৩ নভেম্বর ২০১৪ খ্রি. সোসাইটির

সত্যি, বৌদ্ধজাতি আজ গর্বিত ও আনন্দে উচ্ছুসিত। বৌদ্ধ জনগণের এটি এক অমূল্য সম্পদ। এ অর্জিত সম্পদকে খাটো করে দেখার কিংবা অন্য কোনো সম্পদের সঙ্গে তুলনা করার সুযোগ নেই। এক কথায় বলতে হয়, বৌদ্ধ জাতির ভাগ্যাকাশে এক নতুন সূর্যের উদয় হলো।

আট. সোসাইটি কার্যক্রমের অগ্রগতি ও পর্যালোচনা সভা : ০৭ জুন, ২০১৩ খ্রি. রোজ শুক্রবার মিলনপুর বৌদ্ধ বিহার দেশনালয়, খাগড়াছড়িতে সম্পাদনা পরিষদের প্রতিনিধি শ্রদ্ধেয় বিধুর ভন্তে ও শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তের সদয় উপস্থিতি এবং সোসাইটির কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দসহ সাধারণ সদস্যগণের সমন্বয়ে সোসাইটির কার্যক্রমে অগ্রগতি, পর্যালোচনা ও পরামর্শ বিষয়ক সভা আয়োজন করে সোসাইটির সার্বিক কার্যক্রম বেগবান করার লক্ষ্যে কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হয়।

নয়. ব্যাংক একাউন্ট : সোসাইটির সদস্যগণের মাসিক ও দাতাগণের এককালীন শ্রহ্মাদানের অর্থ এবং ত্রিপিটক সেট সংগ্রহকারী নিবন্ধিত গ্রাহকগণের অগ্রিম মূল্য পরিশোধের অর্থ নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য নিবন্ধন সুসম্পন্ন করা হয়। নিবন্ধন নং ৩৮১/০৯, তারিখ ০৩/১১/২০১৪ খ্রি.। এ মহান ধর্মীয় পুণ্যকাজে সহযোগিতার জন্য তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এক্ষেত্রে সোসাইটির উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য ও পানছড়ি শান্তিপুর অরন্য কুটিরের অধ্যক্ষ পরম শ্রদ্ধেয় শাসন রক্ষিত ভন্তের সুপরামর্শ ও উপদেশ সর্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। উল্লেখ্য যে, সোসাইটির উপদেষ্টা পরিষদে শ্রদ্ধেয় ভন্তেকে অন্যতম সদস্য হিসেবে মনোনীত করার সংবাদটি অবহিত করার লক্ষ্যে নবর্গঠিত কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। সাক্ষাতে তিনি ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন ও সাধুবাদ জানিয়ে আশীর্বাদ করেন এবং সোসাইটির

সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু করার পাশাপাশি যত দ্রুত সম্ভব সোসাইটি নিবন্ধনে উদ্যোগ গ্রহণ করতে তিনি সুপরামর্শ দেন। শ্রন্ধেয় ভন্তের পরামর্শকে অতীব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন পেশ করা হয়। শ্রন্ধেয় ভন্তের এ যাবৎকালে প্রদন্ত আশীর্বাদ ও সুপরামর্শের জন্য আমরা সকলেই তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ ও গুণমুগ্ধ। তিনি আমাদের পরম সহায় ও কল্যাণমিত্র।

এগারো. বার্ষিক সমেলন ও সাধারণ সভা : গঠনতন্ত্রের বিধিমতে ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ খ্রি. প্রথম ১৬ জানুয়ারি ২০১৫ খ্রি. দ্বিতীয় ও ১৫ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি. তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন মিলনপুর, খাগড়াছড়ি সদরে এবং ১৩ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রি. রাঙামাটি রাজবন বিহারে সোসাইটির চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন ও সাধারণ সভা বছরভিত্তিক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বারো. দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন/মনোনয়ন : ১ম কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল ২ (দুই) বছর উত্তীর্ণ হলে সোসাইটির বার্ষিক সম্মেলন ও সাধারণ সভা ২০১৫ খ্রি. অনুষ্ঠানে ০৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠনের মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যগণের মতামত যাচাইয়ের ভিত্তিতে পরবর্তী দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য (২০১৫-২০১৭ খ্রি.) ২৭ (সাতাশ) সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হয়।

নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা হলেন:

- ১. প্রফেসর ড. সুধীন কুমার চাকমা, আহ্বায়ক
- ২. প্রফেসর মি. বোধিসত্ত দেওয়ান, সদস্য
- ৩. মি. প্রিয় কুমার চাকমা, সদস্য

তেরো. গঠনতন্ত্র সংশোধন : মনোনীত নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য সংখ্যা ও মেয়াদকাল বৃদ্ধির কারণে গঠনতন্ত্রের ধারা ০৮-এর (৩) কার্যনির্বাহী পরিষদ ও ধারা ০৯-এর (ঘ) পরিষদগুলোর গঠন কাঠামো সংশোধনের প্রয়োজন-হেতু আবেদনের প্রেক্ষিতে ০৩ নভেম্বর ২০১৫ খ্রি. সোসাইটির নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পাওয়া যায়।

টোদ্দ. নিরীক্ষা কার্যক্রম : ০৩ সদস্যবিশিষ্ট নিরীক্ষা দল গঠন করে প্রতিবছর মাস ও বছরভিত্তিক আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা করা হয়েছে। (মেয়াদকাল)

অক্টোবর ২০১২ - ডিসেম্বর ২০১২ খ্রি. জানুয়ারি ২০১৩ - ডিসেম্বর ২০১৩খ্রি. জানুয়ারি ২০১৪ - ডিসেম্বর ২০১৪খ্রি. জানুয়ারি ২০১৫ - ডিসেম্বর ২০১৫খ্রি. জানুয়ারি ২০১৬ - ডিসেম্বর ২০১৬খ্রি.

পনেরো. সোসাইটির প্রকাশিত গ্রন্থ: বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনার পূর্বে সোসাইটির সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সূত্রপিটকের খুদ্দকনিকায়ের প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হলো:

ক্র. নং	পিটকের নাম	প্রকাশকাল
٥٥	উদান	ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রি.
০২	মহানিৰ্দেশ	জানুয়ারি ২০১৪ খ্রি.
೦೨	অপদান ১ম ও ২য় খণ্ড	অক্টোবর ২০১৪ খি.
08	চূলনির্দেশ	জানুয়ারি ২০১৫ খ্রি.
06	বুদ্ধবংশ	জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি.
০৬	পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড)	২৫ আগস্ট ২০১৭ খ্রি.

এতদ্বতীত ২০১৩ খ্রি. বাংলার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো শ্রন্ধেয় করুণাবংশ স্থবির মহোদয়ের সম্পাদনায় সমগ্র ত্রিপিটক ৪৬ খণ্ডে পালি ভাষায় বাংলা অক্ষরে প্রকাশ করা হয়। এ সোসাইটির সম্পাদনা পরিষদের এটি প্রথম প্রকাশনা। এরপর ০১ জানুয়ারি ২০১৪ খ্রি. অনুষ্ঠিত বার্ষিক সম্মেলনে উদান ও মহানির্দেশ নামক দুটি পিটকীয় বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করে সোসাইটির অভিযাত্রার দ্বিতীয় প্রকাশনার শুভ

সূচনা করা হয়। উপদেষ্টা পরিষদের আহ্বায়ক শ্রন্ধেয় প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির ভন্তে এ দুটি গ্রন্থের মোড়ক উন্যোচন করেন।

ষোলো. বর্ষপঞ্জি বা ক্যালেভার প্রকাশ : সোসাইটি কর্তৃক নভেম্বর ২০১৫ খ্রি. বৌদ্ধ জনগণের ব্যবহার উপযোগী ২০১৬ খ্রি., ১৪২৩-২৪ বাংলা ও ২৫৫৯-৬০ বুদ্ধবর্ষের তিথি সম্বলিত ক্যালেভার প্রকাশ করা হয়। সোসাইটির সম্পাদনা পরিষদের এটি একটি নতুন

সংযোজন।

সতেরো. বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনা কমিটি: ত্রিপিটক প্রকাশনা কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুসম্পন্ন করার নিমিত্তে ১৪ আগস্ট ২০১৫ ও ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ খ্রি. সাধনানন্দ (বনভন্তে) কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, রাঙামাটি রাজবন বিহারে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সোসাইটির সম্পাদনা পরিষদ, প্রতিনিধি পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সমন্বয়ে দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ৯ সদস্যবিশিষ্ট 'বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনা কমিটি' গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি ত্রিপিটক সেট সংগ্রহকারী গ্রাহকগণের নাম নিবন্ধনসহ ত্রিপিটক সেটের মূল্য নির্ধারণ, অগ্রিম টাকা জমা প্রদান ও প্রকাশনা কার্যক্রমকে বেগবান ও যথারীতি সম্পাদন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আঠারো. আর্থিক ব্যবস্থাপনা : সোসাইটির প্রকাশনা খাতটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এ সোসাইটির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে গঠনতন্ত্রের নীতিমালার ভিত্তিতে বছরে ১২ (বারো)-টি মাসিক সভা ও বছর শেষান্তে বার্ষিক সম্মেলন ও সাধারণ সভা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। উক্ত আয়োজিত সভা উপলক্ষে সোসাইটির তহবিল হতে কোনো অর্থ ব্যয় না করে কার্যনির্বাহী পরিষদ ও তৎসংশ্লিষ্ট সদস্যগণের ব্যক্তিগত অর্থে সভার যাবতীয় খরচ নির্বাহ করা হয়ে থাকে। প্রকাশনা খাত ব্যতীত তহবিলে সংরক্ষিত অর্থ অন্য কোনো খাতে অপচয় হওয়ার কোনো প্রকার সুযোগ নেই। সোসাইটির আর্থিক ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত স্বচ্ছ ও নির্ভুল। তহবিলে অর্থের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার কারণে আমরা প্রতি মাসিক সভায় ও বছর শেষে নিরীক্ষার মাধ্যমে আয়-ব্যয় ও স্থিতির হিসাব যাচাই এবং পর্যালোচনা করে থাকি। হিসাবে এ যাবৎ কোনো গরমিল পরিলক্ষিত হয়নি।

উনিশ. প্রকাশনা কাজের অগ্রগতি ও সাফল্য :
সোসাইটির অভীষ্ট লক্ষ্য সফল বাস্তবায়নে প্রকাশনা
কাজিট সবচেয়ে কঠিন ও দুরহ কাজ। আর্থিকভাবে
বিচার করলে এ খাতিট খুবই ব্যয়বহুল। সম্মিলিত
প্রচেষ্টা ছাড়া এতো বড়ো মাপের পুণ্যকর্ম পরিকল্পিত
মেয়াদের আগেই বাস্তবায়ন করা মোটেও সহজ কাজ
ছিল না। এ ক্ষেত্রে সম্পাদনা পরিষদের আহ্বায়ক
শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রগুপ্ত মহাস্থবির ভন্তের বিচক্ষণতা, দক্ষ
নেতৃত্ব, সুপরিকল্পিত কর্মপন্থা নির্ধারণ ও সম্পাদনা
পরিষদের সংশ্লিষ্ট ভিক্ষ্বসংঘের অক্লান্ত ও নিরলস

প্রচেষ্টায় পালি থেকে বাংলায় অনূদিত ও প্রকাশিত সমগ্র ত্রিপিটক নিবন্ধিত গ্রাহকগণের নিকট বিলি-বিতরণের কাজ সুগম হলো। এ কৃতিত্বের দাবিদার ব্যক্তিবিশেষে কারোর একার না হলেও সিংহভাগ কৃতিত্ব সম্পাদনা পরিষদ তথা প্রকাশনা কমিটির পূজনীয় ভিক্ষুসংঘের, যা অকপটে স্বীকার করতে হবে।

লৌকিক ও লোকোত্তর উভয়কালে সুখ-শান্তির মানসে এবং কর্ম-কর্মফল ও পুনর্জন্মের প্রতি অগাধ বিশ্বাস রেখে যারা সোসাইটিভুক্ত হয়ে নিয়মিত মাসিক শ্রদ্ধাদান ও দাতা হিসেবে যারা অকাতরে এককালীন অর্থসহায়তা দিয়ে সোসাইটির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অর্থণী ভূমিকা পালন করেছেন আমি তাদের এ মহান ত্যাগ ও কুশল পুণ্যকর্মের চেতনাকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি এবং সোসাইটির পক্ষ থেকে সকলকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। সম্পাদনা পরিষদ, কার্যনির্বাহী পরিষদসহ সাধারণ সদস্য সকলের অকাতর দান-শ্রদ্ধায় ও আন্তরিক সহযোগিতায় প্রত্যাশিত মেয়াদের পূর্বেই ২৫ আগস্ট ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে সোসাইটির প্রধান উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। নিঃসন্দেহে আমরা-আপনারা সবাই আজ পুণ্যবারিতে সিক্ত।

বিশেষভাবে আরও স্মরণীয় যে, এ সোসাইটির উদ্যোগে গত ৩০ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি. রাঙামাটি রাজবন বিহারে পূজ্য বনভন্তের ৪র্থ পরিনির্বাণ বার্ষিকী উদ্যাপন অনুষ্ঠান সমাপ্তিতে সম্মানিত চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়. রাজবন বিহার উপাসক-উপাসিকা কার্যনির্বাহী পরিষদের সিনিয়র সহ-সভাপতি মি. গৌতম দেওয়ানসহ পরিষদের সংশ্লিষ্ট সদস্যবৃন্দ ও অনুষ্ঠানে পাবলিশিং সোসাইটির অংশগ্রহণকারী ত্রিপিটক সদস্যগণের সদয় উপস্থিতিতে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র পূজনীয় ভিক্ষুসংঘের সূত্রপাঠের মাধ্যমে রাজবন অফসেট প্রেসে "বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক" মুদ্রণের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ উদ্বোধন করেন উপদেষ্টা পরিষদের আহ্বায়ক শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির ভত্তে। এরপর শ্রদ্ধেয় ভত্তেসহ ব্যারিস্টার রাজা দেবাশীষ রায়, সিনিয়র সহ-সভাপতি মি. গৌতম দেওয়ান, সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মি. অরুণ বিকাশ তালুকদার প্রেস ভবনের মূল ফটকে এবং অপর উপস্থিত পুণ্যার্থী সদস্যগণ বিহার এলাকার পথের দু'ধারে মোমের বাতি প্রজ্জলিত করে প্রকাশনা কাজের সাফল্য ও মঙ্গল কামনা করেন।

সেদিনের সেই শুভক্ষণ থেকে সম্পাদনা পরিষদ তথা

প্রকাশনা কমিটির পূজনীয় ভিক্ষসংঘ অদম্য মনোবল নিয়ে প্রকাশনা কাজে সার্বক্ষণিক নিমগ্ন ছিলেন। তাঁদের নিরন্তর কর্মপ্রচেষ্টায় এবং ভগবান বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যসংঘের শীল, সত্য ও জ্ঞানের প্রভাবে, পূজ্য বনভন্তের শীল, সত্য ও জ্ঞানের প্রভাবে এবং তাঁর ভিক্ষুসংঘের দানপুণ্য, ভাবনাপুণ্যের প্রভাবে সোসাইটির পরিকল্পিত ও নির্ধারিত মেয়াদের প্রায় দেড বছর আগে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। এতো স্বল্প সময়ের মধ্যে ত্রিপিটকের ছোটো-বড়ো ৫৯ বইকে ২৫ ভলিউমে তথা খণ্ডে এক সেট হিসেবে পালি থেকে বাংলায় অনুবাদ ও মুদ্রণের কাজ শেষ করে প্রকাশ করা চাট্টিখানি কথা নয়। প্রকাশনা কাজে ভিক্ষুসংঘের ত্যাগ, তিতীক্ষা ও নিরলস কর্মসাধনাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে ও সোসাইটির সকল সদস্য-সদস্যা এবং শুভাকাঞ্জীদের পক্ষ থেকে বারংবার শ্রদ্ধানিংড়ানো অভিনন্দন ও ভক্তি চিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সত্যি, বৌদ্ধ জাতি আজ গর্বিত ও আনন্দে উচ্ছুসিত। বৌদ্ধ জনগণের এটি এক অমূল্য সম্পদ। এ অর্জিত সম্পদকে খাটো করে দেখার কিংবা অন্য কোনো সম্পদের সঙ্গে তুলনা করার সুযোগ নেই। এক কথায় বলতে হয়, বৌদ্ধ জাতির ভাগ্যাকাশে এক নতুন সূর্যের

উদয় হলো। যে সূর্য চারদিকে মৌলিক বৌদ্ধধর্মের আলো ছড়াবে। প্রতিটি বৌদ্ধ পরিবারে এ অমূল্য সম্পদ সংগৃহীত ও পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে সংরক্ষিত হবে এবং আচার-আচরণে প্রত্যেকেই বৌদ্ধ জাতির পরিচয় বহন করবে, এটাই একান্তভাবে কাম্য। সর্বোপরি সকলের সহজবোধ্য ভাষা বাংলায় প্রকাশিত ত্রিপিটক শিক্ষা ও গবেষণার দারা ভিক্ষু-শ্রামণ, দায়ক-দায়িকা ও উপাসক-উপাসিকা প্রত্যেকেই সদ্ধর্মজ্ঞানে জ্ঞানী হবেন। পরিণামে এ অঞ্চলে বুদ্ধশাসন ও বনভন্তের অনুশাসন স্থায়ী ও সুরক্ষিত হবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা সমগ্র বাংলাদেশ কোনো একসময় বৌদ্ধ প্রতিরূপ দেশের আবহে শান্তির আবাসভূমিতে পরিণত হবে, এ প্রত্যাশা করছি। ২৫ আগস্ট ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে আমাদের আয়োজিত প্রকাশনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র পূজনীয় ভিক্ষুসংঘ, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, জাতীয় নেতৃবৃন্দ, সুধীবৃন্দ, সোসাইটির সদস্য-সদস্যা তথা পূজ্য বনভন্তের একান্ত গুনমুগ্ধ ভক্ত-অনুরাগী দায়ক-দায়িকা ও উপাসক-উপাসিকা সকলকে শ্রেণিবিশেষে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে বন্দনা. নমস্কার, আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিশ্বের সকল প্রাণীর হিতসুখ ও মঙ্গল কামনা করছি। ■

জয়তু বুদ্ধসাসনম্!

তারিখ: ২৫ আগস্ট ২০১৭

স্থান: রাজবন বিহার, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

* **লেখক পরিচিতি :** অরুণ বিকাশ তালুকদার, সাধারণ সম্পাদক, কার্যনির্বাহী পরিষদ, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি।



ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি

বাংলাদেশ

অস্থায়ী কার্যালয় : শান্তিগিরি বন ভাবনা কুটির রাঙাপানিছড়া, খাগড়াছড়ি সদর খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থাপিত : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১২ রেজি. নং- ৩৮১/০৯

বৌদ্ধধর্মীয় বইয়ের একটি অনন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সমাজসেবা অধিদফতর ঢাকা জেলা সমাজসেবা কার্যালয়.... अभाक्षकन्त्रान भन्ननान्य

ক্রিমক নম্বর ৪

निवक्तम नक्षत् 12 N STSI -6 60/00

अप्रियम् त्रमाष्ट्र डिस्ट वस दावना कारिय में आफ्रा ১৯৬১ সালের স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান (রেজিষ্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ (নম্বর ৪৬) এর ৪(৩) ধারার অধীনে- ট্রিপি কি শালের-প্রশীস্থানের-শাসের-শাসের-শাসের-শাসের শুর্মির বর্ণিত আইনের শর্জাদ পূরণ করায় নিম্ন স্থাক্ষরকারীর নিজ স্বাক্ষরে ও वाश्नातमभातक- 2000) 5/9/10/10/10/2/ 1P/07/ সরকারী সীলমোহরে নিবন্ধন করা হলো। নিবন্ধনকত প্রতিষ্ঠানটি-----STATESTAN PARTY PITATIONS CONTAINED डाक्षत र्याहरहास्ते

(डालाश्र/अभिक <u>बाह्मार्मिर</u> वह

निवन्नाकुछ श्रुष्टिश्रानित निवन्न नन्नतः - २२,१५५ ५५ – ७ ५२ (००)

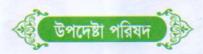
কার্যক্রম পরিচালনা করতে পার্বে এবং এব প্রমান স্বরূপ এ সনদপত্র প্রদান করা হলে।

जावियः विश २०११ कि भिन इनिः त्राराह्मर्थित

व्यक्षित्रव ज्ञान जीन

. ज्ला ममाक त्मवा कार्यानम् - 2000 সমাজসেবা অধিদকতর,ঢাকা निवक्कारी कर्डिभेक

ত্রিপাসো-র বিভিন্ন পরিষদগুলোর সচিত্র পরিচিতি





শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির (প্রধান উপদেষ্টা)



শ্রীমৎ ভৃগু মহাস্থবির (উপদেষ্টা সদস্য)

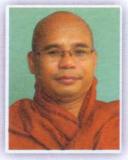


শ্রীমৎ সৌরজগৎ মহাস্থবির (উপদেষ্টা সদস্য)

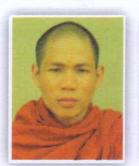


শ্রীমৎ শাসন রক্ষিত মহাস্থবির (উপদেষ্টা সদস্য)

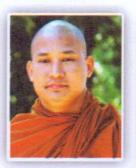




শ্রীমং ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু (আহ্বায়ক)



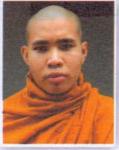
বিধুর ভিক্ষু (সদস্য)



ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু (সদস্য)



শ্রীমৎ সমোধি ভিক্ষু (সদস্য)



শ্রীমং বঙ্গীস ভিক্ষু (সদস্য)



শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু (সদস্য)



শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু (সদস্য)

কার্যনির্বাহী পরিষদ 🐉



মি. মধু মঙ্গল চাকমা (সভাপতি)



মি. পূর্ণচন্দ্র চাকমা (সহ-সভাপতি)



মি. অন্তর্যামী চাকমা (সহ-সভাপতি) (১৫.০১.২০১৭ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন)



শ্রীমতী কনকলতা খীসা (সহ-সভাপতি)



মি. অরুণ বিকাশ তালুকদার (সাধারণ সম্পাদক)



মি. রত্ন কুমার চাকমা (যুগা সাধারণ সম্পাদক)



মি. চন্দ্রোদয় চাকমা (সাংগঠনিক সম্পাদক)



মি. সত্য প্রসাদ দেওয়ান (যুগা সাংগঠনিক সম্পাদক)



মি. সুকীর্তি সাধন চাকমা (দপ্তর সম্পাদক)



মি, ধনবীর চাকমা (অর্থ সম্পাদক)



মি. অমরেশ্বর চাকমা (প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক)



মি. সুখময় খীসা (যোগাযোগ ও সমন্বয় বিষয়ক সম্পাদক)



মি. চিত্ত বিপ্লব চাকমা (গ্রন্থাগারিক ও বিপণন বিষয়ক সম্পাদক)



(গ্রন্থাগারিক ও বিপণন বিষয়ক সহ-সম্পাদক)



মি. কমলা রঞ্জন চাকমা (নির্বাহী সদস্য)



মি. অভিমূন্য চাকমা (নির্বাহী সদস্য)

ক্রিকার্যনির্বাহী পরিষদ্



মি. বিজন কৃষ্ণ চাকমা (নিৰ্বাহী সদস্য)



মি. কৃতি চাকমা (নিবাহী সদস্য)



মি. অমর স্মৃতি চাকমা (নির্বাহী সদস্য)



মি. সুনীতি রঞ্জন চাকমা (নির্বাহী সদস্য)



মি. অনুতোষ চাকমা (নিৰ্বাহী সদস্য)



মি. প্রভাত চন্দ্র চাকমা (নির্বাহী সদস্য)



মি. রূপময় চাকমা (নির্বাহী সদস্য)



মি. দেব প্রসাদ চাকমা (নির্বাহী সদস্য)



মি. প্রগতি চাকমা (নির্বাহী সদস্য)



মি. ডা. দেবরাজ চাকমা (নির্বাহী সদস্য)



মি. সন্ট বিকাশ চাকমা (নিৰ্বাহী সদস্য)



প্রতিনিধি পরিষদ, রাঙ্গামাটি ট্রি



মি. সুরেশ কান্তি চাকমা (সভাপতি)



মি. ডা. দেবরাজ চাকমা (সহ-সভাপতি)



মিসেস উসাংমা চৌধুরী (সহ-সভাপতি)



মি. প্রগতি চাকমা (সাধারণ সম্পাদক)



মি. সন্ট বিকাশ চাকমা (যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক)



মি. সত্য প্রসাদ দেওয়ান (সাংগঠনিক সম্পাদক)



মি. অরুণ বিকাশ চাকমা (দপ্তর সম্পাদক)



মি. মৃদুময় চাকমা (অর্থ সম্পাদক)



মি. সুদীপ্ত চাকমা (প্রচার সম্পাদক)



মি. দেবদাস চাকমা (গ্রন্থাগারিক সম্পাদক)



মি. মিটন খীসা (যোগাযোগ ও সমন্বয় বিষয়ক সম্পাদক)



মি. গোপাল বিকাশ চাকমা (কার্যকরী সদস্য)



মিসেস সুনিকা চাকমা (কার্যকরী সদস্য)



মি. জীরন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা (কার্যকরী সদস্য)



মি. কানন বিকাশ চাকমা (কার্যকরী সদস্য)



মি. সুকৃতিময় চাকমা (কার্যকরী সদস্য)

প্রতিনিধি পরিষদ, রাঙ্গামাটি



মিসেস জুলেখা চাকমা (কার্যকরী সদস্য)



মিসেস শৈলজা চাকমা (কার্যকরী সদস্য)



মিসেস রিয়া চাকমা (কার্যকরী সদস্য)



মি. ললিত চাকমা (কার্যকরী সদস্য)



মিসেস দিবা চাকমা (কার্যকরী সদস্য)



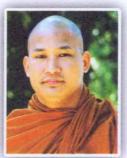
্ব্বিংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনা কমিটি ট্রি



শ্রীমৎ **ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষ্** (আহ্বায়ক)



বিধুর ভিক্ষু (সদস্য)



শ্রীমৎ করুণাবংশ ভিক্ষু (সদস্য)



মি. প্রিয় কুমার চাকমা (সদস্য সচিব)



মি. অন্তর্যামী চাকমা (সদস্য)



মি. রত্ন কুমার চাকমা (সদস্য)



মি. প্রগতি চাকমা (সদস্য)



মি. সত্য প্রসাদ দেওয়ান (সদস্য)



মি. সন্ট বিকাশ চাকমা (সদস্য)

